ইউভাল নোয়া হারারি'র

স্যাপিয়েন্স

আ ব্রিফ হিষ্টোরী অফ হিউম্যানকাইন্ড

অবলম্বনে

মানুষের গল্প

রূপান্তর: আশফাক আহমেদ

মানুষের গল্প

আশফাক আহমেদ

ইউভাল নোয়া হারারি'র

স্যাপিয়েন্স

আ ব্রিফ হিষ্টোরী অফ হিউম্যানকাইন্ড

অবলম্বনে রূপান্তর

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

মানুষের গল্প

আশফাক আহমেদ

দ্বিতীয় ইবুক সংস্করণ: আগষ্ট, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Manuser Golpo. by Ashfaq Ahmed

Istishon eBook

Second edition Published in **August, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

আব্বু'কে

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

ভূমিকা

২০১৪ সালে ইজরায়েলের ইতিহাসবিদ ইউভাল নোয়া হারারি **Sapiens: A Brief History of Humankind** নামে একটি বই লিখেন। বইটাতে প্রায় ৪০ লাখ বছর ধরে ঘটে যাওয়া মানুষের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে জেনেটিকাল কিংবা বিবর্তনগত কারনে বর্তমান সময়ে হোমো স্যাপিয়েন্সের ভিতরে রয়ে যাওয়া বিভিন্ন কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।

নেহাৎ ঝোঁকের বশেই ইউভাল নোয়া হারারি'র বইটা অনুবাদ করা শুরু করেছিলাম। ঠিক অনুবাদ বলা যায় না একে; মূল ভাবটা নিয়ে নিজের মত করে লেখা। 'রূপান্তর' বলা যায় বরং।

দুই-চারজন লেখাগুলো পছন্দও করা শুরু করেছেন। সেই দুই-চারজন এবং ভবিষ্যতে যদি আরো এক-আধজন পাঠক জোটে, তাদের কথা ভেবে, লেখাগুলোকে একত্র করার চেষ্টার ফসল এই ইবুকটি। কারো যদি খেয়েদেয়ে কোন কাজকর্ম না থাকে, লেখাগুলো যেন টানা পড়ে সময় নষ্ট করতে পারেন!

আশফাক আহমেদ
বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার
প্রবাসী বাংলাদেশী
আগষ্ট, ২০১৭

অধ্যায় এক কিস্তি শূন্য

দক্ষিন ফ্রান্সের Chauvet-Pont-d’Arc গুহায় পাওয়া ৩০,০০০ বছর আগের মানুষের হাতে ছাপ। যেন কেউ বলতে চাইছে, আমি ছিলাম।

ষাট কেজি ওজনের একটা টিপিক্যাল স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কের আয়তন হয় বড়জোর ২০০ সিসি। অথচ আড়াই মিলিয়ন বছর আগেই মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ৬০০ সিসি'র মত। কালের বিবর্তনে সেটা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩শ' কি ১৪শ' সিসি।

এই বিরাট আয়তনের মস্তিষ্ক কিন্তু খুব কাজের কিছু না। বিশেষ করে যেখানে শরীরের সমস্ত ক্যালরির ২৫ পার্সেন্ট সে একাই খরচ করে। এর ফলে মানুষকে দু'ভাবে মূল্য দিতে হয়েছে। এক, মস্তিষ্কের এই খাই খাই মেটানোর জন্য তাকে বেশি

বেশি খাদ্যের সন্ধানে বেরোতে হয়েছে। আর মস্তিষ্ককে বেশি খাওয়াতে গিয়ে হাত-পায়ের মাংসপেশীর ভাগে খাবার পড়েছে কম।

ফলে, দিনে দিনে মানুষের মস্তিষ্ক প্রখর হয়েছে বটে। কিন্তু হাত-পা হয়ে গেছে দুর্বল। আমাদের বাপ-দাদাদের তুলনায় আমরা যে শারীরিকভাবে দুর্বল---এতে আর আশ্চর্য কী!

বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী শিল্পীর কল্পনায় আঁকা আমাদের ভাই ও বোনেরাঃ বামে হোমো রুডলফেন্সিস (পূর্ব আফ্রিকা), মাঝে হোমো ইরেক্টাস (পূর্ব এশিয়া) আর সর্ব ডানে হোমো নিয়াডার্থাল (ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া)

আজকাল না হয় আমরা বড় মস্তিষ্কের সুবিধা ভোগ করছি। মস্তিষ্ক খাটিয়ে বন্দুক আবিষ্কার করেছি। সেই বন্দুক দিয়ে জিম করবেটরা বাঘ-ভাল্লুক মারছেন। কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ সময় জুড়ে তো আমাদের কাছে তীর-ধনুকের চেয়ে বেশি কিছু অস্ত্রপাতি ছিল না। মস্তিষ্কের খুব কমই আমরা ব্যবহার করেছি সেই সময়টায়। এই বিরাট মস্তিষ্ক তাই এক রকম বোঝাই ছিল আমাদের জন্য। তারপরও ক্রমাগত দুই মিলিয়ন বছর জুড়ে মস্তিষ্কের সাইজ কেন বেড়ে চললো? ফ্র্যাঙ্কলি, এর উত্তর আমরা জানি না।

স্তন্যপায়ীদের সাথে আমাদের আরেকটা পার্থক্য তৈরি হয় আমরা যখন শিরদাঁড়া সোজা করে দু'পায়ে দাঁড়াতে শিখি। এই দাঁড়ানোর ফলে আমরা কিছু এ্যাডেড বেনিফিট পাই। দাঁড়াতে শেখায় আমরা দূর থেকেই শত্রুকে সনাক্ত করতে শিখি। সেই সাথে হাত দিয়ে পাথর ছুঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে শিখি।
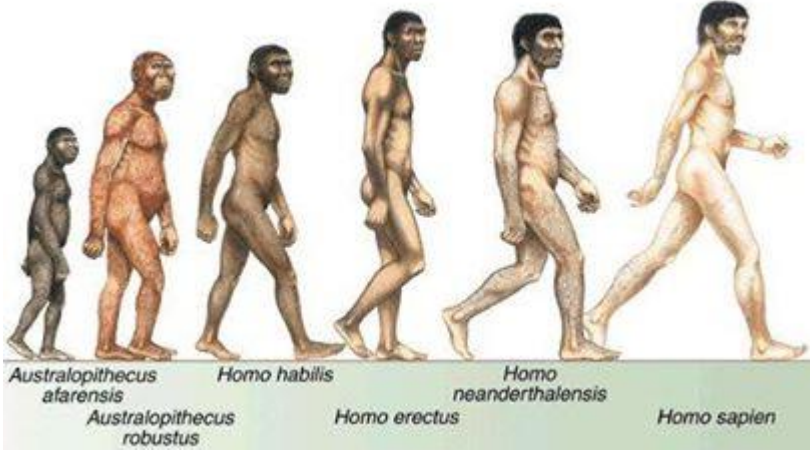
এটা একটা পজিটিভ ফিডব্যাক লুপের মত। হাত দিয়ে কাজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় হাতের শিরায় শিরায় নার্ভের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর নার্ভের পরিমাণ বাড়তে থাকায় হাত দিয়ে আমরা আরো আরো কমপ্লেক্স কাজ করতে শিখি। পাথর ছোঁড়া ফেজ পেরিয়ে আমরা তীর-ধনুকের মত সফিস্টিকেটেড হাতিয়ার ডিজাইন করা শিখি।

কিন্তু সবকিছুরই একটা উল্টো দিক আছে। দাঁড়াতে শেখার ফলে মানুষের পিঠে ভালো প্রেশার পড়ে। দেখা দেয় মেরুদন্ড ও ঘাড়ের ব্যথার মত অভূতপূর্ব সমস্যা। বলা বাহুল্য, এতো ভারী একটা মাথাকে বহন করা কিন্তু সহজ কাজ নয়। মানুষের মাথার ওজন সমস্ত শরীরের ওজনের ২-৩%। শুনে কম মনে হচ্ছে তো? কিন্তু

আমাদের ভাই-বেরাদারদের সাথে তুলনা করলে বুঝবেন, এটা কতো বেশি! যেখানে গরিলার ক্ষেত্রে এর মান মাত্র ০.২% আর শিম্পাঞ্জীর ক্ষেত্রে ০.৮%।

একে তো মাথার ভার বেশি। সেই ভার বহন করা মুশকিল, তার উপর সেটা যদি দাঁড়ায়ে বহন করতে হয়! আমরা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি দেখে ব্যাপারটা গায়ে লাগে না। কিন্তু একটু চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখুন। এতো ভারী একটা জিনিস আপনি অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে বহন করছেন; নিজের সামর্থ্যের প্রতি একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা চলে আসবে!
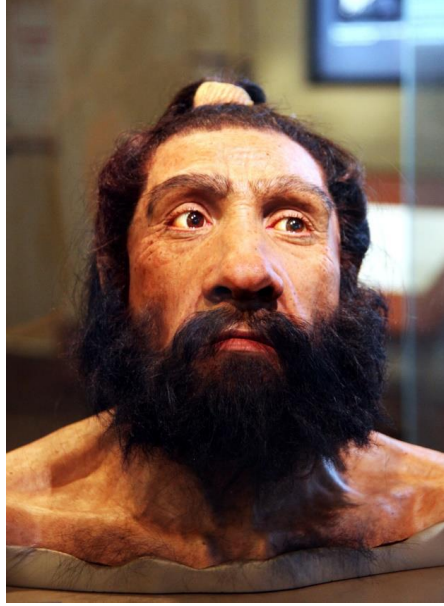
নিয়ান্ডারথাল পুরুষ। চিত্রটি কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, শানিদার গুহা থেকে প্রাপ্ত ফসিল থেকে। এই পুরুষ নিয়ান্ডারথাল প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে বেঁচে ছিল।
(ছবি সূত্র- উইকিপিডিয়া)

দাঁড়াতে শেখায় সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে নারীদের। এর ফলে নারীদের শ্রোণীদেশ দিন দিন সরু হয়ে যাচ্ছিল। সেটা সমস্যা না। সমস্যা হল, এর ফলে বাচ্চা

জন্মাবার রাস্তাও দিন দিন সরু হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে বাচ্চাদের মাথার সাইজ জেনারেশন থেকে জেনারেশনে বড় হচ্ছে। মাথার সাইজ বাড়ছে, কিন্তু সেই মাথা বের হবার রাস্তা দিনকে দিন ছোট হচ্ছে। প্রসবকালীণ শিশু মৃত্যুর ব্যাপকতা তাই মানব জাতির জন্য একটা বিরাট কনসার্ন হয়ে দেখা দিল।

দেখা গেলো, যেসব মা বাচ্চা জন্ম নেবার নরমাল সময়ের আগেই বাচ্চা ডেলিভারী দিচ্ছেন, তাদের বাচ্চা বেঁচেবর্তে উঠছে। দেরি করলেই মা-শিশু দু'জনই মারা খাচ্ছে। কাজেই, ন্যাচারাল সিলেকশন বলে---তাড়াতাড়ি বাচ্চা মায়ের পেট থেকে বের হওয়াই ভালো।

শিল্পির কল্পনায় আঁকা নিয়ান্ডার্থাল কিশোরী।

তাড়াতাড়ি বাচ্চা বের হতে গিয়ে আরেক সমস্যা দেখা দিল। এই শিশুদের শরীরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশই তখনো আন্ডার-ডেভেলপড। অন্য প্রাণীদের বাচ্চারা যেখানেই জন্মের পরপরই মোটামুটি হাঁটতে-দৌড়ুতে পারে, মানব শিশু সেখানে নেহাতই বোকাচ্চো।

এক কিস্তি এক

এতে অবশ্য আমাদের একটা লাভ হয়েছে। মা যেহেতু একা শিশুটির খাবারের সংস্থান করতে পারছে না, সেই খাবার যোগাড়ের জন্য একজন বাবা'র প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। বায়োলজিক্যাল বাবা না, সামাজিক বাবা। যে মা ও শিশুটার জন্য বনেবাদাড়ে যুদ্ধ করে খাবার নিয়ে আসবে। আবার শিশু জন্মের পর পর মা-বাবা দু'জনের পক্ষেও অনেক সময় সেই দুর্বল শিশুটার সব প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য তাদের আশেপাশের মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। এই সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে তাদের বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজন। এইভাবে একটা শিশুকে মানুষ করার জন্য যে সোশ্যাল নটটা গড়ে উঠছে---তাই পরবর্তীতে গোত্র বা গোষ্ঠী গঠনে সাহায্য করবে। আর মানুষকে এগিয়ে দেবে বহুদূর।

আমরা যখন নিজেদের মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স হিসেবে পরিচয় দিই, তখন নিজের অজান্তে আমরা স্বীকার করে নিই যে, আমরা ছাড়াও এ পৃথিবীর বুকে আরো নানা প্রজাতির মানুষ ছিল। কেননা, Homo মানে মানুষ আর Sapiens মানে জ্ঞানী। আমরা হলাম গিয়ে জ্ঞানী মানুষ। আমরা যদি জ্ঞানী মানুষ হই, তবে তো কিছু মূর্খ, জ্ঞানহীন মানুষের অস্তিত্বও এ পৃথিবীর বুকে ছিল। তারা তবে কই?

এই গল্পের শুরু দেড় লাখ বছর আগে। পৃথিবীতে তখন রাজত্ব করছে কমসে কম ছয় রকমের মানুষ। এর মধ্যে তিন রকমের মানুষ সংখ্যায় ভারী। একদল---আমরা, মানে হোমো সেপিয়েন্সরা বসতি গড়েছি আফ্রিকার এক পূর্ব কোণে। নিয়েন্ডারথাল মানুষেরা ইউরোপে শীতের বিরুদ্ধে লড়ছে। আর এশিয়ার পূর্বকোণে হোমো ইরেক্টাস মানুষেরা সুখে শান্তিতে দিন গুজরান করে চলেছে। আমরা মানে হোমো সেপিয়েনসরা

আর আমাদের ভাই-বেরাদররা প্রত্যেকেই তখন আগুন ব্যবহার করতে শিখেছি। আমাদের মস্তিষ্কের সাইজও বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অথচ এই মস্তিষ্ক নিয়েই আমরা আফ্রিকার এক পূর্ব কোণে পড়ে রয়েছি। এই করে কেটে গেছে বহু বছর।

সত্তর হাজার বছর আগে একদল হোমো সেপিয়েন্স প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে, সেখান থেকে ইউরোপে ঢুকে পড়লো। এইখানে তাদের মোলাকাত হল নিয়েন্ডারথাল মানুষদের সাথে।

একে তো এরা ছিল আমাদের চেয়ে অধিক পেশীবহুল, অন্যদিকে এদের মস্তিষ্কও আমাদের চেয়ে সাইজে বড় ছিল। এমনকি টেকনোলজির দিক দিয়েও এরা এগিয়ে ছিল। এদের হাতিয়ার ছল উন্নতমানের। কাজেই, এরা বেটার শিকারী ছিল।
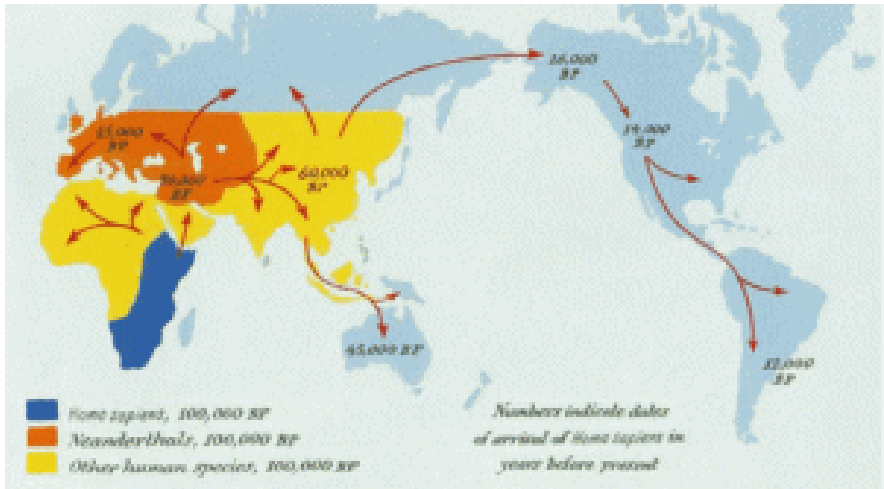
হোমো সেপিয়েন্স জয় করল পুরো বিশ্ব

সামাজিক মূল্যবোধের দিক দিয়েও এরা আমাদের চেয়ে উঁচু মেন্টালিটির ছিল। বৃদ্ধ, অথর্বদের সেবাযত্নের কোনরকম ত্রুটি করতো না এরা। প্রত্নতাত্ত্বিকরা দিনরাত খোঁড়াখুঁড়ি করে এর সপক্ষে প্রমাণ হাজির করেছেন। তারা এমন কিছু নিয়েন্ডারথাল

হাড়গোড় পেয়েছেন, যা কিনা ঐ লোকের শারীরিক ত্রুটিগস্ত হবার এবং সেই সাথে ঐ ত্রুটি নিয়েই বহু দিন বেঁচে থাকার প্রমাণ বহন করে।

যাই হোক, এরপর কী ঘটে? নিয়েন্ডারথালরা কি এই আগন্তুকদের সাদরে বরণ করে নেয় না বহিরাগত বলে যুদ্ধ ঘোষণা করে?

ফ্র্যাংক্লি, এর উত্তর আমরা জানি না।

তবে পরবর্তী ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য দুটো হাইপোথেসিস আছে। একদল বলেন, সেপিয়েন্সরা আর নিয়েন্ডারথালরা একে অপরকে ভালবেসে সুখে-শান্তিতে বংশবৃদ্ধি করিতে লাগিলো। আজকে আমরা যে লালমুখো ইউরোপিয়ানদের দেখি, তারা এই সেপিয়েন্স আর নিয়েন্ডারথালদের ভালবাসারই ফসল!

সেপিইয়েন্সরা যে খালি ইউরোপেই ভালবাসার বার্তা নিয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। এরা ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়ার পূর্বভাগেও। আজ আমরা যে চাইনিজ, কোরিয়ানদের দেখি তারা সেপিয়েন্স আর ঐ অঞ্চলে আগে থেকেই বসবাসরত হোমো ইরেক্টাসদের ভালবাসাবাসির ফল।

এটা যথেষ্ট অপ্টিমিস্ট থিওরি। এর বিপরীত থিওরিও আছে। এই থিওরী বলে, নিয়েন্ডারথাল রোমিও আর সেপিয়েন্স জুলিয়া যদি একে অপরের প্রেমে পড়েও, তাদের জেনেটিক দূরত্ব এতোই বেশি যে তাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। এই কারণেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, দুই দলের মধ্যে এক রকম বৈরীভাব দেখা দিল। তার ফলস্বরূপ যুদ্ধ। যে যুদ্ধের মেয়াদ শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার আগ পর্যন্ত জারি থাকে।

মজার ব্যাপার হল, টেকনোলজিক্যালী নিয়েন্ডারথালরা এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এই অস্তিত্বের যুদ্ধে তারা সেপিয়েন্সদের কাছে হেরে গেলো। এরপর থেকে ৭০ হাজার বছর ধরে সেপিয়েন্সরাই মানুষের ট্যাগ নিয়ে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো।

এই প্যাটার্ণটা পৃথিবীর অন্য জায়গাতেও লক্ষ করা যায়। হোমো সেপিয়েন্সরা যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই অন্য প্রজাতির মানুষেরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন এটা গণহত্যার কারণে হয়েছে না কোন অন্য কোন কারণে হয়েছে---সেটা গবেষণার বিষয়। ইউরোপীয়রা যেমন আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের কেবল কামান দেগেই হত্যা করেনি, ইউরোপীয়রা নিজেদের শরীরে যে রোগবালাই'র জীবাণু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সেইসব জীবাণুর বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকাতেও এরা কাতারে কাতারে মরেছে। নিয়েন্ডারথাল আর হোমো ইরেক্টাসদের ক্ষেত্রেও এমন কিছু ঘটা বিচত্র নয়।

তবে যদি গণহত্যা থিওরী সত্যি হয়ে থাকে, তবে বলতে হয়---ইতিহাসের প্রথম গণহত্যার নায়ক চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান নয়, নায়ক আমরা এই হোমো সেপিয়েন্সরা। যার জন্য আমাদের আজও কোন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। আমাদের মধ্যে যে হিংস্র, খুনে মানসিকতা বসত গেড়ে আছে, তা মধ্যযুগ বা কোন আধুনিক অস্ত্রের দান নয়। সত্তর হাজার বছর ধরে এই খুনে উল্লাস আমাদের ধমনীতে বয়ে চলেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভয়ভীতি দিয়ে আমরা সেই খুনে সত্তাকে ঢেকে রাখি মাত্র।

একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। নিয়েন্ডারথালরা যদি হোমো সেপিয়েন্সদের তুলনায় টেকনোলজিক্যালী এগিয়েই থাকে, তবে ওরা কেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? নিশ্চিহ্ন তো হয়ে যাবার কথা আমাদের। পৃথিবীর ইতিহাস তো তাই বলে। এই প্রশ্নের উত্তর না হয় একটু পরেই দেব।

এক কিস্তি দুই
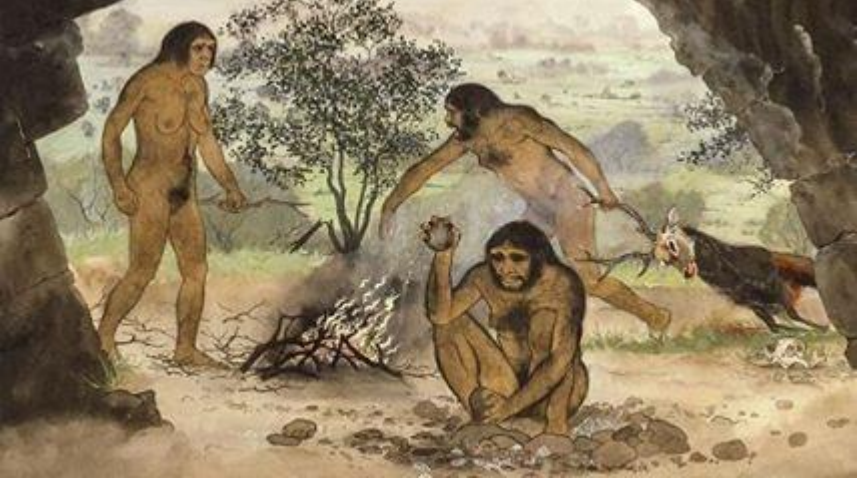
আগে বলেছিলাম, নিয়েন্ডারথাল মানুষেরা হোমো সেপিয়েন্স মানুষদের চেয়ে শারীরিক শক্তিতে এগিয়ে আর টেকনোলজিক্যালী সমানে সমান থাকার পরও তারা এই সেপিয়েন্সদের হাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু কেনো? আজ সেই গল্পটাই বলবো।

নিয়েন্ডারথালদের সাথে সেপিয়েন্সদের প্রথম মোলাকাত হয় এক লক্ষ বছর আগে। মজার ব্যাপার হল, সেই মোলাকাত সেপিয়েন্সদের জন্য কোন সুখবর বয়ে আনেনি। উল্টো নিয়েন্ডারথালদের দাপটে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নিয়েন্ডারথালরা তাদের ভূমিতে, এখনকার মধ্যপ্রাচ্যে বউ-বাচ্চা নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

এরপর কেটে গেলো তিরিশ হাজার বছর। আজ থেকে সত্তর হাজার বছর আগে সেপিয়েন্সরা তাদের দ্বিতীয় এ্যাটেম্পট নেয়। আবারও দলবল নিয়ে আফ্রিকা থেকে

বেরিয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই এরা ইউরোপ আর এশিয়ার পূর্বভাগ দখল করে নেয়। নিয়েন্ডারথাল থেকে শুরু করে হোমো ইরেক্টাস---যতো রকম মানুষ ছিল, সবাইকে প্রথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ৪৫ হাজার বছর আগে এদের একটা দল প্রথমবারের মত অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখে। এই সময়কালেই এরা ডিজাইন করে নৌকা, তীর-ধনুক আর সুইয়ের মত চমৎকার সব যন্ত্রপাতি।

কথা হল---হঠাৎ করে মানুষের বুদ্ধি এতো বেড়ে গেলো কীভাবে?

হিস্ট্রি চ্যানেলের যে কোন প্রোগ্রামে দেখবেন, এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভিনগ্রহীদের আগমন দ্বারা। মিশরের পিরামিড থেকে শুরু করে পেরুর নাজকা লাইন পর্যন্ত সবকিছুই এই ভিনগ্রহীদের দান। তো এই ভিনগ্রহীরা এসে এইখানে বিয়েশাদি করছে। যেহেতু তারা আমাদের চেয়ে উন্নততর মগজের অধিকারী ছিল, সন্তান

হিসেবে তাদের মগজের কিছু অংশ আমরা পেয়ে গেছি। কাজেই, আমরা হঠাৎ করে এতো বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি।

যে কোন ধর্মেই পুরাণে দেখবেন, দেবতার সাথে মানুষের বিয়ে হওয়ার একটা বেশ রেওয়াজ চালু ছিল। ধর্ম বলেন, রাষ্ট্র বলেন-সব জায়গাতেই দেবতার ঔরসজাত না হলে আপনি পাত্তাই পাবেন না---এমন অবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে রাজি না হলে দেবতাটি ছলে-বলে-কৌশলে শারীরিক সম্পর্ক আদায় করে নিতেন। জিউস যেমন। এখন কথা হচ্ছে, ভিনগ্রহীরা যদি সত্যিই এসে থাকে, তবে পুরাণে বর্ণিত এই দেবতারাই সেই ভিনগ্রহী নয় তো?

ভিনগ্রহী তত্ত্ব এখন পর্যন্ত মেনস্ট্রীম বিজ্ঞানের বাইরের জিনিস। মেইনস্ট্রীম বিজ্ঞানে আসি। বিজ্ঞান বলে, মানুষের হঠাৎ এই বুদ্ধি বেড়ে যাবার ব্যাপারটি নেহাতই জেনেটিক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনা নিয়েন্ডারথালদের সাথেও ঘটতে পারতো। সেক্ষেত্রে হয়তো আজ নিয়েন্ডারথালরা আমাদের ফসিল নিয়ে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতো।

যাই হোক, এর ফলে একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে। আমাদের মস্তিষ্কের সার্কিটগুলো একেবারে বদলে যায়। আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বেড়ে যায় অস্বাভাবিক ভাবে। চিন্তা হচ্ছে অনেকটা ফার্টের (বায়ু ত্যাগ) মত। চাইলেও একে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায় না। এখন এই নতুন নতুন চিন্তাকে, মনের ভেতরকার ভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য তো একটা মাধ্যম প্রয়োজন। সেই মাধ্যমটাই হল ভাষা। সাংকেতিক ভাষা না। একেবারে আদি ও অকৃত্রিম মুখের ভাষা।

এই মুখের ভাষা যে মানুষের একক আবিষ্কার, তা কিন্তু না। আমাদের দূর সম্পর্কের ভাই বানরও কিন্তু স্বল্প পরিসরে হলেও ভাষার ব্যবহার করে। গ্রীন মাঙ্কি নামক একটা প্রজাতির উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরে দেখেছেন, এরা সিংহ দেখলে সব

সময় একটা নির্দিষ্ট আওয়াজ করে। যার মানে, দ্যাখ, দ্যাখ; সিংহ মামা! ঈগল দেখলে সম্পূর্ণ অন্য রকম আওয়াজ করে। যার মানে সম্ভবত, দ্যাখ, দ্যাখ; ঈগল খালা!

মানুষ তাহলে ভাষা আবিষ্কার করে কী বিশেষ সুবিধাটা পেলো? সুবিধাটা এই যে, মানুষের যেহেতু বহু সার্কিটওলা একটি চমৎকার মস্তিষ্ক আছে, সে শব্দের পর শব্দ জোড়া লাগিয়ে সবকিছু অনেক ডিটেইলস বলতে পারে। আমাদের বানর বন্ধু যেখানে বলবে, দ্যাখ, দ্যাখ, সিংহ, সেখানে আমরা বলবো---"পালা মামা, পালা। তোর দশ হাত পিছনে সিংহ।"

তারপর যদি সে বেঁচেবর্তে ফিরতে পারে, সারা জীবন তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে এই গল্প করে বেড়াবে। কোথায়, কখন সে সিংহটিকে দেখেছিল, সিংহটির গায়ের রঙ কী ছিল, কীভাবে সে বেঁচে ফিরেছে---সব। আর এই করে সেই গোষ্ঠীতে জন্ম নিবে একটি কমন মিথের। এই মিথগুলোই জন্ম দেবে ধর্ম আরা জাতীয়তাবাদের মত মজবুত প্রতিষ্ঠানের।

অনেকে অবশ্য ভাষা আবিষ্কারের পেছনে অন্য একটা গল্পের কথা বলেন আমাদের। ইশারা-ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় আমরা মোটামুটি চিরকালই করতে পারতাম। হালকা পাথর ছুঁড়ে শিকার করার যুগে ধরা যাক আপনার সাথে আপনার দলের একজনের দেখে হয়ে গেলো। আপনারা দূর থেকে হাত দিয়ে ওয়েভ করলেন। তাতেই আপনাদের ভাব বিনিময় হয়ে গেলো। সমস্যাটা দেখা দিল মানুষের হাতে যখন ভারী আর সফিস্টিকেটেড অস্ত্র উঠে এলো। তার হাত দুটো অস্ত্র সামলানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এখন অনতিদূরে তার সহচরের সাথে যোগাযোগের উপায় কী? সে তখন তার ভোকাল কর্ডের সাহায্য নিল। মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে বুঝিয়ে দিল---সে এইখানে আছে। তার ছোট্টবন্ধুর ভয়ের কোন কারণ নেই। ধীরে ধীরে এই বিচিত্র শব্দগুলোই একটা স্ট্যান্ডার্ড প্লাটফর্মে এসে ভাষার রূপ নিল।
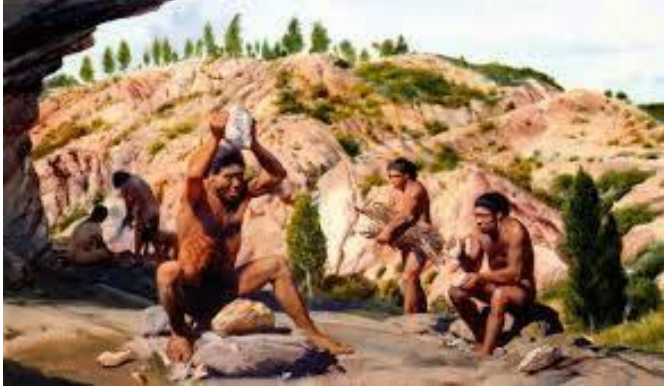
এই ব্যাপারটাই নিয়েন্ডারথালদের বিরুদ্ধে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে। ওদের ভাষা ছিল খুবই প্রিমিটিভ গোছের। দ্যাখ, দ্যাখ, সিংহ আইলো টাইপ। আমরা ততোদিনে কিছুটা সফিস্টিকেটেড ভাষা রপ্ত করে ফেলেছি। আর আপনি যতো কমপ্লেক্স ভাষা রচনা করতে পারবেন, আপনার পক্ষে প্ল্যান-প্রোগ্রামও করা ততো সুবিধা হবে। দ্বিতীয়বার যখন হোমো সেপিয়েন্সরা নিয়েন্ডারথালদের মোকাবেলা করে, সেই মোকাবেলা শুধু অস্ত্রের মোকাবেলা ছিল না। সেটা ছিল ভাষা নামক নতুন টেকনোলজির অস্তিত্বের জন্য এক বড় রকমের পরীক্ষা।

নিয়েন্ডারথালরা যেখানে তাদের বেসিক ইন্সটিংক্ট দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, আমরা সেখানে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে ময়দানে গিয়েছি। হয়তো একজন দলছুট হয়ে বিপদে পড়েছে। সে চিৎকার করে ডাক দিয়েছে---"ওরে রাম, শ্যাম, যদু, মধু---এই আমগাছের তলায় আয়। আমারে বাঁচা।" সঙ্গে সঙ্গে রাম, শ্যাম, যদু, মধু তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। আর এইখানেই নিয়েন্ডারথালরা পিছিয়ে পড়েছে। নিজেদের মধ্যে কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট গড়ে তুলতে না পারায় তারা বহুদিনের অধিকৃত ইউরোপ তো হারিয়েছেই, সেই সাথে নিজেরাও হারিয়ে গেছে।

ভাষার উত্থানের পেছনে আরেকটা থিওরি আছে। আর এটাই সবচেয়ে জোরালো থিওরি। এই থিওরি বলে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সিংহ আইলো কি আইলো না--

-এটা জানা যতোটা জরুরী, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী তার পাশের মানুষটা তার আড়ালে কী করছে, কী ভাবছে, কার সাথে শুচ্ছে---এইসব জানা। এইসব খবর সংগ্রহের জন্য তাকে তৃতীয় আরেকটা মানুষের সাথে কথা বলতে হবে; সোজা কথায় পরচর্চা করতে হবে। পরচর্চা থেকেই সে জানতে পারবে---তার দলের কোন লোকটা ভাল মানুষ আর কোন লোকটা দুই নম্বর। কাকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে করা যায় না।

শুনতে অদ্ভূত শোনালেও তথ্যপ্রমাণ এটাই বলে, পরচর্চাই আদিম মানুষের ভাষার বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে। ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীকে একত্র করে গড়ে তুলেছে স্থায়ী, বড় সমাজ। এমনকি আজকের যুগেও এটা সত্য। পাঁচজন প্রফেসর যখন কোথাও ডিনার করতে যান, তারা যে সবসময় বিজ্ঞান নিয়েই কথা বলেন---তা কিন্তু না। ডিপার্টমেন্টের হেড নতুন জয়েন করা সেক্রেটারির সাথে শুচ্ছে কিনা---এটাও তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে থাকে।

সম্ভবত, নিয়েন্ডারথালদের সমাজে হায়ারার্কি বা জটিলতা সব কিছুই অনেক কম ছিল। একে অন্যের পিঠে কথা বলার রেওয়াজ তাদের মধ্যে চালু হয়নি। ফলে, তাদের ভাষাও সেভাবে ডেভেলপ করেনি। যার মূল্য তাদের দিতে হয়েছে নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে। আহারে বেচারা'রা! সময় থাকতে পরচর্চা করলে আজ ওদের এই দুর্দিন দেখতে হত না!

এক কিস্তি শেষ

গল্প বলা খুব কঠিন একটা কাজ। খুব কম মানুষই এটা পারেন।

মানুষ যখন ভাষা আবিষ্কার করলো, মোটামুটি সেই মুহূর্ত থেকেই সে গল্প বলতেও শুরু করলো। আর এই গল্প বলার মধ্যে দিয়ে সে এক নতুন রিয়েলিটি তৈরি করলো তার চারপাশে। এই রিয়েলিটির নাম সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি। এতোদিন সে অবজেক্টিভ রিয়েলিটির কারাগারে বন্দী ছিল। ভাষা তাকে হঠাৎ মুক্তির স্বাদ এনে দিল।

আমরা সাধারণ মানুষ যখন একটা গাছ, পাথর কিংবা লতাপাতা দেখি, সেটা আমাদের কাছে গাছ, পাথর কিংবা লতা-পাতাই। কিন্তু বিভূতিভূষণ যখন ঠিক সেই একই গাছপাতা দেখেন, তখন সেটা হয়ে যায় স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝামাঝি এক অসাধারণ গল্প।

আমরা একটা বেকার, ভবঘুরে ছেলেকে প্রতিদিনই দেখি চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে, একা একা রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে। সেই ছেলেটিকেই যখন হুমায়ূন আহমেদ

দেখেন, সেটা হয়ে যায় সমাজ বাস্তবতার এক রুদ্ধশ্বাস গল্প। গল্পকাররা এভাবেই চিরকাল অবজেকটিভ রিয়েলিটি-কে সাবজেক্টিভ রিয়েলিটিতে- নিয়ে যাবার কাজটি চমৎকারভাবে করে যাচ্ছেন।

কথা হচ্ছে, গল্প বলে লাভটা কী? আধুনিক গল্পকাররা না হয় গল্প লিখে দুটো টাকাপয়সা পান। ঈশপ বা হোমাররা তাও পেতেন না। তাদের সম্বল ছিল গল্প বলে পাওয়া খ্যাতিটুকু। শ্রোতা কিংবা পাঠকরাও না হয় গল্প শুনে ক্ষণিকের আনন্দ পায়। কিন্তু গল্পের ভূমিকা কি এই ক্ষণিকের আনন্দ দানেই শেষ?

উহুঁ। আমাদের আজকের অস্তিত্বের পেছনেই এই গল্পের একটা বড়সড় ভূমিকা আছে।

আমরা যখন গল্প বলি, সেটা আমাদের অজান্তে আমাদের মধ্যে একটা মিথের জন্ম দেয়। এই মিথই আমাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন বাড়ায়। আপনি যদি ছোটবেলায় আপনার দাদী কিংবা নানীর কাছে থেকে ভূতের গল্প শুনে থাকেন, আপনি ব্যাপারটা রিলেট করতে পারবেন। দাদী বা নানীর কিছুই হয়তো আপনার মনে নেই, কিন্তু তার মুখে শোনা ঐ গল্পগুলো মনে আছে। আপনার নানু কোন ব্র্যান্ডের পান খেতো, আপনার মনে নেই। কিন্তু যখনই ঐ গল্প বলা সন্ধ্যের কথা মনে পড়ে, অজান্তে আপনার গলা ভারী হয়ে আসে। আপনি যখন একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে অপারেশনের কাহিনী শুনবেন, অজান্তেই আপনার রোমকূপগুলো দাঁড়িয়ে যাবে। মনে হবে, এখনই যুদ্ধে চলে যাই।

গল্পের নানী কিংবা মুক্তিযোদ্ধার ঐ গল্প কেবল যে মিথের জন্ম দিচ্ছে, তা না। জন্ম দিচ্ছে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের। নানীর মুখে বলা গল্প আপনাকে আপনার মায়ের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ করছে। আপনারা দু'জন গল্প করার একটা কমন প্লাটফর্ম খুঁজে পাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধার ঐ গল্প আপনাকে বাংলাদেশী হিসেবে গর্বিত করছে। শত

সমস্যার মধ্যেও এই দেশটা যে আপনার, আবারো কোনদিন বর্গী এলে আপনাকেই যে অস্ত্র হাতে দাঁড়াতে হবে---এই বোধে উদ্দীপ্ত করছে। গল্প বা মিথ অচেনা দু'জন মানুষকে এক প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করায়। এই প্লাটফর্মকেই আমরা দেশ, কাল, জাতীয়তাবোধ---নানা নামে আখ্যায়িত করি।

ধর্ম বলেন, সমাজ বলেন, প্রতিষ্ঠান বলেন---অবজেক্টিভ পৃথিবীতে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। এদের অস্তিত্ব পুরোটাই আমাদের মনে। আমরা গল্প আর মিথ মিলিয়ে আমাদের চারপাশে একটা সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি তৈরি করেছি। সেই রিয়েলিটি-তে যখন আমাদের মত আরো হাজার কিংবা লাখখানেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তখন সেটা পরিণত হয়েছে ইমাজিনড রিয়েলিটি-তে।

শুনে হাসতে পারেন, বাংলাদেশ বলে কোন দেশ কিন্তু আসলে নেই। দেশ আছে আমাদের ষোল কোটি মানুষের ইমাজিনড রিয়েলিটি-তে। একইভাবে, ব্র্যাক বলে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কিন্তু বাস্তবে নেই। এটা পুরোপুরিই ফজলে হাসান আবেদের তৈরি একটা মিথ। ভদ্রলোক মিথ তৈরি করেই থেমে থাকেননি। সেই মিথকে নিজ কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন দিনে দিনে। তার তৈরি করা সাবজেক্টিভ রিয়েলিটি এক সময় অংশ হয়ে গেছে আমাদের দৈনন্দিনতার। আমরা নিজের অজান্তে হয়ে গেছি একটি বৃহৎ ইমাজিনড রিয়েলিটির অংশ। আর মানুষের স্বভাবই হচ্ছে এই যে---সে নিজেকে ইমাজিনড রিয়েলিটির অংশ ভাবতে ভালোবাসে। কেউ তাই মুসলিম পরিচয়ে গর্ববোধ করে, কেউ বাংলাদেশী পরিচয়ে আর কেউ কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় পিআর পেলে।

আপনার বর্তমানেও এই গল্পগুলো একটা ভূমিকা রেখে চলে। আপনি হয়তো ব্র্যাক বা বাংলালিঙ্কে জব করেন। আপনার টিম লীডার সপ্তাহের শুরুতে আপনাদের একটা গল্প বলেন। এইভাবে এইভাবে কাজ করলে আমরা প্রজেক্টটা পাব কিংবা প্রবলেমটা সমাধান করতে পারবো। টিম লীডারের কাজ আপনাদের চারপাশে একটা মিথ তৈরি

করা। প্রজেক্টটা পেলে বা প্রবলেমটা সমাধান হলে সমাধান হলে আমরা সবাই হয়তো একদিন ব্যাটন রুজে খেতে যাবো। কিংবা আমাদের কারো কারো প্রমোশন হবে। আমরা একটা ফ্ল্যাট বুকিং দিতে পারবো। কিংবা গাড়ির জন্য লোন নিতে পারবো। এই ব্যাপারগুলো ইমপ্লিসিট থাকে। কিন্তু টিম লীডার লোকটা যদি একজন ভালো গল্প বলিয়ে হন, তিনি আপনার মধ্যে এই স্বপ্নগুলো ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। আপনি আর আপনার কলিগেরা মিলে তখন জীবন যৌবন ভুলে প্রজেক্টের জন্য কাজ করবেন। আর এইভাবেই একটা ভালো গল্প বা মিথ আমাদের মধ্যে স্বার্থের হলেও একটা বন্ধন তৈরি করে দিবে।

পশুরা এমনকি স্তন্যপায়ীরাও এই মিথ তৈরি করতে পারে না বলে তাদের সমাজে কোন দ্রুত কোন পরিবর্তন আসে না। শিম্পাঞ্জীরা যেমন একজন আলফা মেইলের নেতৃত্বে জীবনযাপন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা তাই করে আসছে। মানুষ কিন্তু এমন না। কেবল গল্প বলেই তারা সমাজের খোলনলচে পালটে দিতে পারে। রুশো ভলতেয়াররা জাস্ট গল্প বলেই ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যুগের পর যুগ ধরে ফ্রেঞ্চ জনগণ বিশ্বাস করতো---সম্রাটই সকল ক্ষমতার উৎস। রুশো, ভলতেয়ারের গল্প পড়ে তাদের মনে হল, রাজা নয়, তারা, সামান্য মানুষেরাই আসলে সকল ক্ষমতার উৎস। ফলাফল? মাস তিনেকের ব্যবধানে তারা রাজতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

মানুষের এই এক অদ্ভূত ক্ষমতা। মানুষ স্রেফ গল্প বলেই হাজার বছরের প্রথা ও সংস্কার ভেঙে দিতে পারে। শিম্পাঞ্জীদের সমাজে কখনো দেখবেন না আলফা মেইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কেউ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রবর্তন করেছে। ওদের যে গল্প বলার কেউ নেই।

এই ব্যাপারটাই নিয়েন্ডারথালদের বিরুদ্ধেও আমাদের এগিয়ে দেয়। নিয়েন্ডারথালরা যেখানে একা একা কিংবা ছোট ছোট গ্রুপে শিকার করতে যেতো, আমরা যেতাম

বড়সড় দল বেঁধে। তারপর টার্গেটকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতাম। একা একটা নিয়েন্ডারথালের সাথে আমাদের পারার কথা না। সেই আমরাই যখন দল বেঁধে এগোতাম, কোন শক্তিই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারতো না।
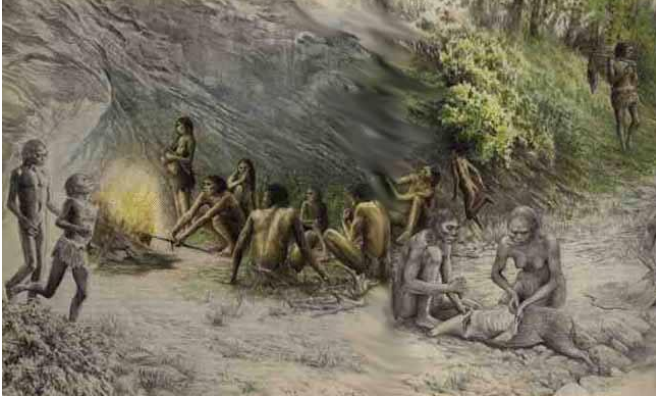
নিয়েন্ডারথালরা হয়তো একে অন্যকে বলতে পারতো---শত্রুর অবস্থান কোথায়। কিন্তু আমরা জানতাম গল্প বুনতে। সেই গল্প আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে আমাদের এক 'ইউনিটি'র স্বাদ দিত। যুদ্ধের ময়দানে চিরকালই অস্ত্রের চেয়ে এই ইউনিটি-টাই বেশি কাজ দিয়েছে। তা সে ভিয়েতনাম যুদ্ধই হোক কিংবা নিয়ান্ডারথালদের বিরুধে হোমো সেপিয়েন্সদের লড়াই।

মানবজাতির এই দীর্ঘ ইতিহাসে আমাদের ডিএনএ'র তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি, অথচ আমাদের ভেতরে বহু ওলট-পালট হয়ে গেছে। মানুষ এই ওলট-পালটে দিশেহারা হয়ে পড়ে না। কেননা, সে নিজেকে বদলে নিতে জানে। আরেকজনের বোনা মিথের সাথে সে অতি দ্রুত নিজেকে রিলেট করতে জানে।

ক্যাথলিক যাজকদের কথাই ধরুন না। এরা ধর্মের সেবায় চিরকুমার থাকার ব্রত নেন। অথচ মানুষের শরীরে 'কুমার' থাকার কোন জিন নেই। বরং শরীর জুড়ে কুমার না থাকার জিন আর হরমোনের ছড়াছড়ি। টেস্টোস্টেরন, ডোপামিন,

সেরোটোনিন। ক্যাথলিক যাজকরা তবে কীভাবে এইসব জিন আর হরমোনের ফাঁদ এড়িয়ে চলেন? এর উত্তরও আমাদের খুঁজতে হবে ক্রিশ্চান মিথের মধ্যে। মিথের শক্তি অনেক সময় আমাদের জিন আর হরমোনের চেয়েও অনেক বেশি।

গল্প বলার আর মিথ তৈরি করার এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এমন একটা লোকের কথা ভাবুন যার ১৯১৫ সালে জন্ম আর ২০১৫ সালে মৃত্যু। এই লোক ব্রিটিশ আমলে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছে, আবার পাকিস্তান আমলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন করেছে। সে হয়তো নব্বইয়ের গণআন্দোলনেও অংশ নিয়েছে। প্রতিবারই তার চারপাশে নতুন নতুন মিথ তৈরি হয়েছে। সেই মিথে সে বিশ্বাস করেছে বলেই একটা বড় ইমাজিনড রিয়েলিটির অংশ হতে পেরেছে সে। প্রতিবারই সে মিছিলে গিয়েছে। আরো হাজারটা মানুষকে মিছিলে দেখেছে। মিছিলের অংশ হতে পারাটাও কিন্তু এক ধরনের এ্যাচিভমেন্ট।

কাজেই, হোমার আর হুমায়ূন আহমেদরাই যে কেবল গল্প বলেন ---তা না। প্রতিটা সফল মানুষই আমাদের গল্প বলে চলেছেন। মুহম্মদ আমাদের বলেন, এক ভাই অন্য ভাইয়ের উপকার করতে; তবেই পরকালে মুক্তি মিলবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের গল্প বলেন। সেই গল্পই একদিন আমাদের স্বাধীনতা এনে দেয়। স্টিভ জবস আমাদের বলেন---আইফোন ব্যবহার করতে। তবেই জগতের যাবতীয় সুখ মিলবে। আমরা তার গল্পে মুগ্ধ হয়ে এ্যাপল স্টোরের সামনে রাতভর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি।

দিনশেষে ধর্ম বলেন, রাজনীতি কিংবা ব্যবসা---সকল ক্ষেত্রেই সফল মানুষেরা একজন বড় গল্পকার। আমাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন কোন গ্যাস নয়; আমাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন এই গল্পগুলোই।

অধ্যায় দুই কিস্তি শূন্য

আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ কি বিয়ের এতো বছর পরেও অন্য নারী/পুরুষ দেখলেই ছোঁক ছোঁক করেন?

আপনারা বাবার কি ডায়বেটিক? হাজারবার মানা করা সত্ত্বেও উনি কি মিষ্টি জাতীয় খাবারের লোভ সামলাতে পারেন না?

কিন্তু কেনো এই ঘটনাগুলো ঘটছে? কে দায়ী এইসবের পেছনে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে আমাদের আশেপাশে তাকিয়ে পাওয়া যাবে না। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হবে। বেশি পেছনে না। মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে। যখন আমরা শিকার আর ফলমূল সংগ্রহ করে বেঁচে ছিলাম।

আমাদের সেই আদিপুরুষদের মনস্তত্ত্ব ঘাঁটলেই আমাদের আজকের মনস্তত্ত্বের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে।

প্রথমেই আপনার বাবার সমস্যাটা সমাধান করি। কথা হল, মিষ্টি জাতীয় খাবারের প্রতি আপনার বাবার এতো আকর্ষণ কেনো? এই আকর্ষণ কি তার বাবা, তার বাবা এবং তার বাবারও ছিল?

উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো, তাদের খাবারের স্টক ছিল সীমিত। হাই ক্যালরি ফুড তো ছিল না বললেই চলে। অথচ শিকারের জন্য তো হাই ক্যালরি ফুডের দরকার। আর এই হাই ক্যালরি ফুডের একমাত্র উৎস ছিল পাকা ফলমূল। বনেজঙ্গলে তাও ছিল দুষ্কর। আমাদের গ্রেট গ্রেট দাদী-নানীরা তাই যখনই কোন পাকা ফলের সন্ধান পেতেন, অমনি ধরে তা গাপুস গুপুস খেয়ে ফেলতেন। যেন স্থানীয় বদমাইশ বেবুনের দল এর সন্ধান পাবার আগেই তারা সব ক্যালরি শরীরস্থ করে ফেলতে পারেন। বেবুনের দল মারা খাক!

এই করে করে আমাদের মস্তিষ্কে মিষ্টি জাতীয় খাবারে আসক্তির একটা সার্কিট তৈরি হয়ে গেছে। আজ হয়তো আমরা হাইরাইজ এ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করি। স্মার্টফোন

চালাই, গাড়ি ড্রাইভ করি। সেটা আমরা জানি, আমাদের ডিএনএ তো আর জানে না। সে ভাবে, আমরা বুঝি এখনো সেই সাভানার জঙ্গলে বসবাস করছি। কাজেই, মিষ্টি খাবার দেখলে আমাদের আর মাথা ঠিক থাকে না।

এবার আসি নারী-পুরুষ, প্রেম-ভালবাসা ঘটিত সমস্যায়। এর মূলেও আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপ।

মনে করা হয়, সেসময়কার সমাজে কোন ব্যক্তিগত সম্পদের কোন ধারণা ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল না বলে একগামী কোন রিলেশনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়নি সেই সময়। যতো যাই বলেন, মানুষ কিন্তু একগামী রিলেশনে আবদ্ধ হয় এবং টিকিয়ে রাখে তার সন্তানদের কথা ভেবে, নিজেদের কথা ভেবে না। আমার সন্তান যেহেতু আমার সম্পদ পাচ্ছে না, কাজেই আমার তো একগামী (হোক না লোক দেখানো) রিলেশনে থাকারও প্রয়োজন নাই---ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম।

তো নারী-পুরুষ তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একটা ছোটখাটো দল আকারে থাকতো। এক নারী যতো খুশি পুরুষের সাথে সুসম্পর্ক (ইউ নো, হোয়াট আই মীন বাই সুসম্পর্ক!) তৈরি করতে পারতো। 'ফাদারহুড' বলে কোন ধারণা তখনো চালু হয়নি। পুরুষ ছিল নারীদের কাছে এক রকমের সেক্স টয়। প্রকৃতি সন্তান চায়। সেই সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী সেই সময় পুরুষকে জাস্ট ব্যবহার করতো।

আর একজন ভালো মা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বহু পুরুষের সাথে মিলিত হতেন। যেন তার সন্তান একই সাথে দক্ষ যোদ্ধা, ভালো গল্পকার এবং প্যাশনেট প্রেমিক হতে পারে। কোন এক পুরুষের মধ্যে এই সব গুণাবলীর সম্মিলন পাওয়া দুঃসাধ্য। কাজেই, একজনের সাথে প্রেম করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তারপর সেই সন্তানদের দেখভাল করতো দলের সবাই মিলে। কোন পুরুষই জানতো না, ঠিক কোনটা তার সন্তান। কাজেই, সব শিশুকেই সমান চোখে দেখা হত।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও ঠিক এরকম একটা সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জন্মের পরপরই শিশুদের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। মা-বাবার উপর কোন দায়িত্ব থাকবে না। সেই শিশুরা রাষ্ট্রীয় সদনে সমান সুযোগ-সুবিধায় বড় হবে। কেউ জানবে না, তার বাবা-মা কে। বাবা-মা'রাও জানবে না, তাদের সন্তান কোনটি। একটা নির্দিষ্ট এইজ গ্যাপের সবাইকেই সেই শিশুটি বড় হয়ে বাবা বা মা ডাকবে। ব্যাপারটা অবাস্তব শোনালেও প্লেটো সম্ভবত সমাজে বিদ্যমান পাহাড়সম শ্রেণীবৈষম্য রোধে এরকম একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন।

ওয়েল, এমন সমাজ যে একেবারেই নেই, তা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না। আমাদের দূর সম্পর্কের ভাই শিম্পাঞ্জী ও বোনোবোদের মধ্যে তো বটেই, আজকের যুগেও বারি ইন্ডিয়ান নামক এক নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এরকম কালেক্টিভ ফাদারহুডের চর্চা চালু আছে। এরা বিশ্বাস করে, কেবল এক পুরুষের স্পার্ম থেকেই সন্তানের জন্ম হয় না। বহু পুরুষের স্পার্ম এক নারীর গর্ভে পুঞ্জীভূত হয়ে তবেই সন্তানের জন্ম হয়।

প্রাচীন মানুষ যে সব দিক দিয়ে ভুল ছিল---তা কিন্তু না। তাদের এইসব আপাত আজগুবি ধারণার মধ্যেও কিছু কিছু সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখে গেছে, কোন নারী যদি বিয়ের আগে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে থাকেন, তবে তার সন্তানের মধ্যে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা খারাপ না, কী বলেন? একই মানুষের মধ্যে একিলিস থাকবে, হোমার থাকবে, আবার রোমিও-ও থাকবে!

যাই হোক, সোজা কথা, মনোগ্যামী আসলে আমাদের রক্তে নেই। আমাদের রক্তে প্রবল উল্লাসে বয়ে চলেছে পলিগ্যামীর স্রোত। এটা নারী-পুরুষ সবার জন্যই সত্য।

আর এজন্যই ভালবেসে বিয়ে করার পরও আমাদের মধ্যে এতো ঝগড়া, এতো অশান্তি। আমাদের জিনে জিনে যে বহুগামীতার রাজত্ব। অথচ আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ আমাদের উৎসাহিত করছে একগামী হতে। ভালবেসে, সুখে শান্তিতে বসবাস করে সৎ, চরিত্রবান স্বামী/স্ত্রীর খেতাব পেতে। আমাদের মধ্যে যে ডিপ্রেশন, যে একাকীত্ব আর নিঃসংগতা, তার কারণ বোধয় সেই দলবদ্ধ জীবন যাপন ছেড়ে জোর করে একগামী হবার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন হচ্ছে---নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিগুলো এখনো তাইলে টিকে আছে কীভাবে? পরকীয়ার প্রভাবে তো সব উড়ে যাওয়ার কথা।

এই ব্যাপারে আরেক দল মনস্তাত্ত্বিকের অন্যরকম থিওরি আছে। তারা বলেন, মানুষ স্বভাবতই মনোগ্যামাস এবং তার পার্টনারের ব্যাপারে পজেসিভ। অন্তত আমাদের ভাই-বেরাদরের তুলনায় আমরা অনেক বেশি মনোগ্যামাস। বাইরে আপনি যতোই প্রগতিশীল ভাব দেখান না কেনো, আপনার বউ/গার্লফ্রেন্ড আরেকজন পটেনশিয়াল পুরুষের গায়ে ঢলে পড়ে হেসে হেসে কথা বললে আপনার মধ্যে একটু হলেও খচখচ করবে। ব্যাপারটা মেয়েদের জন্যেও সত্য।

এই থিওরিস্টরা বলেন, প্রাচীন সমাজেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল। এরা দল বেঁধে থাকলেও যাকে বলে 'ফ্রি সেক্স' তা এদের মধ্যে ছিল না। কাপলরা নিজেদের মত করে থাকতো। নিজেদের বাচ্চা নিজেরাই সামলাতো। বিপদে-আপদে পড়লে কেবল দলের অন্যদের সাহায্য নিত। নিজেদের সন্তানের প্রতি আমাদের যে এক ধরনের অন্ধত্ব কাজ করে, সে কাউকে খুন করে আসলেও মা যে তাকে ফেলে দিতে পারেনা না---এই ব্যাপারটা তখন থেকেই আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে।

পার্টনারের ক্ষত্রেও ব্যাপারটা তাই। আপনি হয়তো সবার কাছে আপনার পার্টনারের হাজারটা বদনাম করে বেড়ান। কিন্তু অন্য কেউ আপনার পার্টনারকে সামান্য সময়ের

জন্যও দখল করতে এলেও ঠিকই আবার বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান। এই যে পজেসিভনেস, এইটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই আমাদের রক্তে বাহিত হয়ে আসছে।

অনেকে বলেন, আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে বিয়ে টিকে থাকার কথা না। এখনো যে টিকে আছে, তার কারণ বোধয় বহু বছরের এই অভ্যাস। নেক্সট টাইম আপনার পার্টনার যদি আপনাকে নিয়ে একটু পজেসিভ হয়ও, তাকে ভুল বুঝবেন না প্লিজ। সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের ফসল!

দুই কিস্তি এক

শারীরিক দিক দিয়ে তো বটেই, স্রেফ মগজের দিক দিয়েও আমাদের শিকারী পূর্বপুরুষেরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। অন্তত তথ্য প্রমাণ তাই বলে। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য, গত তিরিশ হাজার বছরে আমাদের মগজের তেমন উন্নতি হয়নি; বরং কিছুটা অবনতি হয়েছে বলা যায়।

তাহলে এই যে আমাদের আধুনিক সভ্যতা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্পেসশিপ---এগুলো কার অবদান? কোন ভিনগ্রহী এসে তো এগুলো তৈরি করে দিয়ে যায়নি। এগুলো আমাদের মগজেরই অবদান। সত্যি করে বললে, আমাদের কালেক্টিভ মগজের। ইনডিভিজুয়াল মগজের সাইজ সত্যিই কমেছে।

প্রাচীন মানুষ ছিল ভয়াবহ লেভেলের জ্ঞানী। সারভাইভালের জন্যই তাদের জ্ঞানী না হয়ে উপায় ছিল না। আজ একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার জগৎ-সংসার, পাড়া-প্রতিবেশী সম্বন্ধে কিছু না জেনেই দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। প্রাচীন মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। নিজেদের এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি সম্বন্ধে তাদের নিখুঁত জ্ঞান রাখতে হত। আমরা যেখানে গুগল ম্যাপ ছাড়া পাশের গলিতে ওয়ালমার্ট আছে কিনা, তাও বলতে পারি না।

খাবার সংগ্রহের কথাই ধরা যাক না কেন। কোন ফল কখন হয়, সেই জ্ঞান তো তাদের ছিলই, প্রতিবেশী বানর কিংবা হনুমানের দল এগজ্যাক্টলি কখন সেই ফলে আক্রমণ করে বসবে, সেই জ্ঞানও তাদের রাখতে হত। এইখানেই শেষ নয়। কোন ফল খেতে মজা, কোন ফলে বিষ আছে আর কোন ফল রোগবালাইয়ে ওষুধের কাজ দিবে---এই সব তাদের নখদর্পণে ছিল। এগুলো ছিল সেকালের সাধারণ জ্ঞান।

প্রত্যেক ইনডিভিজুয়ালকে এই জ্ঞানটুকু রাখতে হত। কোন ডাক্তার-বৈদ্য যেহেতু ছিল না তাদের বলে দেবার জন্য কিংবা লিখিত ভাষাও চালু হয়নি যে ফলের গায়ে কোন নিঃস্বার্থ মানুষ এসে লিখে রাখবেঃ "সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ এই ফলে বিষ আছে; এই ফল খাবেন না!
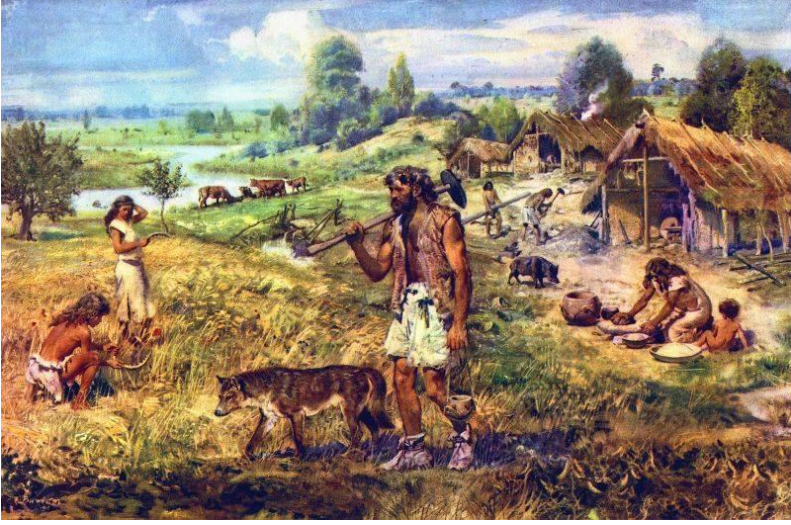
পশু শিকারের জন্য তাদের প্রয়োজন হত হাতিয়ার। এই হাতিয়ারও ছিল হিজ হিজ হুজ হুজ। সেই সময় মানুষ তাই ব্যবহার করতো, যা সে নিজে তৈরি করতো। ধরা যাক দুই একটা হারপুন এবার। যে লোকটা হারপুন বানাতো, সেই ঐ হারপুন দিয়ে শিকার করতো। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যবহার্যই তাই। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে গোটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের খুঁটিনাটি সে জানতো। আর ভালো শিকারের জন্য দরকার ভালো হারপুন। নিজের হারপুনকে সেরা শেপটা দেবার জন্য তাকে মগজ খাটাতেই হত।

আজ তার কুলাঙ্গার বংশধর কম্পিউটার ব্যবহার করে, সে কিন্তু জানে না, কম্পিউটার কীভাবে তৈরি হয়। কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে--এটাও সে জানে না। অথচ সে

মনের আনন্দে সে কম্পিউটারে চ্যাট করে চলেছে। এর নামই টেকনোলজি। যা আমাদের মাথা না খাটিয়ে সুবিধাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার সুযোগ এনে দেয়, তাই টেকনোলজি।

ক্যালকুলাস যেমন গণিতের একটা শাখা। কিন্তু ক্যালকুলাসের সুত্রগুলো আপনি না বুঝেও আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। sinX কে ডিফারেনশিয়েট করলে cosX পাওয়া যায়। এটা আমরা সবাই জানি। কীভাবে পাওয়া যায়---এটা না বুঝলেও কিন্তু আপনি পরীক্ষার খাতায় নম্বর পেয়ে যাচ্ছেন কিংবা ফিজিক্সের একটা থিওরি প্রমাণ করতে কাজে লাগাতে পারছেন। এই ক্ষেত্রে ক্যালকুলাস কিন্তু গণিত বা বিজ্ঞান নয়, ক্যালকুলাস একটা প্রযুক্তি।

প্রাচীন মানুষের কাছে হাতিয়ার ছিল, কিন্তু সেই অর্থে টেকনোলজি ছিল না। পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস তখনো তৈরি হয় নি যে কোন একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার দলের সব হারপুন তৈরি করবে। বাকি সবাই তা নিয়ে শিকারে বেরোবে। কাজেই, এখন আমরা একটা বস্তুর ফিজিক্স নিয়ে যতো গভীরভাবে চিন্তা করি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তার চেয়েও বেশি চিন্তা করতেন। চিন্তা করতে বাধ্য হতেন বলা যায়। ফলে, তাদের মগজের ব্যবহারও ছিল বেশি। আমরা যে দিন দিন আমাদের মগজের ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছি, তা নিয়ে কখনো ভেবেছি কি?

লাইফস্টাইলের দিক দিয়েও তারা আমাদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন। আজ একজন কর্পোরেট মানুষের ঘুম ভাঙে সকাল সাতটায়। কোনোভাবে নাশতা করে তাকে অফিসের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে হয়। তারপর আট কি দশ ঘণ্টা অমানুষিক খাটা খেটে রাতে বাসায় ফিরে আর কিছু করার এনার্জি থাকে না আসলে। তা বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলাই হোক কিংবা স্ত্রীর সাথে!

অথচ ত্রিশ হাজার বছর আগে সেই একই মানুষটি সকাল নয়টা কি দশটায় হেলেদুলে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বের হত। ফলমুল, মাশরুম সংগ্রহ করে দিন কাটাতো। মাঝেমধ্যে ভুল করে বাঘ মামার টেরিটোরিতে ঢুকে পড়েই আবার দৌড়ে পালাতো। চারটার দিকে বাসায় ফিরে পরিবারের সবাই মিলে রান্নাবান্না করতো। বাচ্চাদের সাথে খেলতো। বাঘ মামার হাত থেকে বেঁচে আসার গল্প শোনাতো।
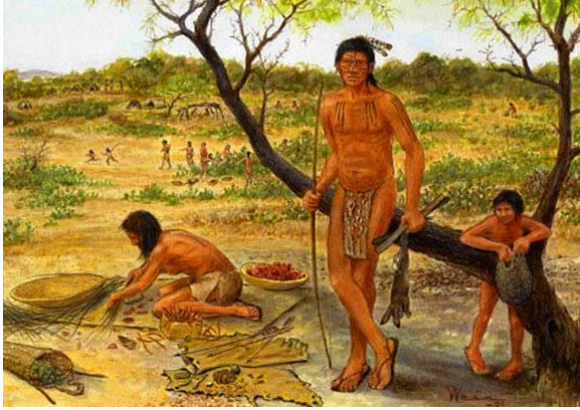
সপ্তাহে পাঁচদিন বা ছয়দিন যে সে এই রুটিন ফলো করতো---তাও নয়। বড়জোর দুই কি তিন দিন। অনেক সময় ভালো একটা শিকার পেলে গোটা সপ্তাহই পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিত। কাজেই, হ্যাংআউট করার জন্য তাদের হাতে ছিল অফুরন্ত সময়। আজ আমাদের হ্যাঙ্গাউট করার জন্য কতো প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হয়। নিজের স্কেজিউল দেখতে হয়। বসের স্কেজিউল দেখতে হয়। তাদের এইসব স্কেজিউল দেখার প্যারা ছিল না। পরিবারের সবাই মিলে যখন খুশি যেখানে খুশি হ্যাং আউট করতে যেত। আগে থেকে বুকিং করারও ঝামেলা ছিল না।

দুর্ভিক্ষ বা অপুষ্টি কাকে বলে---তারা জানতো না। দুর্ভিক্ষ তো কৃষিযুগের সৃষ্টি আর অপুষ্টি আধুনিক শিল্পযুগের। তাদের গড় আয়ু হয়তো খুব বেশি ছিল না। তিরিশ কি

চল্লিশ বছর। তার কারণ অধিক শিশু মৃত্যুহার। কিন্তু যারা অল্প বয়সে সারভাইভ করে যেতো, তারা ঠিকই বছর ষাটেক সুস্থ সবল বেঁচে থাকতো।

তাদের এই ভাল থাকার রহস্য ছিল তাদের বৈচিত্র্যময় খাবারের মেন্যু। আমাদের দেশে একজন কৃষক যেখানে সকালের নাস্তায় ভাত খান, দুপুরের লাঞ্চে ভাত খান এবং রাতের ডিনারেও ভাত খান, সেখানে এই মানুষেরা সকালে হয়তো খেতো আঙুর আর মাশরুম, দুপুরে কচ্ছপের ফ্রাই আর রাতে খরগোশের স্টীক। পরের দিন আবার মেন্যু বদলে যেতো। এই করে করে সব রকম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবারই তাদের খাওয়া হয়ে যেতো।

পরবর্তীতে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ কোন একটা ফসলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে একে তো সব রকম পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবারে ছেড়ে এক শর্করার দিকে ঝুঁকে পড়ায় মানবজাতির সামগ্রিক স্বাস্থ্য আগের তুলনায় খারাপ হয়ে পড়ে, তার উপর এক বছর ধান না হলে পুরো দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে যেতো। শিকারী সমাজ এই দিকে দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কোন একটা নির্দিষ্ট ফসলের উপর এদের নির্ভরশীলতা না থাকায় বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস---যাই হোক না কেন---এদের খাবার ম্যানেজ হয়ে যেত। আর কিছু না হোক, বার রকমের ফলমূল তো আছেই।

আমাদের যাবতীয় রোগবালাইয়ের জন্মও এই কৃষি সমাজে এসে। যতো রকম সংক্রামক রোগ আছে---হাম, যক্ষ্মা, বসন্ত---সব কিছুর জীবাণু আমাদের এই গবাদি পশু থেকে পাওয়া। আরেকটা কারণ এমন---কৃষি আর শিল্পভিত্তিক সমাজেই মানুষ অল্প জায়গায় অনেক মানুষ খুব ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করে। শিকারী সমাজে এর বালাই ছিল না। মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। কোন এক এলাকায় রোগের বিস্তার হলে সেই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতো। মহামারী বিস্তৃত হবার চান্সই পেত না।

তাই বলে যে প্রাচীন মানুষের সব কিছুই যা ভালো ছিল---তা নয়। এই যে মহামারী বিস্তৃত হবার চান্স পেত না, তার কারণ হচ্ছে সেই সমাজে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফেলে সবাই অন্য কোথাও চলে যেত। বৃদ্ধদের অবস্থা তো ছিল আরো করুণ। বৃদ্ধ মাত্রই একটা দলের জন্য বোঝা। তো সেই বোঝা ঘাড় থেকে নামানোর জন্য তারা বৃদ্ধের কাঁধে কুড়োল দিয়ে আঘাত করে তাকে পরপারে পৌঁছে দিত। এই একটা দিকে আমরা আধুনিক মানুষ অনেক সভ্য হয়েছি বলা যায়। আমরা আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মা কে কুড়োল দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলি না। বড়জোর বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে আসি।

শিশু হত্যা তো ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। অবশ্য শিশু হত্যার এই রেওয়াজ আমরা মধ্যযুগে আরবে আর তারও আগে গ্রীক সমাজে দেখেছি। শিশু জন্মগতভাবে দুর্বল বা ভগ্নস্বাস্থ্য হল এই শিশু সমাজের কোন কাজে আসবে না ভেবে তাকে হত্যা করতো। এই সেদিন পর্যন্ত প্যারাগুয়েতে আচে নামক এক জনগোষ্ঠী বাস করতো, যাদের জীবনধারা খুঁটিয়ে দেখলে প্রাচীন মানুষের জীবন আচরণের কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। এরা এই আরব বা গ্রীকদের চেয়েও ছিল এক ধাপ এগিয়ে। শিশুর মাথায় চুল কম, তাকে মেরে ফেলো। শিশুটির চেহারা জোকার জোকার টাইপ---তাকে মেরে ফেলো। কিংবা দলে মেয়ে বেশি হয়ে গেছে। আর মেয়ের দরকার নাই। কাজেই, এই মেয়ে শিশুটিকে মেরে ফেলো।

আমাদের ডেফিনিশন অনুযায়ী এগুলো হিংস্রতা। ওদের ডিকশনারীতে হয়তো এগুলোকে হিংস্রতা ধরা হত না। আমরা যেমন অবলীলায় মানবশিশুর ভ্রূণ মেরে ফেলি, ওরাও ঠিক তেমনি অদরকারি মানব শিশু মেরে ফেলতো। আফটার অল, মানুষ তো। কিছু নির্বিকার হিংস্রতা আমাদের রক্তে, ইতিহাসে বেশ ভালোভাবেই আছে।

দুই কিস্তি দুই

এই ছবিটা ১২ থেকে ২০ হাজার বছর আগে আঁকা। ছবিটা পাওয়া গেছে ফ্রান্সের দক্ষিণে লাসকাউ নামের এক গুহায়।

ছবিটায় আমরা একজন মরা মানুষ দেখতে পাচ্ছি। বাইসনের আক্রমণে যার মৃত্যু হয়েছে। মানুষটির মুখে পাখির আদল। কেন---আমরা জানি না। মৃত্যুর পরও মানুষটির পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়ে আছে। কেন---তাও আমরা জানি না। মানুষটির পাশেই আরেকটা পাখি দেখতে পাচ্ছি আমরা। স্কলাররা বলেন---এই পাখি আমাদের আত্মার প্রতীক। বাইসনের আক্রমণে মানুষটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারূপী পাখিটি খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে।

কথা হচ্ছে----শিকারী মানুষেরা কি সত্যিই এতো গভীর অর্থ ভেবে ছবিটি এঁকেছিল? না এগুলো আমাদের ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেরপ্রিটেশন? টাইম মেশিনে করে অতীতে যাওয়া ছাড়া এই রহস্য ভেদ করার আসলে কোন উপায় নেই।

আর এই ছবিটা প্রায় ৯ হাজার বছর আগের। পাওয়া গেছে আর্জেন্টিনার এক গুহায়। তখনো মানুষ শিকারী দশা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে মানুষ যে উন্নতি করছে---তার সমস্ত রকম লক্ষণ এই ছবিতে বিদ্যমান। এই ছবিকে বলা হয় শিকারী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই চিত্রকর্মের তাৎপর্যও আমরা সঠিক জানি না। আমি নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম---পৃথিবীর মানুষ পাপে ডুবে আছে। এবং মানুষ সেটা জানেও। সমস্ত মানুষ এই পাপের গহবর থেকে মুক্তির জন্য হাত বাড়িয়েছে। আশা---কোন এক ঈশ্বর বা পয়গম্বর এসে তাদের এই অতল গহবর থেলে টেনে তুলবে।

যথারীতি, আপনাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আর আর্টের মূল সৌন্দর্য তো এটাই। কোন ব্যাখ্যাই সঠিক না। আবার সব ব্যাখ্যাই সঠিক!

এই চিত্রকর্মগুলো আসলে আমাদের এক অদেখা ভুবনে নিয়ে যায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন ছিল, তাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কার---এগুলো কেমন ছিল---তা বোঝার জন্য এই চিত্রকর্ম ছাড়া আমাদের হাতে খুব বেশি মালমশলা নেই। এই মালমশলাগুলো জোড়া লাগিয়েই আমরা আসলে আমাদের ইতিহাস নির্মাণ করি।

ইতিহাসে তাই ধ্রুব সত্যি বলতে কিছু নেই। ইতিহাস আসলে আমাদের কল্পনার সবচেয়ে লজিক্যাল রূপায়ন।

ওয়েল, চিত্রকর্ম ছাড়া আমাদের হাতে আর যা আছে, তা হল সেই আমলের কিছু ফসিল। বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়! ঠিক তেমনি মানুষ তোমার কর্ম কী, ফসিলে পরিচয়!

প্রত্নতাত্বিকরা যেমন রাশিয়ায় তিরিশ হাজার বছর আগের এক কবর আবিষ্কার করেন। কবরটিতে তারা পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এক লোকের কঙ্কাল পান যার সারা দেহ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি মালা দিয়ে ঢাকা। হাতির দাঁত যে সেকালে বেশ দামী বস্তু ছিল, তা প্রাচীন ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন।

সামান্য আইডিয়ার জন্য **'রিভার গড'** পড়ে দেখতে পারেন। কিঞ্চিৎ মোটা বই। জীবন থেকে কয়েক ঘণ্টা মূল্যবান সময় চলে যাবে। কিন্তু আল্টিমেটলি ঠকবেন না----কথা দিচ্ছি।

লোকটার হাতে ছিল হাতির দাঁতের ব্রেসলেট। আশেপাশে আরো কিছু কবরে এরকম বাহারি মালার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ওগুলোতে পুঁতির সংখ্যা ছিল কম। এই থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ধারণা করেন---এই ব্যাটা নিশ্চয়ই দলের লীডার ছিল। এজন্যই

তার কবরে হাতির দাঁতের ছড়াছড়ি। কে বলে প্রাচীন সমাজ সাম্যবাদী সমাজ ছিল! কেবল খাদ্যের দিক থেকে হয়তো ছিল। কিন্তু সামাজিক স্ট্যাটাস নির্ণয় করে যে উপাদানগুলো---সেদিক দিয়ে প্রাচীন সমাজ আজকের মতই বৈষম্য ও অনাচারে ভর্তি ছিল। তফাৎ এটুকুই---আমাদের সমাজে এই নির্ণায়কগুলো ফ্ল্যাট, গাড়ি-বাড়ি, তাদের সমাজে ছিল হাতের দাঁতের তৈরি গহনা।

অবশ্য এর চেয়েও বড় বিস্ময় প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিল। একটা কবরে তো দুটো কঙ্কালের খোঁজ পাওয়া গেলো। কঙ্কাল দুটো আবার উলটো দিকে করে মাথায় মাথায় লাগানো। একটা কঙ্কাল বার-তের বছর বয়সী একটা ছেলের। আরেকটা নয়-দশ বছর বয়সী একটা মেয়ের। প্রত্যেকের শরীরই হাতির দাঁতের তৈরি হাজার পাঁচেক পুঁতি দিয়ে ঢাকা। একটা পুঁতি নিখুঁতভাবে তৈরি করতে একজন শ্রমিকের পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগার কথা। সেই হিসেবে হাজার দশেক পুঁতি তৈরি করতে সাড়ে সাত হাজার শ্রমঘণ্টা লাগবে একজন শ্রমিকের। সোজা বাংলায় তিন বছরের মত। কার ঠেকা পড়সে তিন বছর খেটে এরকম মালা তৈরি করবে? আর মৃত্যুর পর এরা নিশ্চয়ই মালা তৈরির জন্য তিন বছর অপেক্ষা করেনি। তার মানে একদল মানুষ মিলে অতি অল্প সময়ে এই গহনাগুলো তৈরি করেছে।

এখন দলনেতাকে না হয় গহনা-টহনা পরিয়ে কবর দেয় যায়। এই বাচ্চাকাচ্চাকে কেনো? একদল বলেন, এরা সাধারণ বাচ্চাকাচ্চা না। এরা দলপতির সন্তান। কাজেই, এদের অকাল মৃত্যুতে দলপতি যে সম্মান পেত, এরাও সেই সম্মানই পাবে। 'রিচ কিডস অফ ঢাকা'রা যেমন পায় আরকি!

আরেকদল বলেন, এদের সম্ভবত কোন রিচুয়ালের অংশ হিসেবে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়েছিল। কাজেই, এতো সম্মান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে---মানুষ এই দেবতার আইডিয়া পেলো কোথা থেকে? এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব না। তবে এটুকু অনেকটা নিশ্চিৎ, মানুষের মধ্যে প্রথম যে ধর্মের বিকাশ ঘটে----তাকে বলা যায় এনিমিজন। এনিমিজম এর বাংলা হতে পারে প্রাণীপূজা, বেটার হয় আত্মাপূজা বললে। এরা বিশ্বাস করতো---সব কিছুর মধ্যেই আত্মা বিরাজমান। সামান্য এই পাথর---সেই পাথরও চাইলে আমাদের জন্য দোয়া করতে পারে কিংবা আমাদের অভিশাপ দিতে পারে। খালি পাথরই নয়, বাড়ির পাশে যে পাকুড় বৃক্ষ কিবা বয়ে যাওয়া নদী---প্রত্যেকেরই আত্মা আছে। মানুষ যে যুগ যুগ ধরে এদের পূজা করে আসছে---তা এই বিশ্বাস থেকেই।

বস্তুজগতের সাথে মানুষের এই যে আত্মার সম্পর্ক---এটা কিন্তু নতুন নয়। বহুদিন একটা মোবাইল সেট ব্যবহার করে দেখবেন, ঐ সেটটার প্রতি মায়া পড়ে যাবে। বাজারে নতুন স্মার্টফোন এলেও সেটা তখন আর ফেলে দিতে ইচ্ছা হবে না। যারা ঋত্বিকের (ঋত্বিক রোশন না, ঋত্বিক ঘটক!) 'অযান্ত্রিক' দেখেছেন, তারা ব্যাপারটা আরো ভালো রিলেট করতে পারবেন। গল্পে নায়কের পেটে ভাত নেই, কিন্তু সে তার প্রিয় গাড়িটা তবু বেঁচবে না। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, গাড়িটার একটা প্রাণ আছে, আত্মা আছে। গাড়িটা বেঁচে দিলে সে নিজে যেমন প্রেমিকা হারানোর ব্যথায় কষ্ট পাবে, গাড়িটাও কম দুঃখ পাবে না।

এনিমিস্টরা বিশ্বাস করে---মানুষ আর তার আশেপাশের সত্তার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, কোন হায়ারার্কি নেই। মানুষের জন্য সবাই, আবার সবার জন্য মানুষ। একজন শিকারী যেমন নাচ-গান সেরেমনির মাধ্যমে একদল হরিণকে তাদের ডেরায় ইনভাইট করতে পারে। তারপর তাদের রিকোয়স্ট করতে পারে---হরিণের দলের একজন যেন স্বেচ্ছায় আত্মউৎসর্গ করে। তাদের বিশ্বাস ছিল, ঠিকমত মেসেজ দিতে পারলে হরিণের কাছেও মেসেজ পৌঁছানো সম্ভব। হরিণ যদি নিজে থেকেই নিজেকে কুরবানী করে তো ভালো, না হলে হরিণ শিকার করে পরে মাফটাফ চেয়ে নিলেই হবে।

এইখান থেকেই সম্ভবত ধারণা আসে যে, হরিণের কাছে মেসেজ পৌঁছানো গেলে মৃত আত্মার কাছে পৌঁছানো যাবে না কেন? এইখান থেকেই প্রাচীন সমাজে শামানের উৎপত্তি। শামানদের কাজ ছিল এই জগতের মানুষের সাথে অন্য জগতের মানুষের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া। এই অন্য জগৎ মানে নট নেসেসারিলি পরজগৎ। অনন্ত অসীম পরজগত কিংবা একক ঈশ্বরের ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষ মরে গেলেও যে তার আত্মা মরে না আর সেই আত্মা জীবিতাবস্থায় তার কাছের মানুষদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়, তাদের ভাল করে কিংবা অনিষ্ট করে---এই ব্যাপারে তাদের একটা পাকাপাকি রকম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল।

অবশ্য আবারও ঐ একই কথা। পুরোপুরি নিশ্চিৎ করে আমরা কিছুই বলতে পারি না। অতীতকে ডিকোড করার জন্য আমাদের হাতে যে সামান্য কিছু চিত্রকর্ম আর ফসিল ছাড়া তেমন কিছু নেই!

দুই কিস্তি শেষ

বলা হয়, আমরা সবাই কাবিলের সন্তান। বড় ভাই কাবিল ছোট ভাই হাবিলকে খুন করে পৃথিবীতে তার লিগ্যাসী প্রতিষ্ঠা করে গেছে। কাজেই, অল্পবিস্তর খুনে সত্তা আমাদের সবার মধ্যেই কমবেশি আছে। কারোটা প্রকাশ্য, কারোটা শিক্ষা-সংস্কৃতির মোড়কে এখনো ঢাকা পড়ে আছে।

এই হাবিল-কাবিলের যে গল্পটা আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, তাতে কিছুটা ফাঁকি আছে। হাবিল ভালো আর কাবিল খারাপ---এই বাইনারীর ছাঁচে পুরো ঘটনা ফেলতে গিয়ে মূল বিষয়টাই আমাদের স্পর্শ করা হয় না; কেননা পৃথিবীর বাকি অর্ধেক গল্পের মতই এই গল্পের মূলেও আছে সেক্স।

হাবিল-কাবিল দুই ভাই। এতোদূর পর্যন্ত গল্পটা ঠিকঠাক এগোয়। সমস্যাটা হয় তখনই, যখন হাবিলের সাথে তার এক যমজ বোনের জন্ম হয়। আর কাবিলের সাথে জন্ম নেয় আরেক যমজ বোন।

এখন হাবিল-কাবিল হচ্ছে আদমের দুই সন্তান। পৃথিবীতে তখন মানুষ বা জনপ্রাণী বলতে আর কেউ নেই। কাজেই, মানবজাতির বংশরক্ষার জন্য আপন বোনকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোন গতি ছিল না।

আল্লাহ তখন একটা নিয়ম করে দিলেন। হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজ বোনকে। কাবিলের ক্ষেত্রে সেটা ভাইস ভার্সা।

এখন দেখা দিল আসল সমস্যা। কাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজ বোনটা বেশি সুন্দরী। কাবিল তাকেই বিয়ে করতে চায়। এদিকে হাবিল আল্লাহর আদেশের ভয়েই হোক কিংবা কাবিলের যমজের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই হোক---সেও তাকেই বিয়ে করতে চায়। হাবিলের সাথে জন্ম নেয়া যমজটার ওদিকে কোন খবর নেই। সে সুন্দরী নয় বলে কেউ তাকে পাত্তা দেয় না!

কাজেই, সুন্দরী মেয়েরা সামান্য ভাব নিলেও এতে রাগ করার কিছু নেই! সৃষ্টির শুরু থেকেই এমনটা চলে আসছে!

যাই হোক, আদম তখন তাদের একটা প্রস্তাব দিলেন। দু'জনকে বললেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু একটা কুরবানী দিতে। যার কুরবানীতে আল্লাহ লাইক দিবেন, সেই কাবিলের যমজ বোনকে পাবে।

কাবিল কিছু শস্য অফার করলো আল্লাহকে। আর হাবিল দিল একটা সুস্থ সবল ছাগল। বলা বাহুল্য, হাবিলের কুরবানী কবুল হল।

কাবিল মনে করলো, এই সব তার বাপের কারসাজী। হাবিল তার বাপ আদমের পছন্দের ছেলে বলে আদম তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেছে।

বাকি ইতিহাস আমাদের জানা। কাবিল হাবিলকে মেরে ফেললো। এইখানেই গল্প শেষ নয়। মেরে ফেলার পর সে বিরাট অনুতপ্ত হল। আর হাবিলের লাশ নিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকলো।

হাবিল-কাবিলের এই মিথ যে কেবল আব্রাহামিক কালচারেই সীমাবদ্ধ---তা নয়। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠার পেছনেও এমন একটা মিথ চালু আছে। দুই ভাইয়ের যুদ্ধ ও রক্ত থেকে রোম নগরীর পত্তন। একই মিথ সম্ভবত এক এক জায়গায় এক একভাবে ছড়িয়েছে। আসল কথা, মানবজাতির ভায়োলেন্সের ইতিহাস খুব নতুন কিছু নয়।

বাস্তবে ভায়োলেন্স ছিল বলেই মিথে সেটা বারবার এসেছে। কাজেই, মিথ ছেড়ে এবার বাস্তবে আসি। পর্তুগালে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ করে দেখা গেলো, ৪০০ কঙ্কালের মধ্যে মাত্র দুটোতে ভায়োলেন্সের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে ইসরায়েলেও। এখানে ৪০০ কঙ্কালের মধ্যে মাত্র একটিতে ভায়োলেন্সের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই ফলাফলগুলো মানুষের হিংস্রতার সপক্ষে খুব জোরালো প্রমাণ নয়। ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট পাওয়া গেছে দানিউব উপত্যকায়। এখানে ৪০০ কংকালের ১৮টিতে ভায়োলেন্সের প্রমাণ স্পষ্ট। শুনে সংখ্যাটা কম মনে হতে পারে। কিন্তু পার্সেন্টেজ করলে ব্যাপারটার ভয়াবহতা বোঝা যাবে। জরিপের ফলাফলকে সঠিক ধরলে বলতে হয়, শতকরা ৪.৫ ভাগ মানুষ সে উপত্যকায় মারামারি খুনোখুনি করে মরতো। আজ এই পার্সেন্টেজ নেমে এসেছে ১.৫ এ। সমস্ত যুদ্ধ, টেরোরিস্ট এ্যাটাক আর লোকাল সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস মিলিয়েই। তাইলেই বোঝেন, দানিয়ুব উপত্যকার মানুষ সেকালে কীরকম হিংস্র ছিল। এর সাথে কেবল তুলনা দেয়া যায় বিশ শতকের হিংস্রতার। লিখিত ইতিহাসে মানবজাতি সবচেয়ে বাজে সময় পার করেছে বিশ শতকে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। ফলাফল---বিশ শতকে প্রতি ১০০ জনে ৫ জন ভায়োলেন্সে মরেছে।

হাবিল-কাবিলের গল্প বড়জোর ৬ হাজার বছর পুরানো। সুদানেই ১২ হাজার বছর আগের এক কবরস্থানে ৫৯টা এমন কঙ্কাল পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২৪টার গায়েই তীরের ফলার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এক মহিলার গায়ে তো রীতিমত ১২টা ক্ষতচিহ্ন। যুদ্ধ শেষে পরাজিত গোত্রের নারীদের সাথে কী ব্যবহার করা হয়---আমরা সবাই জানি। এই কালচার হঠাৎ মধ্যযুগে তৈরি হয়নি। বহু আগে থেকেই এই নেশা আমাদের রক্তে মিশে আছে।

ব্যাভারিয়া (আজকের জার্মানিতে) জাস্ট একটা কবরের মধ্যেই খালি নারী ও শিশুদের লাশ পাওয়া গেছে। কোনরকম যত্ন ছাড়াই স্তূপ করে রাখা লাশ। প্রতিটা লাশই সেকালের অস্ত্র দিয়ে ভয়ানক রকম খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা। অল্প যে ক'টা পুরুষ কঙ্কাল পাওয়া গেছে, প্রতিটাতেই অত্যাচারের চিহ্ন আরো ভয়াবহ। বোঝাই যায়, কোন এক গোত্রের উপর সেসময় গণহত্যা হয়েছে। হত্যা শেষে সবগুলো লাশ নির্মমভাবে এক কবরে চাপা দেয়া হয়েছে। এর সাথে কেবল তুলনা চলে নাৎসী জার্মানদের কিংবা ৭১ সালে পাকিস্তানিদের বর্বরতার।

আমাদের হাতে এভিডেন্স আসলে খুব কম। কাজেই আমরা নিশ্চিৎ করে বলতে পারছি না অধিকাংশ মানুষ পর্তুগাল আর ইসরায়েলের সেকালের অধিবাসীদের মত শান্তশিষ্ট ছিল না দানিউব উপত্যকার মত খুনে, রক্তলোলুপ ছিল।

তবে সেকালের দানিয়ুব বা সুদানের তুলনায় কিংবা এই তো সেদিনের বিশ শতকের তুলনায় আমরা যে এখনো অনেক ভালো আছি---একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। শতাব্দীর শেষাবধি এই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখতে পারি কিনা---সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন!

অধ্যায় তিন কিস্তি শূন্য

ভুলগুলো যে আমরা ইচ্ছে করে করি---তা না। বহু বছরের অভ্যাসের ফসল এই ভুলগুলো।
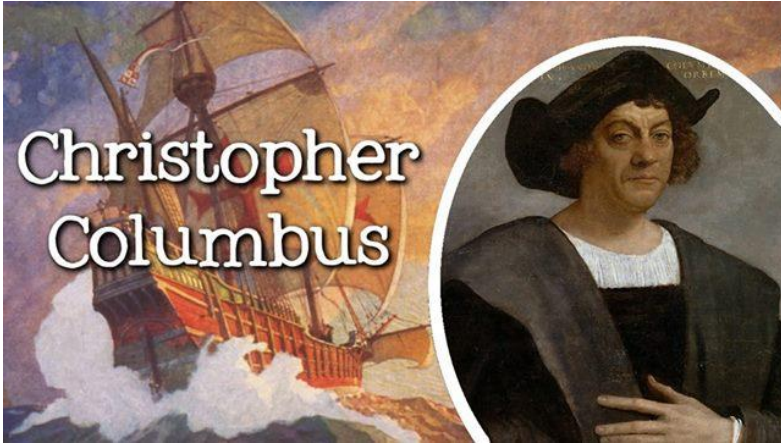
যেমন কলম্বাসকে আমরা আমেরিকার আবিষ্কর্তা ধরি। কিংবা জেমস কুককে অস্ট্রেলিয়ার। অথচ এই মানুষেরা আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের বহু আগে থেকেই সেখানে মানুষ বসবাস করতো।

৪৫ হাজার বছর আগেই যেমন মানুষ অস্ট্রেলিয়ার বুকে প্রথম পা রাখে। যে মানুষটি প্রথম আফ্রো-এশিয়ার গণ্ডী ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ার বুকে তার পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, তার নাম-ঠিকানা আমরা জানি না। অস্ট্রেলিয়ার সত্যিকার আবিষ্কারক যদি কেউ হয়, তবে সেই নাম না জানা মানুষ কিংবা মানুষী, জেমস কুক নন।
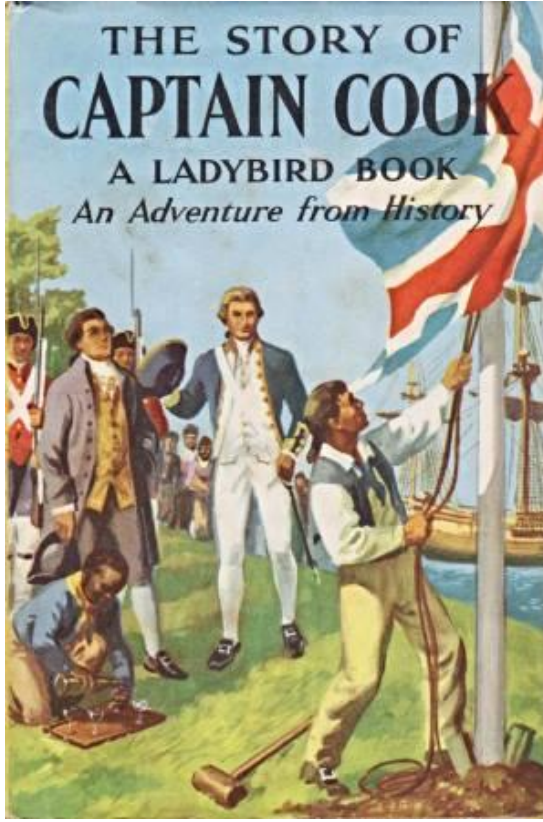
বহু বছরের চর্চায় আমাদের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল ঢুকে গেছে যে, আবিষ্কর্তা মানে শাদা মানুষ হতে হবে। শাদা মানুষের ইতিহাস যে বড়জোর লাস্ট এক হাজার বছরের, একথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। আজকের এই সভ্যতা হয়তো শাদা মানুষের দান, কিন্তু ভূখণ্ডগুলোর আবিষ্কারের কৃতিত্ব অন্তত নয়। কলম্বাস বা কুককে বড়জোর ভূখণ্ডগুলোর পুনরাবিষ্কারক বলা চলে।

যাই হোক, চাঁদে যাওয়া যেমন মানুষের ইতিহাসে একটা বড় মাইলস্টোন ছিল, অস্ট্রেলিয়া যাত্রাও তেমন। বলতে কি, অস্ট্রেলিয়াই মানুষের তৈরি প্রথম উপনিবেশ।

The Martian মুভিতে একটা দারুণ কথা আছেঃ যখন তুমি কোথাও ফসল ফলানো শুরু করবে, তখন তুমি সেই জায়গাটাকে কলোনাইজ করে ফেললে। অস্ট্রেলিয়া সেই অর্থে মানুষের প্রথম কলোনী। এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই হয়তো কুক সাহেব অস্ট্রেলিয়া আসার সময় সাথে করে আপেল, আঙুর আর পীচফল নিয়ে এসেছিলেন। সাহেব জানতেন না যে তারও বহু হাজার বছর আগেই মানুষ এখানে এসে ছোটখাটো কলোনী তৈরি করে বসেছে।

ভেবে অবাক হতে পারেন, ৪৫ হাজার বছর আগে মানুষের হাতে কি এই টেকনোলজি ছিল কিনা যার দৌলতে সে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়া এসে পৌঁছাবে? মানচিত্রের দিকে ভালো করে লক্ষ করলে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে। লোকে বলে, সম্ভবত এই মানুষেরা ইন্দোনেশিয়ার কোন উপদ্বীপ থেকে এসেছিলো। জাহাজ না হোক, নৌকা বা ভেলা নিশ্চয়ই তাদের ছিল। এই সিম্পল প্রযুক্তি যে আমাদের কতোটা এগিয়ে দিয়েছে, চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে তা অনেক সময় বোঝা যায় না।

আর সব সামুদ্রিক প্রাণীর কথা ভাবুন। সমুদ্রে নিজেদের দাদাগিরি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পাখনা আর ফুলকার মত অংগ-প্রত্যঙ্গ ডেভেলপ করতে হয়েছে। মানুষকে এইসব শারীরিক প্যারা নিতে হয়নি। সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে নৌকা বানিয়েই সে কাজ হাসিল করে নিয়েছে। মানুষের এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব অবশ্য আর সবার জন্য খুব সুখবর বয়ে আনেনি।

মানুষের আগমনের আগ পর্যন্ত মহাদেশগুলোর জীববৈচিত্র্য আপন গতিতে বিবর্তিত হচ্ছিল। মানুষ এসে সেই বিবর্তনের ধারায় একটা প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। এতোদিন পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। যেদিন থেকে মানুষ সমুদ্র পাড়ি দিল, সে বুঝলো---সে আসলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তার আর প্রকৃতির

সাথে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন নেই। দরকারে সেই প্রকৃতিকে তার মত করে বদলে নিতে পারবে। আর হতেও লাগলো তাই।

এতোদিন মানুষ বাঘ-সিংহের মোকাবেলা করেই অভ্যস্ত ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় এসে তারা মুখোমুখি হল ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা আর মারসুপিয়ান সিংহের মত নতুন প্রজাতির। আর মজার ব্যাপার হল, এদের প্রায় সবাই-ই কয়েক হাজার বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। মানুষ যখন অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখে, তখন গোটা মহাদেশে অন্তত চব্বিশটা প্রজাতি ছিল যাদের ওজন পঞ্চাশ কেজির বেশি। সংগানুযায়ী, এদের অতিকায় প্রাণীর দলে ফেলা যায়। এদের মধ্যে তেইশ জনই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে বৌ-বাচ্চা সহ বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

আচ্ছা, আফ্রিকায় তো বাঘ-সিংহ মানুষের সাথে যুদ্ধ করে টিকে রইলো। কোয়ালা আর মারসুপিয়ায়নরা তবে মারা পড়লো কেনো?

খুব সিম্পল। মানুষ যখন থেকে হাতিয়ার বানানো শুরু করেছে, বাঘ-সিংহ ও সেই সাথে মানুষকে এড়িয়ে চলা শিখে গেছে। অন্তত দলবদ্ধ মানুষকে তো বটেই। এরা সাতচল্লিশের দাঙ্গা দেখেনি। না দেখেই তারা বুঝে গেছিলো যে, দলবদ্ধ মানুষের চেয়ে হিংস্র আর কিছুই হতে পারে না। এদের গায়ের চামড়া তাই কিছুটা হলেও রক্ষা পেয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাণীকুল এই বোঝাপড়ার সময়টুকুও পায়নি। দোপেয়ে দৈত্য দেখলে যে এদের এড়িয়ে চলতে হবে---এই নলেজটুকু এরা জিনের মধ্য দিয়ে পরের প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। মানুষ দেখে এরা আগের মতই খুব কুলভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। ফলাফল, তেলাপোকা টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু এরা খুব কুলভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

কথা হচ্ছে, যথাযথ তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আমরা এই গণহত্যার দায় মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারি কিনা। জবাব হচ্ছে, পারি। যারা মানুষকে এই দায় থেকে ইনডেমনিটি দিতে চান, তাদের যুক্তি হচ্ছে---ভয়ানক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো এই প্রাণীকুলের বিলুপ্তির কারণ। বরফ যুগে যেমনটা ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, এক লাখ বছর পর পর একে বরফ যুগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রাণীকুলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

গন্ডগোলটা এইখানেই। শেষ বরফ যুগ আমরা দেখেছি পঁচাত্তর হাজার বছর আগ থেকে পনের হাজার বছর আগ পর্যন্ত। এর প্রকোপ সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল এক সত্তর হাজার বছর আগে আর এক বিশ হাজার বছর আগে। মানে ঐ বরফ যুগের একবারে শুরুতে আর শেষ দিকে। যাবার আগে একেবারে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের। ডাইপ্রোটোডন বেচারা এই বরফযুগ আর তার আগের দশটার মত বরফযুগ লাইক এ্যা বস পার করে এসেছে। ৪৫ হাজার বছর আগে তাহলে কী এমন হল যে সে নিজের অস্তিত্ব আর টিকিয়ে রাখতে পারলো না? মানুষের আগমন ছাড়া তো আশেপাশে বলার মত আর কোন ঘটনা চোখে পড়ে না। বেচারা ডাইপ্রোটোডনই যে কেবল মারা খেয়েছে, তা নয়। আরো অনেকেই এই ম্যাসাকারের শিকার। পুরো ব্যাপারটাকে তো আর কাকতাল বলা যায় না।

ও, আরেকটা ব্যাপার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন কোথাও আঘাত হানে, স্থলবাসী প্রাণীদের সাথে সামুদ্রিক প্রাণীদের উপরও সে সমান তেজে আঘান হানে। বাদ যাবে না কোন শিশু টাইপ অবস্থা। অস্ট্রেলিয়ায় ঘটে যাওয়া এই গণহত্যায় কিন্তু কোন সামুদ্রিক প্রাণীর গায়ে আঁচড়টাও পড়েনি। সম্ভবত মানুষের হাতে তখনো সেই টেকনোলজি আসে নি যে, সামুদ্রিক প্রাণীর গায়েও হাত তুলবে। থাকলে হয়তো এদেরও খবর ছিল।

এই যে আমরা যত দোষ মনুষ্য ঘোষের উপর চাপাচ্ছি, তার পেছনে আসলে মানুষের আরো কিছু কৃতকর্ম দায়ী। সবগুলো ডাটা ইন্টারপোলেট করলে আপনিও হয়তো মানুষকেই দায়ী করবেন। কোন দৈব দুর্যোগ বা ভিনগ্রহী দেবতাকে নয়।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে মোটামুটি যেখানেই গেছে, তার হাত রক্তে রাঙিয়ে এসেছে। নিউজিল্যান্ডের কথাই বলি না কেন। এটা কিন্তু খুব পুরনো দেশ নয়। মানুষ প্রথম এইখানে বসতি গড়ে মাত্র ৮০০ বছর আগে। ইউরোপীয়রা আসে আরো ৩-৪ শ' বছর পর। মাওরিস নামক এক জনগোষ্ঠী এইখানে বসতি গড়ার কয়েকশ' বছরের মধ্যেই এখানকার অতিকায় প্রায় সব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইউরোপীয়দেরও হয়তো এক্ষেত্রে অসামান্য অবদান আছে, কিন্তু মাওরিসদের অবদানও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অবলা পাখিরাও এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। তাদের সমাজের ৬০ শতাংশও এই সময়টায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

একই ঘটনা ঘটে আর্কটিক মহাসাগরের ম্যামথদের সাথে। উত্তর মেরুর এই বাসিন্দারা মানুষের ভয়ে এশিয়া, ইউরোপ হয়ে পিছাতে পিছাতে উত্তর মেরুতে আশ্রয় নেয়। মানুষের যখন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হচ্ছিল, তখনো এরা র‍্যাঙ্গেল দ্বীপে এদের

ছোট্ট নীড়ে সুখে শান্তিতেই ঘর সংসার করছিল। এদের এই সুখ বেশিদিন টিকলো না। চার হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম র‍্যাঙ্গেল দ্বীপে পা রাখে। আর ঐ সময়েই এদের শেষ সদস্যটি বেঁচে ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাকতাল? সিনেমার স্ক্রিপ্ট ছাড়া এতোগুলো কাকতাল নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

মানুষ যে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সিরিয়াল কিলার, এখন বিশ্বাস হল তো?

তিন কিস্তি এক

মানুষের গল্প বলতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের কথা বারবার আসবেই। অনুকূল আবহাওয়ার কারণেই হোক আর ইন্টেলেকচুয়াল সুপেরিওরিটির কারণেই হোক, এখানকার মানুষই বারবার সভ্যতার পত্তন করেছে। আপনি চান বা না চান, আমাদের শেকড়ের সন্ধান করতে হলে এদের কাছে বারবার ফিরে আসতেই হবে।

সত্তর হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম মধ্যপ্রাচ্যে আসে। পরবর্তীতে বেশ একটা লম্বা সময় জুড়ে সে চাষবাস ছাড়াই থাকে। প্রকৃতিতেই এতো সম্পদ ছড়ানো ছিল যে মানুষের খেয়েপরে বেঁচে থাকা নিয়ে কোন টেনশন ছিল না। মানুষের প্রথম ও সবচেয়ে প্রবল ইনস্টিংক্ট হচ্ছে শিকার। এই করেই তার দিব্যি চলে যেত।

তাই বলে যে প্রকৃতিতে সম্পদ যে সবসময় একই পরিমাণে ছিল তা নয়। মানুষ মানুক না মানুক, প্রকৃতি কিন্তু সাইনুসয়ডাল কার্ভ ঠিকই মেনে চলে। কখনো সে সম্পদে উপচে পড়ে, এর পরেই হতো একটা বিশাল সময় যায় অভাব ও দারিদ্র্যে।

প্রকৃতির এই মেকানিজমের সাথে মানুষের একটা অঘোষিত বোঝাপড়া ছিল। প্রাচুর্যের সময় লোকে বেশি বাচ্চাকাচ্চা নিত। আর অভাবের সময় কম।

প্রকৃতি নারীদের জন্যও ফিডব্যাকের ব্যবস্থা রেখেছে। প্রাচুর্যের সময় নারীরা তাড়াতাড়ি বয়োসন্ধিতে পৌঁছাতো। ফলে গর্ভবতীও হতো তাড়াতাড়ি। আর অভাবের সময় উলটো।

১৮ হাজার বছর আগে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বরফ যুগ সরে গিয়ে জায়গা করে দেয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে। ফলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, সেই সাথে বৃষ্টিপাতও।

যাকে বলে কৃষিকাজের জন্য আদর্শ পরিবেশ। গম জাতীয় খাদ্যশস্যের জন্য পারফেক্ট আবহাওয়া। 'সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট' বলে একটা কথা আছে। এটা সবার জন্যই সমান সত্য। এই গরম আবহাওয়ায় গম জাতীয় শস্য পৃথিবীতে নিজের দখল বুঝে নিতে থাকে আস্তে আস্তে।

মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ যে আগে গম খেতো না---তা না। আর দশটা ফলমূলের মতই তার পাকস্থলী এই ইনসিগনিফিক্যান্ট দানাকে মাঝেমধ্যেই আপন করে নিত। কিন্তু এটা তখনো মানুষের প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠেনি। ধান-গম তবে কী করে পৃথিবীতে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুললো?

মানুষ কি তবে কোন এক সকালে ঘুম থেকে উঠে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে কৃষিকাজ শুরু করেছিলো?

উহুঁ। অধিকাংশ আবিষ্কারের মতই এটাও বেশ আকস্মিক। গম তো আর কাঁচা খাওয়া যায় না। এটা ঝেড়ে গুঁড়া করতে হত, তারপর রান্না করে খেতে হত। কাজেই যেখানে গমের দানা পাওয়া যেত, সেখানেই এটা খাওয়া হত না। একে অনেক আদর

যত্ন করে বাসায় নিয়ে আসা হত। আসার পথে কিছু দানা অবশ্যই মাটিতে পড়ে যেত। সেই দানা থেকে নতুন গমের জন্ম হত।

এদিকে খাবারের অভাব হলে মানুষ এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় মুভ করতো। যাবার পথে অতি অবশ্যই বন জঙ্গল পড়তো। রাস্তা ক্লিয়ার করার জন্য সেই বনজঙ্গল পুড়িয়ে তারা সামনে এগোত। ফলে বিচিত্র রকমের লতাগুল্ম মরে যেত ঠিকই। কিন্তু সেই জায়গা দখল করে নিত গমের মত কই মাছের প্রাণেরা।

আর আগে সূর্যালোক আর পানির মত রিসোর্সের জন্য ধান-গমকে আরো অনেকের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হত। লতাগুল্মের সংখ্যা আর ভ্যারিয়েশন কমে যাওয়ায় তারা বলা যায় একচেটিয়া ভোগ শুরু করে। পুঁজিবাদের নিয়মই হচ্ছে, যে পায়, সে আরো পায়। আর যে পায় না, সে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। পুঁজিবাদী ধান-গম তাই মানচিত্রে একের পর এক তাদের বিজয় নিশান ওড়াতে থাকে।

যাই হোক, একটা সময় মানুষ খেয়াল করলো, বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় গমের ফলন হচ্ছে। ঐ সময়টায় তারা ঐ ফলনের কাছাকাছি বউবাচ্চা নিয়ে থাকতে শুরু

করলো। ধরা যাক, সেই সময়টা চার সপ্তাহ। পরের বার গমের ফলন আরো বেড়ে গেল। সমস্ত গম তুলে প্রসেস করতে তাই সময়ও একটু বেশি লাগলো। ধরা যাক, সেটা পাঁচ সপ্তাহ। এর পরের বার ছয় সপ্তাহ। এই করে করে এই ডিউরেশনটা বাড়তেই থাকলো। কালে কালে সেটা হয়ে উঠলো একটা স্থায়ী নিবাস।

আমরা আজকাল যাকে গ্রাম বলি, সেই গ্রামগুলোর জন্ম ঠিক এইভাবেই!

তিন কিস্তি দুই
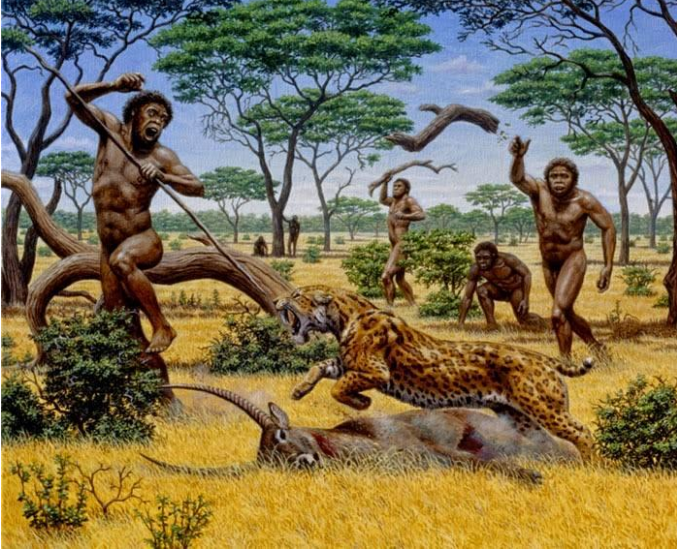
ইতিহাসের পাতায় পাতায় 'লাক্সারি ট্র্যাপ' এর ছড়াছড়ি।

১০ হাজার বছর আগে মানুষ যখন শিকার ছেড়ে পুরোপুরি চাষবাসে মন দেয়, তখন সে ভেবেছিলো, চাষবাস করলে তার জীবন বুঝি অনেক সুখের হবে। খাবারের সন্ধানে আর পথে পথে ঘুরতে হবে না। ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়াই খাদ্যের সন্ধান মিলিবে। বউ-বাচ্চা লইয়া বাড়িতে বসেই রক করা যাইবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

বাড়তি ফসল মানেই বাড়তি সুখ না। এই বাড়তি ফসল ফলাতে গিয়ে মানুষকে দিনরাত খেটে মরতে হল। মানুষের শরীর এই কষ্টের জন্য প্রস্তুত ছিল না। মানুষের

শরীর হচ্ছে চিল করার জন্য। সে খাবে-দাবে, ঘুরবে-ফিরবে। পথের মধ্যে যা কুড়িয়ে পাবে, তাই দিয়ে পেটের ক্ষুধা মেটাবে। কিন্তু ফসল ফলাতে গিয়ে তাকে নিজের সাথে অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হল।

ভালো ফসল ফলাতে হলে একদম মসৃণ, চকচকা শস্যক্ষেত্র চাই যেখানে নুড়ি, পাথর কিচ্ছু থাকতে পারবে না। মানুষ সকাল সন্ধ্যা খেটে সেগুলো পরিষ্কার করলো। এদিকে ধানগম হচ্ছে ব্রাহ্মণ গোত্রীয় ফসল। এরা এদের ত্রিসীমানায় কোন ছোটলোক আগাছা সহ্য কতে পারে না। এই আগাছা নিড়াতে মানুষকে একটা সিগনিফিক্যান্ট সময় দিতে হল। এদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও অনেক বেশি। খালি বৃষ্টির পানি দিয়ে এদের পিপাসা মিটতো না। এদের পিপাসা মেটানোর জন্য মানুষকে দূর-দূরান্ত থেকে কাঁধে করে পানি বয়ে নিরে আসতে হল। গবাদি পশুর বিষ্ঠা দিয়ে মেটাতে হলো এদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

আমরা মনে করি, আমরা জঙ্গুলে ধান-গমকে নিজেদের বুদ্ধিবলে পোষ মানিয়েছি। সত্যিটা হচ্ছে এই যে, আমরা ধান-গমকে পোষ মানাইনি, উলটো ধান-গম আমাদের পোষ মানিয়েছে। ওদের সুখ-সুবিধার জন্য আমরা নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি। শিকারী জীবন ছেড়ে ওদের বসতির পাশে নিজেদের বসতি গড়েছি। বার রকমের ফলমূল খাওয়া ছেড়ে ওরা যেন ভালো থাকে, ওদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন ভালো থাকে---তার দিকে নজর দিয়েছি। এই করে করে সামান্য একটা ঘাস, যেটা হয়তো কারো চোখেই পড়তো না---আজ পৃথিবীর পঁচিশ লাখ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে বসে আছে।

এই যে এতো ভালবাসা, এতো ত্যাগ-তিতিক্ষা---এর বিনিময়ে কী পেলাম? ফুড সিকিউরিটি? উহুঁ। আগে যেখানে আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে দু'হাত ভরে নিতাম, সেখানে আমরা দু-তিনটা ফসলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। বৈচিত্রের অভাবে

আমাদের শরীরের ইম্যিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়লো। তার উপর সময়মত বৃষ্টি না হলে আমরা শেষ। বউ-বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরতে হল।

শুরু শুরুতে অবশ্য বাড়তি ফসল দেখে আমাদের চোখ টাটিয়ে গেলো। আমরা স্থায়ী বসতি গড়ে বছর বছর বাচ্চা নেয়া শুরু করলাম। ভাবলাম, খাবার টেনশন তো নাই। বাচ্চা নেয়াই যায়। ভেবেও দেখলাম না, এতো গুলো মুখের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তি ফসল আছে কিনা। সেই সামান্য উদ্বৃত্ত নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চাটা ঠিকমত না খেতে পেয়ে মারা পড়লো। কৃষি সমাজের নিয়মই হয়ে গিয়েছিল এমন, যে প্রতি তিনটা বাচ্চার মধ্যে একটা অপুষ্টি নয়তো অসুখ-বিসুখে মারা যাবেই। আর বসতিগুলোও ছিল ঘিঞ্জি আর রোগজীবানূর আড়ৎ। যে কয়টা মরতো, জন্ম নিত তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। সেই বাড়তি মুখের অন্ন যোগানোর জন্য মানুষকে আরো বেশি বেশি ফসল ফলাতে হল। আরো বেশি ফসল আরো বেশি খাটনি।

সমস্যার এইখানেই শেষ না। পৃথিবীতে সবসময়ই এমন কিছু মানুষ ছিল যারা নিজেরা কোন কাজ করতো না। অন্যের পরিশ্রমে ভাগ বসিয়ে নিজেদের রুটিরুজি করতো। ছোট পরিসরে এদের আমরা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ বলি। আর বড় পরিসরে আদর করে বলি সরকার, পুলিশ কিংবা আর্মি। আর এটা তো জানা কথাই যে, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীই দিনশেষে সম্রাট হন।

সে যাই হোক, কৃষকের এই ফসলে বাইরের মানুষ এসে আক্রমণ চালাতো। বলতো, আমাদের ভাগ দাও। অবশ্যই মুখের ভাষায় না, অস্ত্রের ভাষায়। এদের প্রতিহত করার জন্য কৃষকদের একটা ইউনিটকে, কখনো বা গোটা ইউনিটকেই যুদ্ধবিদ্যার প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যেতে হত। দিনে চাষবাস করো, আর রাতের বেলা ফসল পাহাড়া দাও। এই এক্সট্রা খাটনির জন্য তারা কোন ওভারটাইমও পেত না। তাদের জীবনটা একেবারে গেবন হয়ে গেলো!

কৃষি মানুষকে যে লাক্সারির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সময়ে সেটা নির্মম ফাঁদে পরিণত হল। কৃষি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম ফাঁদ। সেই যে মানুষ ফাঁদে পা দিল, এরপর থেকে একটার পর একটা ফাঁদে পড়তেই লাগল। কৃষি তাও যতোটা না বিপ্লব, তার চেয়ে বেশি ধোঁকা হয়ে দেখা দিল মানুষের জীবনে। আশীর্বাদ নয়, দেখা দিল অভিশাপরূপে। কথা হল, এতো কিছুর পরেও মানুষ কৃষি ছেড়ে আবার শিকারী জীবনে ফিরে গেলো না কেন?

কারণ, এই বদলগুলো ঘটেছে খূব ধীরে। ধীরে মানে এখনকার মত দশ-বিশ বছরে না। এক হাজার বছরে হয়তো খুব সামান্য একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পরের প্রজন্মগুলো এই ধারাকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দশ হাজার বছর আগে মানুষ যখন পুরোপুরি কৃষিতে থিতু হয়, এর সমস্ত ভাল আর মন্দ নিয়ে--- ততোদিনে মানুষ ভুলেই গেছে যে তারাও এক সময় শিকারী ছিল। চাইলেও আর পিছু ফেরার সুযোগ তখন নেই।

ইতিহাসের নিয়মই হচ্ছে এই যে, মানুষ একবার একটা লাক্সারিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এক সময় সেটাকে মৌলিক চাহিদা বলে মনে করে। আমাদের দাদা-নানা রা টেলিভিশন ছাড়াই চলেছেন। আমাদের বাবা-মা'র কাছে সেটা ছিল নেসেসিটি। আবার আমাদের বাবা-মা রা মোবাইল ফোন ছাড়াই দিব্যি প্রেম করেছেন। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। আর আমরা মোবাইল ছাড়া নিজেদের অস্তিত্বই কল্পনা করতে পারি না। একদিন ভার্সিটিতে মোবাইল না নিয়ে এলে মনে হয়, আমার অস্তিত্ব বুঝি নাই হয়ে গেছে পৃথিবীর ময়দান থেকে।

ইতিহাসের প্রতিটা ধাপই মানুষের সাথে এই ছলনা করেছে। শুরুতে সে একটা সুখী, সুন্দর, আরামদায়ক জীবনের লোভ দেখিয়েছে। পরে ঠিকই তাকে আগের মতই কিংবা আগের চেয়েও কষ্টসাধ্য একটা জীবনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছিল বড় বড় ক্যালকুলেশন নিমেষে করে ফেলার জন্য। সোজা কথায়, মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য। আসলেই কি তাই হয়েছে? মানুষ আগে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করতো। বাসায় এসে বউ-বাচ্চা নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের নাটক দেখতো। আজ তার ক্যালকুলেশন সহজ হয়েছে, কিন্তু জীবন হয়ে গেছে কঠিন। আজ সে সে এগার-বারো ঘণ্টা কাজ করেও কুলাতে পারে না। না পারে বসকে খুশি করতে, না পারে বউকে খুশি করতে।

ই-মেইল বা টেক্সটের কথাই ধরি না কেন! ইমেইলের আগের যুগে মানুষ মানুষকে চিঠি লিখে খোঁজখবর করতো। প্রতিটা বাক্য, প্রতিটা শব্দ খুব চিন্তা করে লেখা হত। ভালবাসা দিয়ে লেখা হত। এখন সেই কাজই অফিশিয়ালি করা হয় মেইল দিয়ে আর আনঅফিশিয়ালী টেক্সট, ফেসবুক আর হোয়াটসএ্যাপের মাধ্যমে। প্রশ্ন হল, ই-মেইল আমাদের জীবনে সুখ নিয়ে আসছে কিনা। উত্তর আবারো না। আমাদের দিনের একটা বড় অংশ কেটে যায় আজাইরা ইমেইল সাফ করতে; আর গ্রামীনফোনের মেসেজ তো আছেই!

সেকালেও হয়তো দু'একজন লোক ছিল, যারা টেকনোলজিকে অস্বীকার করেছিল। কৃষিকাজে না লেগে শিকারী যুগেই পড়ে রইলো। এ যুগেও হয়তো আছে তেমন। ফেসবুক বা মোবাইল ইউজ করে না; হয়তো লাখে একজন। কিন্তু আছে। সমস্যা হল, টেকনোলজির নিয়মই হচ্ছে এই যে তার সমস্ত অসুবিধা নিয়েই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে। সাময়িক লাক্সারির টোপ দেখিয়ে মানুষকে ফেলে দিবে বিরাট ট্র্যাপে। মানুষের জীবনকে করে তুলবে কঠিন থেকে কঠিনতর।

গুরুজনেরা তো আর শুধু শুধু বলেননি, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ!

তিন কিস্তি শেষ

শিকারী মানুষের মধ্যেও কিছু ইন্টার্নাল হিসাব-নিকাশ ছিল।

তারা যখন শিকারে বেরোতো, চোখের সামনে যা পেত, তাই শিকার করতো না। হয়তো তারা ভেড়া শিকারে বেরোলো। খুঁজে খুঁজে তারা বয়স্ক আর বুড়ো-ধাড়িগুলোকেই শিকার করতো। অল্প বয়স্কগুলোকে আপাতত ছেড়ে দিত। এইটুকু কমন সেন্স তাদের ছিল, যুবতী ভেড়াগুলোকে মেরে ফেললে পরবর্তীতে নতুন ভেড়া তারা পাবে কই?

এই সিলেক্টিভ শিকারে তাদের লাভই হচ্ছিল। কিন্তু বাঘ-সিংহের যন্ত্রণায় এই লাভ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল না। বাঘ-সিংহ এসে ভেড়া খেয়ে ফেললে মানুষ খাবে কী? মানুষ তখন নিজে থেকে এদের প্রটেকশন দিতে আরম্ভ করলো। একটা ঘের দেয়া এলাকায় তাদের আটকে তাদের সিকিউরিটি নিশ্চিত করলো।

কিন্তু সিকিউরিটি-ই তো জীবনের সব কিছু নয়। স্বাধীনতা বলেও একটা জিনিস আছে। কাজেই সব ভেড়াই মানুষের বশ্যতা স্বীকার করলো না। কিছু পুরুষ ভেড়া ছিল, যেগুলো খুবই এ্যাগ্রেসিভ। মানুষের কথা শুনতেই চাইতো না। মানুষ সেগুলোকে অল্প বয়সেই মেরে ফেললো। দলের বাকিদের শিক্ষা দিয়ে দিল যে বেশি তেড়িবেড়ি কলে তাদেরও এই অবস্থা হবে।

স্ত্রী ভেড়াদের দশা হল আরো করুণ। যেগুলো একটু শুকনা-পাতলা ছিল, সেগুলোকে চোখ বন্ধ করে মেরে ফেলা হল। ফলে, খালি মোটা আর থলথলে ভেড়াগুলোর জিনই

এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাহিত হবার সুযোগ পেল। ফলাফল, ভেড়া দিনকে দিন ফুলতে থাকলো আর মানুষের বশ হতে লাগলো।

এর আগে মানুষ যেখানেই গেছে, সেখানকার ডেমোগ্রাফিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। অবশ্যই নেগেটিভ পরিবর্তন। এই প্রথম মানুষ খোদ বিবর্তনের গতি পাল্টে দিতে শুরু করলো। বিবর্তনকে ব্যবহার করতে লাগলো নিজের দরকার মত।

দশ হাজার বছর আগেই মানুষ গরু, ছাগল, শুয়োর, ভেড়া আর মুরগিকে নিজেদের বশ করে ফেলে। গোটা পৃথিবীতে তখন তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক মিলিয়নের মত। আজ এক মুরগিই আছে পঁচিশ বিলিয়নের বেশি। তার মানে প্রতিটা মানুষের জন্য প্রায় চারটা করে মুরগি। আর গরু-ছাগল, শুয়োর-ভেড়া তো আছেই বিলিয়নখানেকের বেশি।

বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মুরগি কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সফল। বিবর্তনের সানগ্লাস দিয়ে দেখলে, যে জিন নিজেকে যতো বেশি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে, সে ততো সফল। সেই হিসেবে মুরগি ইতিহাসের সফলতম প্রাণীদের একটি।

ওয়েইট!

ইভোল্যুশনারী সাকসেস আর ইনডিভিজ্যুয়াল সাকসেস এক জিনিস না।

এই ইভোল্যুশনারী সাকসেস অর্জনের জন্য এদের বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। যে কারণে এদের ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছুই নাই এখন।

বনমুরগির গড় আয়ু ছিল সাত থেকে বার বছর। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে সেটা বিশ থেকে পঁচিশ বছর। এতোটা হয়তো এরা বাঁচতো না। কিন্তু তবু এদের জীবনেও একটা আশা ছিল, সম্ভাবনা ছিল এতোগুলো দিন, মাস, বছর পৃথিবীর রঙ, রূপ, রস উপভোগ করার। আজ সেই সম্ভাবনাকে আমরা গলা টিপে মেরে ফেলেছি। আজ একটা মুরগির গড় আয়ু কয়েক সপ্তাহ, বড়জোর কয়েক মাস।

যে মুরগি ডিম পাড়ে, আর যে গাভী দুধ দেয়---এদের হয়তো কিছু বেশিদিন বেঁচে থাকতে দেয়া হয়। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? চরম অপমান আর অসম্মানের বন্দী জীবনের বিনিময়ে। একটা তরুণী গাভীর পারস্পেক্টিভে একবার চিন্তা করুন। তারও তো ইচ্ছা হতে পারে ভালো দেখে একটা গরুর সাথে প্রেম করতে। দু'জনে মিলে বাচ্চা জন্ম দিতে। তারপর সেই বাচ্চাকে আদর-যত্ন করে বড় করতে, দুধ খাওয়াতে।

অথচ আমরা তার প্রতিটা অধিকারই কেড়ে নিচ্ছি নিজেদের স্বার্থ হাসিলে। সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে পুরুষগুলোকে। এরা যখন আমাদের আর কাজে লাগে না,

তখন এদের খোঁজা করে ফেলা হয়। সবচেয়ে মারমুখী পুরুষটাও তখন মানুষের দাসানুদাস হয়ে যায়। আর দশটা প্রাণীর মত এদের যে একটা সামাজিক জীবন ছিল, সেই জীবন আমরা পুরোপুরি কেড়ে নিয়েছি নিজেদের সুখ-সুবিধা আদায়ে।

নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য মানুষ কতোদূর নামতে পারে, তা কিছু উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। নিউ গিনির সমাজের কথা বলি। এদের সমাজে একটা মানুষ কতোটুকু সম্পদশালী---তা যাচাই করা হত তার শুয়োর সংখ্যা দিয়ে। তো শুয়োরগুলো যেন পালাতে না পারে, সেজন্যে তারা শুয়োরের নাক কেটে দিত। একে তো শুয়োরগুলো নাকের ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পেত, তার উপর ঘ্রাণ শুঁকতে না পারায় নিজে নিজে খাবারও খুঁজতে পারতো না। ফলাফল, মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরা।

আরেকদল তো ছিল এক ধাপ এগিয়ে। এরা শুয়োরের চোখ জাস্ট কানা করে দিত। স্বাধীনতার তো প্রশ্নই আসে না।

সবচেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় গরু-ছাগলের সাথে। গরু-ছাগল তো আর এমনি এমনি দুধ দেয় না। কেবল বাচ্চা হলেই দুধ দেয়। তো প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বাচ্চা জন্ম নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলতো। যতোটুকু দুধ দোয়ানোর---দুইয়ে নিত। তারপর মা বেচারীকে আবার প্রেগন্যান্ট করে ছাড়তো। একটা গরু হয়তো পাঁচ বছর বাঁচে। দেখা যায়, বাচ্চা জন্মের দুই কি চার মাসের মধ্যে তাকে আবার প্রেগন্যান্ট করে ফেলা হয়। ভদ্রমহিলা তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই এভাবে প্রেগন্যান্ট অবস্থায় কাটিয়ে দেন। কেবল দুধের সর্বোচ্চ সাপ্লাই নিশ্চিত করার জন্য।

নিষ্ঠুরতার এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা আমরা সবাই কমবেশি গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি। বাছুরটাকে মা গরুর কাছে নিয়ে আসা হয়। সে দুধ খাওয়া শুরু করলেই তাকে মায়ের বুক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। মা-শিশু---দু'জনেই এতে

প্রবল বাধা দেয়। কিন্তু মানুষের হিংস্রতার সামনে সেই বাধা কিছুই নয়। ভেবে দেখুন তো, এই একই কাজ মানুষের সাথে কেউ করলে আমাদের কেমন লাগতো?

এতো গেল পরিচিত দৃশ্যের কথা। অপরিচিত দৃশ্যের কথা বলি।

একটা গোষ্ঠী আছে যারা ভেড়ার বাচ্চা মেরে তার মাংস খেয়ে চামড়াটা রেখে দিত। সেই চামড়া দিয়ে ভেড়ার একটা অবয়ব তৈরি করতো। ভেড়ার সেই অবয়ব মা ভেড়ার কাছে আনলে তার শরীরে দুধ আসতো। আরেকটা টেকনিক হচ্ছে বাছুরের মুখে শিং এর মত ধারালো কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা। বাছুর তখন দুধ খেতে চাইলে মা নিজেই তাকে ব্যথায় সরিয়ে দিবে। সাহারা মরুভূমির লোকজন উটের বাচ্চার নাক আর উপরের ঠোঁট কেটে রাখতো। যেন বেশি দুধ খেতে না পারে। অল্পতেই হাঁপিয়ে যায়।

পৃথিবীর ইতিহাস আসলে ভালবাসার ইতিহাস নয়। অন্যায়ের ইতিহাস। সবচেয়ে বড় অন্যায়টা বোধ হয় আমরা করেছি আর করেই চলেছি এই গৃহপালিত পশুপাখিদের সাথে। পৃথিবীটা তাদের কাছে একটা জেলখানা বৈ তো কিছু নয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এই অন্যায়ের জন্য আমাদের ভেতরে কোন অনুশোচনাও নেই। সম্ভবত, ধান-গম আমাদের যেভাবে বুনো মানুষ থেকে ঘরবন্দী মানুষে পরিণত করেছে, আমরা তারই প্রতিশোধ নিয়েছি গরু-ছাগল আর মুরগির উপর। তাদের ঘরবন্দী করে। স্বাধীন জীবন কেড়ে নিয়ে।

পরের দিন যখন কেএফসিতে মুরগির রান চিবাবেন কিংবা মোস্তাকিমে গরুর শিকে মুখ ডুবাবেন, তখন বেচারা'রা আমাদের সামান্য সুখের জন্য যে প্যাথেটিক জীবনটা যাপন করে চলেছে, তার জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেও ফেলতে পারেন।

অধ্যায় চার কিস্তি শূন্য

হামুরাবির সংবিধানকে বলা যায় পৃথিবীর প্রথম সংবিধান।

খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭৬ সালের কথা। ব্যাবিলন তখন পৃথিবীর সবচেয়ে জমজমাট সাম্রাজ্য। ইরাক, ইরান আর সিরিয়া মিলে এর বিস্তৃতি। ব্যাবিলনের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন হামুরাবি। না, ইনি আকবরের মত দীর্ঘ সময় রাজত্ব করছেন বলে বিখ্যাত নন। কিংবা আলেকজান্ডারের মত অর্ধেক পৃথিবী জয় করার জন্যও বিখ্যাত নন।

তার খ্যাতির পেছনে লুকিয়ে আছে একটা কোড, যে কোড তার নাম বহন করে চলেছে। এই কোডে সেকালের সমস্ত আইন কানুন লেখা আছে। এই আইন এতোই প্রভাব বিস্তারকারী ছিল যে এর পরের যুগের শাসকেরাও এটা ফলো করে গেছে

বহুদিন। কী এমন আইন যা মানুষ যুগ যুগ ধরে মানুষ অন্ধের মত অনুসরণ করে গেছে?
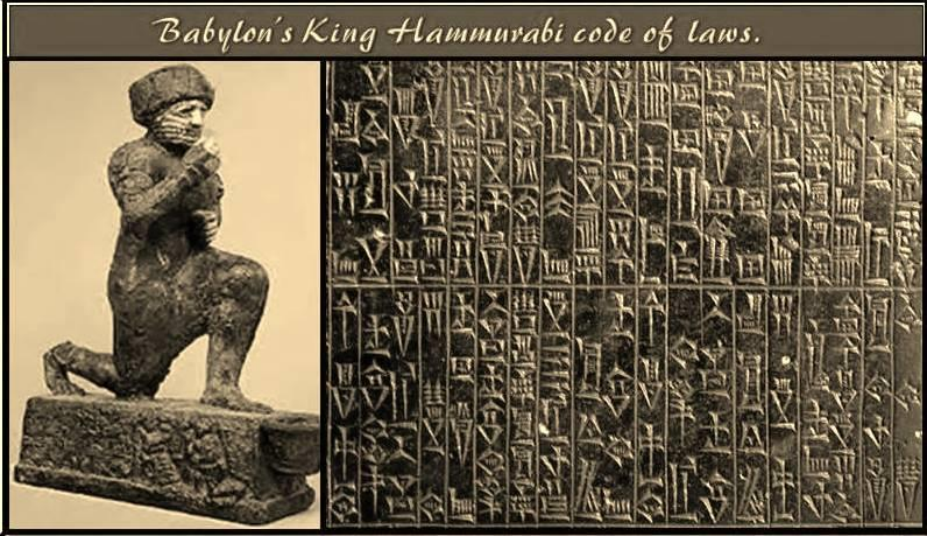
সংবিধানের ভেতরে একটু চোখ বুলানো যাক। তাহলেই রহস্যটা ক্লিয়ার হবে।

সংবিধানের শুরু হয়েছে স্রষ্টার নাম নিয়ে। আনু, ইনলিল আর মারডুক---সেকালের তিন দেবতা। বলা হচ্ছে---দেবতারা হামুরাবিকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য ধরাধামে পাঠিয়েছেন। এটা শাসকদের একটা কমন ফিচার। শাসকেরা যেই আইনই প্রণয়ন অরে, সেটাকে হায়ার অথরিটির নাম দিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। সেই হায়ার অথরিটি হতে পারে কোন ঈশ্বর বা শ্রদ্ধেয় কোন পূর্বপুরুষ। কিছু আইন এমনঃ

-এক লোক যদি আরেক লোকের চোখ উপড়ে ফেলে আর দুইজনই যদি অভিজাত হয়, তবে অপরাধীরও চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

(চোখের বদলে চোখ---এই ব্যাপারটা এসেছে সম্ভবত হিব্রু ল থেকে। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো, তারা খোদার 'চজেন পিপল'; প্রতিটা ইসরায়েলীকেই খোদা পরম যত্নে তৈরি

করছেন। কাজেই এক ইহুদী যদি আরেক ইহুদীর চোখ উপড়ে ফেলে, সেটা যতোটা না ঐ মানুষটার বিরুদ্ধে অন্যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি খোদার বিরুদ্ধে অন্যায়। ফিলোসফিটা এমন---খোদা এতো কষ্ট করে এমন একটা জিনিস তৈরি করেছেন, তুমি কোন ছার যে তা নষ্ট করবা?)

-এক অভিজাত যদি এক সাধারণ মানুষের চোখ উপড়ে ফেলে, তবে তার ৬০ ভরি রৌপ্য জরিমানা দিলেই চলবে।

-এক অভিজাত যদি এক দাসের চোখ উপড়ে ফেলে, তবে সেই দাসকে যেই দামে কেনা হইসে, তার অর্ধেক জরিমানা হিসেবে দিলেই চলবে।

-এক অভিজাত পুরুষ যদি এক অভিজাত নারীকে গর্ভবতী করে ফেলে আর কোন কারণে সন্তানটি যদি মারা যায়, সেটা গর্ভাবস্থায় হোক কিংবা প্রসবের সময়, তবে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দশ ভরি রৌপ্য দিলেই চলবে। আর যদি কোন কারণে মহিলাটি মারা যায় তবে শাস্তি হিসেবে সেই লোকের কন্যাসন্তানটিকে হত্যা করা হবে।

-একই ঘটনা যদি এক অভিজাত পুরুষ এক সাধারণ নারীর সাথে ঘটায়, তবে জরিমানা হিসেবে দিতে হিবে আগের অর্ধেক। মানে পাঁচ ভরি রৌপ্য। আর সেই

মহিলা যদি মারা যায়, তবে আরো তিরিশ ভরি রৌপ্য দিলেই মাফ। অভিজাত বীরপুঙ্গবের কন্যাসন্তানটি এ যাত্রায় বেঁচে গেল।
-ঠিক এই ঘটনাই এক দাসীর সাথে ঘটলে অভিজাত পুরুষটিকে দিতে হবে যথাক্রমে দুই ভরি আর বিশ ভরি রৌপ্য।*
একটা অদ্ভুত নিয়ম খেয়াল করসেন নিশ্চয়ই। হামুরাবির সংবিধান অনুযায়ী পুত্র-কন্যা হচ্ছে বাপ-মা'র সম্পত্তি। অভিজাত বাবা পাপ করলে তার দায় ভোগ করতে হবে তার নিরপরাধ কন্যাটিকে। নারীদের জন্য পৃথিবীটা সবসময়ই কঠিন ছিল। অন্তত লিখিত ইতিহাস যতোদিনের, ততোদিন তো বটেই।

কঠিন ছিল সাধারণ মানুষের জন্যও। স্পষ্টতই, সেকালে অভিজাত মানুষের জন্য এক রকম আইন ছিল, আর সাধারণ মানুষের জন্য এক। সকল মানুষ যে সমান---এই ধারণা আসেই নি তখনো।

এই ধারণার প্রয়োগ আমরা দেখি আরো বহু বছর পর ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সংবিধানে। ইংল্যান্ডের রাজার শাসনে অতিষ্ঠ একদল ভদ্রলোক নিজেদের জন্য এক রকম আইন তৈরি করে। সেখানে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষনা করা হয়---সকল মানুষ সমান। যদিও মানুষ বলতে তারা অঘোষিতাভেব 'শাদা মানুষ'-কেই বোঝাচ্ছিল। কালো মানুষেরা তখনো সিলেবাসের বাইরে ছিল। সকল মানুষ সমান---এই বোধটা আসতে আরো দুশো বছর লেগে যায়। দরকার হয়ে অনেক রক্তের। কালো মানুষের রক্তের।

কিন্তু আসলেই কি সব মানুষ সমান? আমরা কি বায়োলজিক্যালী সমান? উহুঁ। অর্থনৈতিকভাবে সবাই একই শ্রেণীতে পড়ি? তাও না। তবে কিভাবে মানুষ সমান হয়? আইন করে সকাল মানুষকে সমান ঘোষণা করারই বা দরকার কী? এর পেছনে কি কারো স্বার্থ আছে? আইনের জন্মই বা কেন?

মনে রাখতে হবে, আইনের জন্ম কিন্তু অভিজাতদের হাতে। সাধারণ মানুষ তৈরি করে প্রথা, আর অভিজাতেরা আইন। গল্প যেমন মিথ তৈরি করে, আইনও দিনে দিনে একটা মিথ তৈরি করে। প্রকাশ্যে ধূমপান করলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা---এই আইনের কথা মনে আছে? এর ঠুনকোতা আমাদের আরবান কালচারে অনেক অনেক গল্প তৈরি করেছিল। নিউয়র্কে একটা মেয়ে চাইলেই প্রকাশ্যে টপলেস হতে পারবে, কিন্তু আইনত সেই টপলেস ছবি কোথাও কমার্শিয়ালী ব্যবহার করতে পারবে না। নিউয়র্কের জনসমাজেও হয়তো এই আইন নিয়ে নানা চটুল গল্প চালু আছে।

গল্প যেই কাজটা করে, আইনও ধীরে ধীরে সেই কাজটাই করে। একটা ইমাজিনড রিয়েলিটির জন্ম দেয়। জন্ম দেয় একটা অর্ডারের। সাধারণ মানুষের উপর ছড়ি ঘুরাবার জন্য এই অর্ডারটা দরকার অভিজাতদের। আইন ছাড়াও কিন্তু আমরা বেশ চলতে পারতাম। সেটা খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে। ১০০ কি ১৫০ মানুষের দলে। আরো বড় ফেইজে যখন কো-অপারেশনের প্রয়োজন হয়, তখনই দরকার হয় আইন। আইনের দণ্ডটা যদিও অভিজাতদের হাতে, একটা বড়সড় সমাজকে ফাংশনাল রাখতে আইনের আসলেই কোন বিকল্প নেই।

একটা দেশ বা জাতি কতোটুকু সভ্য---তার প্রমাণ হয় তার পাবলিক টয়লেট দেখে আর সে তার অভিজাতদের অন্যায়ের বিচার কতোটুকু করতে পারে---সেই মেট্রিক দিয়ে। আমাদের দেশে যেমন শুধু সংবিধানেই লেখা সবার জন্য একই আইন। বাস্তবে, অভিজাতদের জন্য এক আইন, আর সাধারণের জন্য আরেক। এদেশে একজন আইজি'র ছেলে যেমন বড় হতে হতে জেনে যায়, সে যে কারো উপর গাড়ি উঠিয়ে দিতে পারবে। ফুতপাতে ঘুমন্ত মানুষকে মেরে ফেললেও কেউ কিছু বলবে না। এই নলেজ কিন্তু সে সংবিধান পড়ে পায়নি, আশপাশটা দেখে পেয়েছে। আগেকার দিনে এই নলেজটাই অনেক খোলাখুলি সংবিধানে বলা থাকতো। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, ব্যাবিলনের মানুষকে ভাল-মন্দ জাজ করা আপনার বিবেচনা, কিন্তু তারা যে অনেক সৎ ছিল---সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যাবিলনের সংবিধানের সবটাই যে খারাপ ছিল---তা নয়। সমাজের প্রতি যেন ইনডিভিজুয়ালের দায়িত্ববোধ তৈরি হয়---তার জন্য বেশ কড়া কিছু নিয়ম-কানুন ছিল সেই বিধানে। ধরা যাক, এক ইঞ্জিনিয়ার আপনার বাড়ি তৈরি করে দিল। কিছুদিন পর সেই বাড়ি ধ্বসে গিয়ে সবাই মারা গেল। আইনমতে, সেই ইঞ্জিনিয়ারের তখন ফাঁসি হবে। আজকের পারস্পকেটিভে এটা লঘু পাপে গুরুদণ্ড হলেও সেকালের দৃষ্টিতে এটা ছিল ভয়ানক অপরাধ। আপনি যখন কারো জন্য কিছু নির্মাণ করছেন, তখন সেই বাড়িতে অবস্থানকালীন তার জানের জিম্মাদারিও আপনি নিচ্ছেন। সেই জান বিগত হওয়া মানে আপনারও আর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

কেবল সমাজের প্রতি ইনডিভিজুয়ালের নয়, ইনডিভিজুয়ালের প্রতি সমাজেরও একটা দায়িত্ব আছে। একটা আইন ছিল এমন---কোন একটা পাড়ায় কোন বহিরাগত এসে ছিনতাইয়ের শিকার হলে পাড়ার সবাই মিলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এটা হল পাড়ায় ছিনতাইকারী পোষার শাস্তি!

কোন বিধানই পারফেক্ট নয়। হামুরাবিরটাও না। তবু সেই সমাজে বিধান আর বিধানের বাইরের জীবনটায় দূরত্ব অনেক কম ছিল। সভ্যতার চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই দূরত্ব কেবল বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে।

চার কিস্তি এক

আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত স্বপ্নগুলোও আসলে 'ইমাজিনড অর্ডার'-ই ঠিক করে দেয়। পপুলার কালচার আমাদের বলে---Follow your heart. হৃদয়ের দাবি শোনো। এখন এই হৃদয়ের দাবি তো শূন্য থেকে ভেসে ওঠা কোন চাহিদা নয়। হাজার বছরের সভ্যতায় এই দাবিগুলো তৈরি হয়েছে। ঊনিশ শতকের রোমান্টিসিজম আর বিশ শতকের কনজ্যুমারিজম সেই পালে আরো হাওয়া লাগিয়েছে। আমরা নিজেদের যতোই বিদ্রোহী, বিপ্লবী বা হাওয়া বিরোধী দাবি করি না কেন, দিন শেষে আমরা সেই হাওয়ার সাথেই চলি।

আপনার হয়তো ছুটিছাটায় খুব বেড়ানোর শখ। এই শখ কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল না। এক আলফা শিম্পাঞ্জী গায়ের জোর খাটিয়ে আরেক দল শিম্পাঞ্জীর বাসায় দাওয়াত খেতে যেতো না। আমাদের মিশরীয় দাদুরা অবসরে কক্সবাজার না গিয়ে বানাতেন পিরামিড আর মমি। এই কক্সবাজার যাওয়ার কালচারটা শুরু করে মূলত

রোমানরা। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিকে অভিজাতরা তাদের সামার কাটানোর জন্য বেছে নিত মিশরকে; রোমানদের সেই কালচারই আজকের বিরাট পর্যটন শিল্পে রূপ নিয়েছে।

রোমান্টিসিজম আমাদের বলে, জীবনটাকে যতো পারো, উপভোগ করে নাও। যতো বেশি পারো, অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাও। আমাদের তাই সব রকমের বই পড়ে দেখতে হবে, সব রকমের মুভি চেখে দেখতে হবে, সব রকমের খাবারের স্বাদ নিতে হবে, সব রকম রিলেশনশিপের মজা নিতে হবে, আর যতো যতো দর্শনীয় স্থান আছে---সবগুলো দেখে মরতে হবে।

কেন ভাই? কেন আমাকে সব কিছুই করতে হবে? গিভ মি এ্যা ব্রেক!

কিন্তু রোমান্টিসিজম আপনাকে ব্রেক দিলেও কনজ্যুমারিজম আপনাকে ব্রেক দিবে না। সে সারাক্ষণ আপনার চোখের সামনে এই সবের বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হতে থাকবে। Ten things you must do before you get 30, ten places you must visit before you die, ten girls/boys you must date before you marry---এই সবই হচ্ছে পুঁজিবাদের টোপ। পত্রিকা ম্যাগাজিনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেই

টোপ চলে এসেছে আপনার মুঠোফোনে। দিনরাত এগুলো দেখে আপনিও এক সময় নিজের বাকেট লিস্ট তৈরি করা শুরু করেন। কনজ্যুমারিজম আপনাকে যেই ছাঁচের মানুষ বানাতে চাচ্ছে, আপনি নিজের অজান্তে সেই ছাঁচের মানুষে পরিণত হচ্ছেন। যদিও মনে মনে ভাবছেন---আমার হৃদয় আমাকে এটা বলছে। সত্যটা হচ্ছে এই যে, হৃদয় আপনাকে বলছে না। বলছে পুঁজিবাদ। আমি আপনি তাতে সাড়া দিচ্ছি কেবল।

কনজ্যুমারিজমের কাজই হচ্ছে প্রোডাক্ট বিক্রি করা। আর অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রোডাক্ট। আপনার কানের কাছে এসে দিনরাত বিড়বিড় করা হবে---নায়াগ্রা ফলস না দেখলে আপনার জীবন বৃথা। কিংবা "পৃথিবীতে দুই রকমের মানুষ আছে--এক, যারা নায়াগ্রা ফলস দেখসে, আর এক যারা তা দেখেনি।" আপনি নিশ্চয়ই দুই নম্বর দলে পড়ে থাকতে চাইবেন না। প্রিয় মানুষদের কম সময় দিয়ে হলেও আপনি এক্সট্রা খেটে সেই অভিজ্ঞতাটা কিনতে চাইবেন।

আপনি হয়তো এই মধ্যবিত্তের দলে পড়েন না। আপনি পড়েন বিত্তবানদের দলে। আপনার সাথে আপনার বউয়ের রিলেশনশিপ ক্রাইসিস চলছে। তো এই ক্রাইসিস মেটানোর জন্য আপনি তাকে লন্ডন বা প্যারিস নিয়ে গেলেন। অথচ রাত করে বাড়িতে না ফিরে বউকে সময় দিলেই হয়তো এই ক্রাইসিস মেটানো যেত। কিন্তু পুঁজিবাদের চাকা তো তাইলে বন্ধ হয়ে যাবে। পুঁজিবাদ চাইবে, আপনাদের মধ্যে বারংবার ঝগড়া হোক; আর আপনারা বেশি বেশি করে হিল্লিদিল্লি করুন!

ওয়েল, এই কাজটাই ফারাওরা করতো তাদের বউয়ের জন্য তার মন পছন্দ সমাধি বানিয়ে। বউ নিয়ে তারা ব্যাবিলন ঘুরতে যেতো না। মোগল সম্রাটেরা করতেন তাজমহল বানিয়ে। আমাদের তাজমহল বানানোর সামর্থ্য নেই। কাজেই, আমরা বেশি বেশি করে এক্সপেরিয়েন্স নেবার চেষ্টা করি। এই এক্সপেরিয়েন্সগুলোই আমাদের তাজমহল। সমস্ত সভ্যতাই এভাবে তাজমহল বানিয়ে গেছে। তাজমহলের রূপটা কেবল বদলেছে যুগে যুগে।
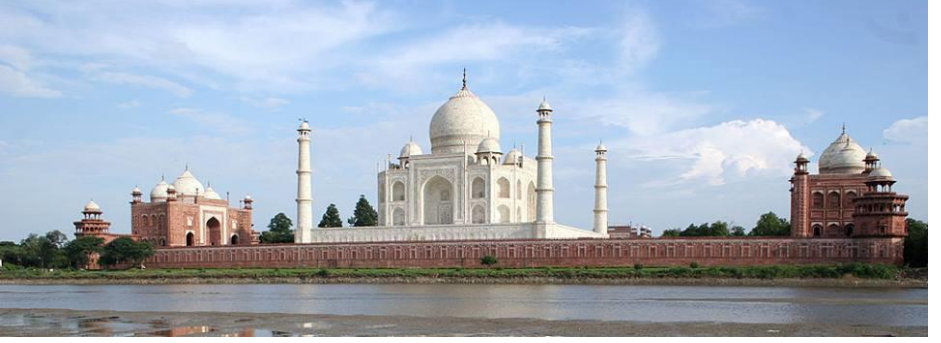
হৃদয়ের দাবি নয়, সময়ের দাবীই তাই আমরা শুনে চলেছি বারবার। সাজেকের ইতিহাস হয়তো আপনার জানা। কীভাবে সেখানকার মানুষদের উচ্ছেদ করে সাজেক বানানো হয়েছে---আপনি তার খুঁটিনাটি জানেন। কাজেই, সাজেকে যেতে আপনার মন ঠিক সায় দেয় না। এদিকে বন্ধুবান্ধবের তোলা ছবি দেখে আপনার ঘুম পাড়ানো ইচ্ছেটা আবার জেগে ওঠে; আর এটা তো জানা কথাই যে, সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে কনজ্যুমারিজমের সবচেয়ে বড় চারণক্ষেত্র। আপনি গাড়ি, বাড়ি, ডিএসএলার---যাই কিনেন না কেনো, আপনাকে একটা ম্যণ্ডাটরি ছবি দিতেই হবে। মানুষ একটা কিছু অর্জন করে যতোটা না সুখ পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ পায় অন্যের মধ্যে হাহাকার তৈরি করে। দিন শেষে আপনিও তাই ব্যাকপ্যাক নিয়ে সাজেকের উদ্দেশে রওনা দেন। জিত হয় কনজ্যুমারিজমের।

নিজের কথাই বলি। শাদা ইউরোপীয়রা এককালে আমেরিকার আদি অধিবাসীদের মোটামুটি নিশ্চিহ্ন করে তাদের ইমাজিনড অর্ডার তৈরি করেছে এখানে। আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, সেখানটিতেই হয়তো কোন আদিবাসী ফ্যামিলির সুখী, সুন্দর সংসার ছিল। তাদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আমরা জ্ঞানচর্চা করে চলেছি। এই জ্ঞানটুকু থাকার পরও আমরা কিন্তু এখানে আসি। এসে অন্যদের উপদেশ দিই, ফলো ইয়োর হার্ট। যদিও আমরাও সময়ের দাবিতেই এখানে এসেছি।

সবাই যে কনজ্যুমারিজমের দাস---তা অবশ্যই নয়। এক আধজন পাগল সব জায়গাতেই থাকে, যারা কিনা হৃদয়ের দাবি শোনে। এদের মধ্য থেকেই কেউ নিউটন হয়, আর কেউ হয় কৈলাশ সত্যার্থী।

চার কিস্তি দুই

গল্পের মিশরীয় ভার্সনটা এরকম।

দেবতা থট একবার এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করলেন; এর নাম লিখিত ভাষা। এই নিয়ে তিনি সম্রাট থামুসের কাছে হাজির হলেন। ভাবলেন, এই নতুন টেকনোলজি দেখে রাজা বেজায় খুশি হবেন। কিন্তু না! রাজা বেজার হলেন। বললেন, এই টেকনোলজি লইয়া আমরা কী করিব? এর ফলে তো মানুষ আর কিছু মনে রাখতে চাইবে না। সব পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত হবে। আস্তে আস্তে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পাবে।

থামুসের ভবিষ্যৎবাণী পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্যি হয়েছে বলা যায়। তাতে কী? টেকনোলজি এমন একটা জিনিস যাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারে না। কোন রাজা-মহারাজাও না। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই তাকে আপন করে নেয়। থটের লিখিত ভাষাও তাই মানুষ যাকে সভ্যতা বলে, অতি দ্রুত সেই সভ্যতার কেন্দ্রে জায়গা করে নিল।

দেবতাদের গল্প পুরাণের পাতাতেই থাক। আমরা পুরাণ ছেড়ে বাস্তবে আসি।

কবি বলেছেন, Necessity is the mother of invention. ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে মানুষ যতো বাড়ছিলো, তাদের ফসলের ম্যানেজমেন্ট করাও ততো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। কে কতোটুকু ফসল ফলাচ্ছে, কার কাছ থেকে কতোটুকু খাজনা নিতে হবে---বেচারা গ্রামপ্রধান তার ছোট্ট মগজ দিয়ে এই ব্যাপারগুলোর আর ট্র্যাক রাখতে পারছিলো না। যদিও পপুলার সায়েন্স আমাদের বলে, Your brain is bigger

than you think. আমাদের মগজ আসলে ডাটা এ্যানালাইজ করার জন্য ভালো মাল, ডাটা স্টোর করার জন্য নেহাৎ-ই ভুষি মাল।

গ্রামপ্রধানের এই দুর্দিনে এগিয়ে এলেন কিছু সুমেরীয় জিনিয়াস। কোথা থেকে কীভাবে ঠিক জানা যায় না, তবে লিখিত ভাষার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তারা এই সমস্যার আপাত সমাধান দিলেন। সেটা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা।

সুমেরীয়রা দু'রকম চিহ্ন ব্যবহার করতো। একটা ছিল সংখ্যাভিত্তিক চিহ্ন। ১, ১০, ৬০, ৬০০, ৩৬০০, ৩৬০০০---এই বিশেষ সংখ্যাগুলোর জন্য তাদের আলাদা আলাদা চিহ্ন ছিল। সংখ্যাগুলো কি চেনা চেনা লাগছে? লাগারই কথা। আজ আমরা যে সময় গণনা করি---তা তো এই ৬ ভিত্তিক সংখ্যার বদৌলতেই। এমনকি আমাদের দিনও হয় ২৪ ঘণ্টায়। সেও ৬ দ্বারা বিভাজ্য। আর এক ধরনের চিহ্ন দিয়ে বোঝাতো মানুষ, পশুপাখি---এইসব।

মানুষ, পশুপাখি, ঘরবাড়ির ছবি দিয়ে ওরা যে ভাষা কাঠামো তৈয়ার করেছিল---একে বলে পিকটোগ্রাম। আমাদের আজকের বর্ণমালার বিবর্তন খেয়াল করলে দেখবেন, প্রায় প্রতিটা বর্ণই এসেছে কোন না কোন ছবি থেকে। ছবি মা, বর্ণ তার দুষ্টু সন্তান।

A এর বিবর্তনটা লক্ষ্য করুন। শুরুতে A দেখতে ছিল ষাঁড়ের মাথার মত। আস্তে আস্তে সেটা বিবর্তিত হতে হতে আজকের A তে এসে ঠেকেছে। একুইভাবে B এসেছে কুঁড়েঘর থেকে। C উটের কুঁজের বিবর্তিত রূপ। আর O চোখের সংক্ষিপ্ত ভার্সন।

Egyptian
3,000 BC

Sinai
1,850 BC
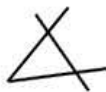
Phoenician aleph
1,200 BC

Greek alpha
600 BC

Roman A
114 AD

Egyptian hieroglyph cottage	Proto-Canaanite house	Phoenician □ *beth*	Greek **B** beta	Etruscan □ B	Latin B
			Bβ		B

বর্ণগুলো না হয় বুঝলাম ছবি থেকে এসেছে। বর্ণগুলোর উচ্চারণ কোথা থেকে এসেছে? এসেছে শব্দ থেকে। বাবা আদামকে খোদা দায়িত্ব দিয়েছিলেন সকল পশুপাখির নাম দেবার। উনি তাদের কী নাম দিয়েছিলেন আমি জানি না। তবে ফিনিশীয়রা কী নাম দিয়েছিল---সেটা জানা যায়। ফিনিশীয়রা ষাঁড়কে বলতো aleph. সেই আলেফ থেকেই গ্রীক আলফা বা আরবী আলিফের জন্ম। যা কিনা আজকের A. ঘরকে ওরা বলতো beth. গ্রীক বেটা'র সাথে কোন মিল পাচ্ছেন কি? কিংবা আরবি বা আর ইংরেজি b এর সাথে? বেথেলহেমের নাম তো সবাই শুনেছেন। প্রভু যীশুর জন্মস্থান। bêth আর lehem---এই দুটি শব্দের মিলনে মেথেলহেমের জন্ম। Bêth মানে তো এখন বুঝতেই পারছেন ঘর। আর lehem মানে রুটি। বেথেলহেম হল সেই শহর বা ঘর যেখানে রুটি বানানো হত।

সুমেরিয়ান বর্ণমালাকে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা বলা যায় না। এতে অল্প কিছু কাজই হত। মূলত অফিশিয়াল কাজ সব। আমাদের জন্য রেখে যাওয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথম মেসেজও অফিশিয়াল। মেসেজটা এরকমঃ "২৯০৮৬ মণ বার্লি, ৩৭ মাস, কুশিম।" এর অর্থ সম্ভবত এরকমঃ বিগত ৩৭ মাসে ২৯০৮৬ মণ বার্লি সংরহ করা হইসে। সাক্ষরে, কুশিম।

ইতিহাসের প্রথম টেক্সটে কোন কবিতা নাই, কোন ফিলোসফি নাই, এমনকি কোন রাজ-রাজড়ার যুদ্ধজয়ের গল্পও নাই; আছে কাঠখোট্টা হিসাব নিকাশ।

আমাদের প্রথম চিন্তা তাই কোন মহৎ চিন্তা নয়। ধর্মীয়, সামাজিক, আধ্যাত্মিক কোন উঁচু স্তরের চিন্তা নয়। আমাদের প্রথম চিন্তা চাল, ডাল তেল আর নুনের চিন্তা। পেটের চিন্তা, পিঠের চিন্তা।

উঁচু স্তরের চিন্তা যে একদমই ছিল না--তা নয়। হোমার কোন রকম লিখিত ভাষার সাহায্য ছাড়াই মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। মানুষের মুখে মুখে সেই কবিতা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আপনি যখন খাজনা আদায় করতে যাবেন, তখন মুখের ভাষায় কাজ হবে না। কে কতোটুকু খাজনা দিয়েছে, তা লিখে রাখতে হবে। কবিতা আর খাজনা দুটো পরস্পরবিরোধী ব্যাপার হলেও এই দিয়ে মিলেই জন্ম দিয়েছে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ভাষার।

এই সময়ের আরেকটা স্ক্রিপ্ট আমরা হাতে পাই। এতে অল্প কিছু শব্দ বার বার লিখা আছে। '৪০ মণ ধান', '৪০ মণ ধান', '৪০ মণ ধান'---এরকম কিছু একটা হবে। সম্ভবত কোন নাদান বালকের হোমওয়ার্ক-এর খাতা এটি। সেকালে পড়াশোনা করে ছেলে আমলা হবে---এই চিন্তা থেকেই অভিজাতেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিত। পড়াশোনা করে কেউ হোমার বা মধুসূদন হবে---এই চিন্তা তারা মাথাতেও আনতো না।

এর কারণও ছিল। লেখালেখি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। আজকের মত কীবোর্ডে টাইপ করে বা কাগজে ঘষঘষ করেই কিছু একটা লেখা যেত না। লিখতে হত মাটির ট্যাবে। আজকের ট্যাবে লেখা যতোটা সোজা, মাটির ট্যাবে লেখাটা ছিল ততোটাই কঠিন। কেউ আর তাই কষ্ট করে মাটির ট্যাবে গল্প-উপন্যাস লিখতে যেত না। স্রেফ এবং স্রেফ হিসাবপত্তর করার জন্যই ঐ খাটনিটুকু খাটতো।

ইনকারা এক বিশেষ রকমের ভাষা ব্যবহার করতো। ওরা কিছু দড়ি পাশাপাশি সাজাতো। সেই দড়িগুলো দিয়ে নানা রকমের গিট্টু বাঁধতো। গিট্টুগুলোকে আবার নানা

রঙে রাঙাতো। দড়ি, গিট্টু আর রঙের পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে ওরা ওদের দৈনন্দিন যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগকরে নিত। গোটা ব্যাপারটা এখনো গবেষণার বিষয়। (ছবি ৩ এবং ৪)
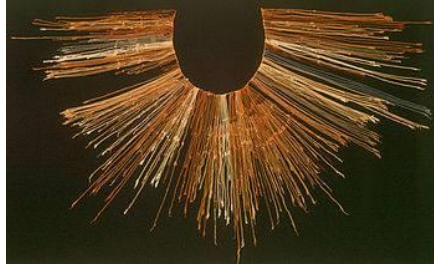
ছবি ৩
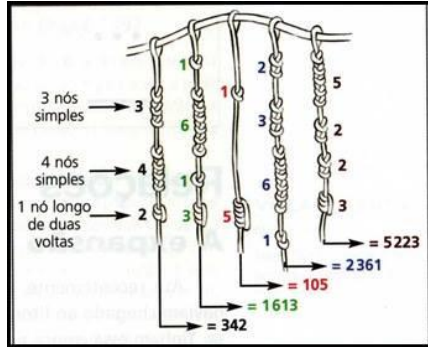
ছবি ৪

স্প্যানিশরা যখন প্রথম দক্ষিণ আমেরিকায় আসে, তখনো এই কিপোর চল ছিল। দেখা গেল, কিপোর মাধ্যেম হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে স্থানীয়দের সাহায্য নিতে হচ্ছে। স্থানীয়রা স্প্যানিশদের কিপো অজ্ঞতার সুযোগে নানা রকম ঠক-জোচ্চোরি করছে। আস্তে আস্তে স্প্যানিশরা যখন গোটা মহাদেশ দখল করে নিল, তখন এই ভাষা বাতিল করে নিজেদের ল্যাটিন স্ক্রিপ্ট চালু করলো। কিপো চলে গেলো ইতিহাসের খরচের খাতায়। কিপোর অর্থ উদ্ধার করার মত আর একটা লোকও এক সময় জীবিত রইলো না।

চার কিস্তি শেষ

খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭৬ সালের এক সকাল।

রাম আর শামের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ লাগলো। রাম বলে, এই জমি সে শামের কাছ থেকে তিরিশ বছর আগে কিনছে। শাম সেটা বেমালুম অস্বীকার করলো। শামের ভাষ্য--- সে এই জমি রামকে তিরিশ বছরের জন্য ইজারা দিসিলো; ইজারার মেয়াদ শেষ, কাজেই এই জমি এখন আবার তার।

ঝগড়া মেটানোর জন্য তারা রাজ্যের তহশিল অফিসে গেলো। সেখানকার কর্মচারীরা তাদের এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরাইতে লাগলো। শেষমেশ এক কর্মচারীর খোঁজ পাওয়া গেলো, যে তাদের এই দলিলের সন্ধান জানে। সেও তাদের খালি চা খাওয়ায়, মিষ্টি-মধুর গল্প করে আর পরের দিন আসতে বলে।

একদিন তাদের ভাগ্যের চাকা খুললো। সেই কর্মচারী যে বিশেষ ভল্টে সব দলিল রাখা হয়েছে, সেই ভল্ট খুলে দেখালো---হাজার হাজার মাটির ট্যাবলেটে ভল্ট ভর্তি। এই খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজবে কে? ধরে নিলাম, খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও পেলো। এখন এটাই যে গত তিরিশ বছরে করা লাস্ট ডকুমেন্ট, এর মধ্যে যে জমির আর হাত বদল হয়নি, এর গ্যারান্টি দেবে কে?

এই সমস্যা সমাধান করার জন্য দরকার হল ডাটা ক্যাটালগ করার। ঠিকমত ক্যাটালগ করে রাখলে দলিল খুঁজতে গিয়ে আর এই হুজ্জত করতে হত না। আর এই ক্যাটালগ করতে গিয়েই জন্ম নিল একটি বিশেষ পেশার। ব্রিটিশ আমলে আমরা যাদের কেরানী বলতাম। আজকাল বলি এক্সিকিউটিভ।

ক্যাটালগ করে রাখার একটাই সুবিধা---যখন যার ফাইল দরকার হবে, সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এতে কিছুটা সময় সেভ হচ্ছে বটে। কিন্তু তার চেয়ে বহুগুণ সময় নষ্ট হচ্ছে একই ফাইল দশ টেবিলে ক্রস চেক হয়ে যেতে যেতে। অবশ্য ব্যুরোক্রেসির মূল মটোই হচ্ছে এ্যাকিউরেসি, এফিশিয়েন্সি নয়। সেটা প্রাচীনকালের আমলাতন্ত্রই হোক আর একালের।

মিশরের ব্যুরোক্রেসির দিকে একটু তাকাই। মিশরে সাধারণ মানুষ কোন জমির মালিক ছিল না; জমির মালিক ছিল ফারাওরা। কে কোন জমিচাষ করবে, কতোটুকু ফসল নিজে রাখবে আর কতোটুকু ফারাওর দুয়ারে পাঠাবে---সব নিয়ন্ত্রণ করতো এই ফারাওরা। অবশ্যই নিজেরা এই কাজ করে হাত ময়লা করতো না। এই কাজ করতো এক শক্তিশালী ব্যুরোক্রেসি দিয়ে।

এই ব্যুরোক্রেসি ছিল অনেকটা আজকের কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর মত। প্রফিট আর প্রফিটই ছিল এদের জীবনের মূল লক্ষ্য। একটা গাছ কাটতেও সেসময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের পারমিট লাগতো। পারমিট লাগতো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে মুভ করতেও। ঠিক এরকম একটা ব্যবস্থা ছিল জারের সময় রাশিয়াতেও। সরকারের পারমিশন ছাড়া কেউ এক ফার্ম থেকে আরেক ফার্মে যেতে পারতো না। এই ধরনের অধিবাসীদের একটা নামও আছে। এদের বলা হয় Serf. Less than subject,

more than slave. দাসের চেয়ে উঁচু, মানুষের চেয়ে নিচু। (আজকেও যে সাধারণ মানুষ serf দের চেয়ে খুব ভালো অবস্থায় আছে---তা বলা যায় না!

ব্যুরোক্রেসির আরেকটা বদনাম হচ্ছে এরা মানুষের খাটনির উপর যত্রতত্র ট্যাক্স বসিয়ে নিজেদের রুটি রোজগার করে। মিশরীয় ব্যুরোক্রসি ছিল এক্ষেত্রে সেরা। অন্তত প্রাচীন যুগে। ধরা যাক, এক লোক এ্যালকোহল উৎপাদন করবে। এর জন্য তাকে পয়সাকড়ি দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। এই ট্রেড লাইসেন্স ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিচিত হলেও সেকালে ছিল একেবারেই অনন্য। কেবল মিশরীয়রাই এই গোপন রহস্যের কথা জানতো। রোমানরাও না, ফিনিশীয়রাও না।

তারপর তাকে সরকারী কোন কোম্পানি থেকে বার্লি কিনতে হত। সেই বার্লির উপর এক দফা ট্যাক্স বসবে। উৎপাদন করার পর তাকে বিক্রিও করতে হবে সরকারী কোন কোম্পানির কাছে। সেইখানে আরেক দফা সেলস ট্যাক্স। সরকার সেটা সীল টীল দিয়ে আবার হয়তো সেই লোকের কাছেই বিক্রি করবে। এবার কেনার সময় তাকে আরেক দফা ট্যাক্স দিতে হবে। অনেকটা বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মত। আমাদের ট্যাক্স দিয়ে কাঁচামাল কিনতে হয়। সেইটা দিয়ে আমরা জামাকাপড় বানাই। সেটা বাইরে চালান করি সীল লাগানোর জন্য। থাইল্যান্ড থেকে সেটা সীল সমেত আমাদের রেক্স বা কেলভিন ক্লেইনে জায়গা করে নেয়। আমরা সেটাই আবার বেশি দামে কিনে নিই।

ব্যুরোক্রেসির সবটুকুই যে খারাপ---তা নয়। ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানেই ব্যুরোক্রেসির বিকাশ হয়েছে, সেইখানেই গণিতের বিকাশ হয়েছে। সেটা চাইনিজ ব্যুরোক্রেসি হোক কিংবা মিশরে। যতো বড় সাম্রাজ্য, ততো বেশি ডাটা। আর এই ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য গণিতবিদদেরও সারাক্ষণ দৌড়ের উপর থাকতে হয়েছে। নিত্য নতুন গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করে সাম্রাজ্যের চাহিদা মেটাতে হয়েছে।

আজ যারা সমাজের এলিট, তারা সবাই এই গণিতের ভাষাতেই কথা বলেন। বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, ইকোনমিস্ট থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদেরা পর্যন্ত। মানুষের সুখ আজ মাপা হয় জিডিপি দিয়ে। আপনি সৎ কিনা মাপা হয় আপনার ক্রেডিট স্কোর দিয়ে। আপনি প্রেমিক হিসেবে সফল কিনা--মাপা হয় আপনারা কয়টা বসন্ত একসাথে পার করেছেন, সেই সংখ্যা দিয়ে।

গণতন্ত্র হোক আর একনায়কই হোক---ব্যুরোক্রেসি না হলে কারোরই চলে না। দিন শেষে আমরা এই কচ্ছপকে গালি দিই, অভিশাপ দিই---যাই করি, যতো নতুন সমাজের স্বপ্নই দেখি না কেনো---সেই প্রতিটা নতুন সমাজেই কোন না কোন ফর্মেটে এই ব্যুরোক্রেসি থাকবেই।

অধ্যায় পাঁচ কিস্তি শূন্য

মানুষ দুই রকমের। এক, যারা হিপোক্র্যাট; আর দুই, যারা হিপোক্র্যাট।

ইতিহাসের বড় সময়টা জুড়েই আমরা হিপোক্র্যাসি করে এসেছি। আর প্রায়ই সেটা এতো উঁচু লেভেলের হিপোক্র্যাসি হয় যে, আমরা যে হিপোক্র্যাট---ঐ সেন্সটুকুও আমাদের মাথায় আসে না।

১৭৭৬ সালের সংবিধানে আমেরিকানরা যখন ঘোষণা করে, সকল মানুষ সমান, তখন তারা মানুষ বলতে কেবল শাদা চামড়াদেরই বোঝাচ্ছিল; আরো স্পেসিফিক্যালী বলতে গেলে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের। নারীদেরও সেই সমাজে কোন বিশেষ স্থান ছিল না। ভোটাধিকারই ছিল না; রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি---এইসব বিষয়ে কোন 'say' থাকা তো দূরের কথা।

বলা বাহুল্য, নিগ্রো দাসেরাও ছিল সিলেবাসের বাইরের মানুষ। যারা আমেরিকার জাতির জনক ছিলেন, এই সংবিধানে যারা সাক্ষর করেছিলেন, তাদের নিজেদেরও প্রচুর দাস ছিল। দাসদেরও তো যে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে---এই চিন্তাটাই তাদের মাথায় আসেনি। কিংবা এলেও নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই একে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। নিজের স্বার্থ তো পাগলেও বোঝে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে আবার এটাকে খোদার ইচ্ছা বা প্রকৃতি মায়ের ইচ্ছা বলে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। দাসপ্রথা যে ইতিহাসের পথ ধরে মানুষেরই উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার---এটা তারা মানতেই চায় না। হামুরাবি যেমন তার দেয়া বিধিবিধানকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। উনি জানতেন, আল্লাহর নামে কিছু একটা চালিয়ে দিলে কেউ তা অমান্য করার সাহস পাবে না।

এরিস্টটটল ছিলেন এক ধাপ এগিয়ে। উনি মনে করতেন, অভিজাত মানুষেরা এক রকম অভিজাত মানসিকতা নিয়েই জন্মায়। আর দাসেরা জন্মই নেয় দাস মেন্টালিটি নিয়ে। কাজেই, যে দাসের ঘরে জন্মেছে, তার মেন্টালিটি অমন বলেই সে এই ঘরে জন্মেছে। মেন্টালিটি ভালো হলে কোন উঁচু বংশেই জন্মাতো।

শ্বেতাঙ্গরা তো মনেই করে, তাদের রক্তে এমন কিছু আছে যা তাদের অন্যদের চেয়ে উন্নততর মানুষে পরিণত করে। তাদের এই ভাবনাকে জ্বালানি দেয় বিশ শতকের শুরু দিকে আমেরিকায় 'ইউজেনিক্স' নামে একটি আন্দোলন। বিজ্ঞানের মোড়কে এর মূল বক্তব্য হচ্ছে, রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে বেটার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম দেয়া। হরলিক্সের ভাষায়---টলার, স্ট্রংগার, শার্পার প্রজন্মের জন্ম দেয়া। বিশুদ্ধ রক্ত মানে অবশ্যই শ্বেতাঙ্গ রক্ত। আর্য রক্ত। ককেশিয়ান রক্ত।

উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। আমেরিকায় সেই সময় ইমিগ্র্যান্টদের একটা প্রবল স্রোত ঢুকছিল। গোঁড়া আমেরিকানদের ভয় ছিল, ইমিগ্র্যান্টদের রক্তের সাথে ইউরোপীয় আমেরিকানদের রক্ত মিশে একটা দূষিত প্রজন্ম তৈরি হবে। কাজেই, এই দূষিত প্রজন্মের হাত থেকে আমেরিকাকে বাঁচাতে হবে।

কার্নেগী ফাউন্ডেশন, রকাফেলার ফাউন্ডেশনের মত বড় বড় পুঁজিপতিরা একে প্রোমোট করতে থাকে। রকাফেলার ফাউন্ডেশন তো খোদ হিটলারের জার্মানিতে একে ফান্ড করে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়ে কোর্স চালু হয়। রিসার্চ চলতে থাকে পুরোদমে। মানুষ যে বৈষন্য রীতিমত পছন্দ করে, অন্তত যেখানে নিজের স্ট্যাটাস কো ধরে রাখলে সুবিধা পাবে---এটা তার প্রমাণ।

পশ্চিম ছেড়ে এবার পূর্বে যাত্রা করি। হিন্দুরা মনে করে, ভগবান পুরুশা নামক এক প্রাচীন সত্তার শরীর থেকে মানবজাতিকে তৈরি করেছেন। পুরুশার মুখ থেকে তৈরি করেছেন ব্রাহ্মণদের (তাই তারা মন্ত্রপাঠ করে), বাহু থেকে তৈরি করেছেন ক্ষত্রিয়দের (তাই তারা যুদ্ধ করবে), বৈশ্যদের ঊরু থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে। যে মুহুর্তে আমরা এই মিথে বিশ্বাস স্থাপন করছি, ঐ মুহূর্তে আমরা ব্রাহ্মণ আর শূদ্রদের মধ্যকার সমস্ত বৈষম্যের সোশ্যাল জাস্টিফিকেশন দিয়ে দিচ্ছি। এই ধরনের বিশ্বাস যে কেবল সনাতন ধর্মমতেই সীমাবদ্ধ ছিল--- তা না। চাইনিজদের মধ্যেও এই ব্যাধি ছিল প্রবল। চাইনিজরা বিশ্বাস করতো, ঈশ্বর যখন মাটি দিয়ে মানুষ বানালেন, তখন

তিনি অভিজাতদের বানালেন মিহি হলুদ মাটি দিয়ে আর আমজনতাকে বানালেন কাদামাটি দিয়ে।
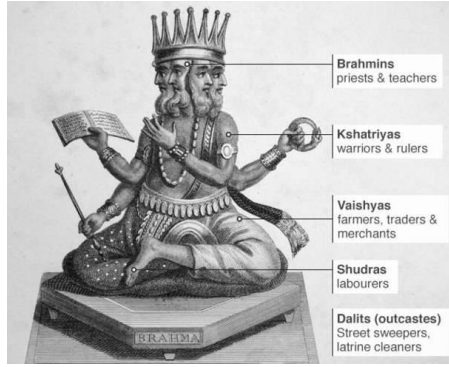
হায়ারার্কি কি কেবল গায়ের রঙে হয়? কিংবা মিথের জোরে হয়? হায়ারার্কি অর্থের জোরে হয়, বিত্তের জোরে হয়, ক্ষমতার জোরে হয়। একটা সময় ছিল যখন শাদাদের স্কুলে কালোরা পড়তে পারতো না। শাদাদের জন্য আলাদা বাস, বীচ---সবই ছিল। বাসের গেটে লেখা থাকতো---Dogs and blacks are not allowed. এখন সেই অবস্থার উত্তরণ হয়েছে। আজ একটা শাদা পাড়ায় কালো লোক বাড়ি ভাড়া নিতে গেলে কেউ অবাক হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গোটা স্ট্রাকচারটাই এমন হয়ে আছে, যে শাদাদের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নেবার সামর্থ্যও একটা কালো লোকের থাকে না। ফলে আইনগতভাবে না থাকলেও বাস্তবে সেই বৈষম্যগুলো রয়েই গেছে।

বিত্তবানরা খুব স্থূলভাবেই নিজেদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে রেখেছে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য পশ স্কুলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এমন একটা অর্থনৈতিক ব্যারিয়ার তৈরি করে রেখেছে সেখানে, একটা কৃষকের ছেলে যতো মেধাবীই হোক না কেন, সেইসব স্কুলে পা মাড়াতে পারবে না। তাকে হয় সরকারি প্রাইমারি স্কুলে যেতে হবে নয়তো মাদ্রাসায়। আপনি একজন কালো দিনমজুরকে দেখবেন না সাউথ ইস্ট ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে বা এ্যাপোলো হসপিটালের করিডোরে হাঁটাহাঁটি করতে। তাদের বড়জোর ইসলামী ব্যাঙ্কে টাকা গুণতে দেখা যেতে পারে বা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বারান্দায়।

কে লুঙ্গি পরে এলো আর কে জিন্স পরে এলো---এটা তাই না চাইতেও আমাদের অনেক আচরণ ঠিক করে দেয়। নিজের অজান্তেই আমরা তখন আমেরিকার ঐ জাতির পিতাদের মত হিপোক্র্যাটের দলে নাম লেখাই।

পাঁচ কিস্তি এক
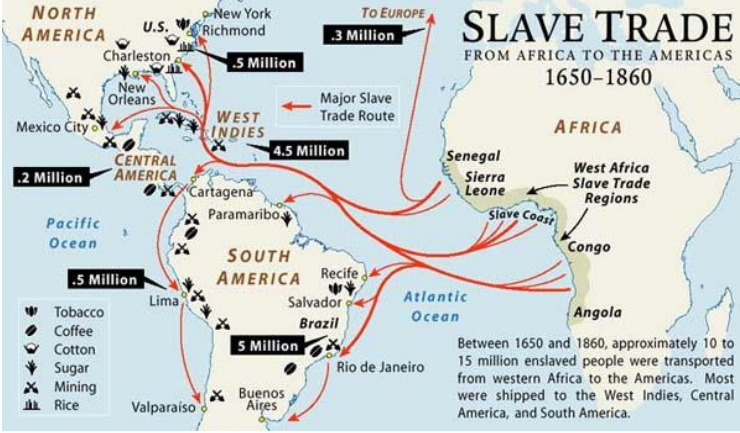
দাসপ্রথার ইতিহাস খুব নতুন নয়। রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই এটা প্রচলিত ছিল। এক রাজ্য আরেক রাজ্যকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলে পরাজিত রাজ্যের নারী-পুরুষকে দাস হিসেবে খাটানোর প্রথা ছিল। গায়ের রঙের সাথে এর কোনরকম সংযোগ ছিল না তখন।

দাসপ্রথার সাথে বর্ণবাদের সংযোগ ঘটে মধ্যযুগে। ইউরোপ তখন আফ্রিকা দখল করে নিচ্ছে। এশিয়ায় অভিযান চালাচ্ছে। আমেরিকা নামে একটা নতুন মহাদেশও আবিষ্কার করেছে। ইউরোপের লোভ আর দুরন্ত শক্তিমত্তার কাছে গোটা দুনিয়া তখন অসহায়।

উপনিবেশ থেকে পাওয়া স্বর্ণ আর সম্পদে ইউরোপীয়দের অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই অর্থনীতির জোয়াল কাঁধে নেবার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল শ্রমিকের। সস্তা শ্রমিকের।
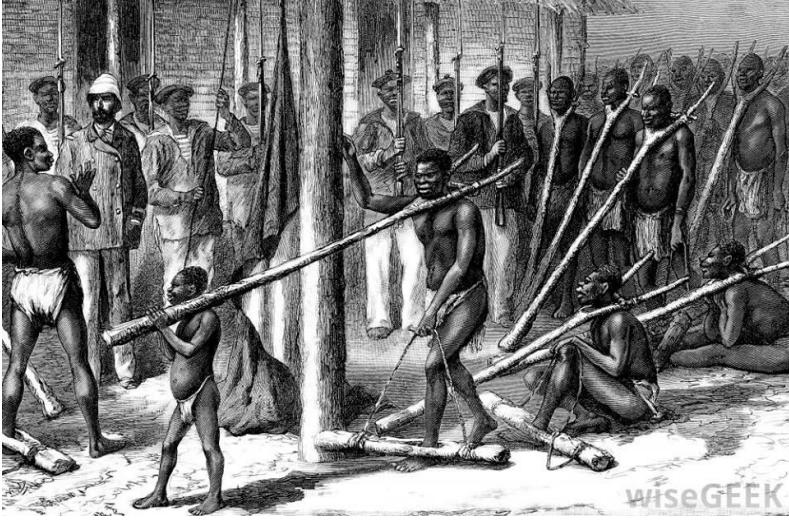
আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা এই শ্রমের যোগান দিতে পারছিল না। রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল অতিমাত্রায় স্বাধীনচেতা। কোন রকম ভয়ভীতি দেখিয়ে বা ধর্মীয় গ্রন্থের দোহাই দিয়ে তাদের বশে আনা যায়নি। ফলশ্রুতিতে কখনো ছলেবলেকৌশলে, কখনো বা কোনরকম ভণিতা ছাড়াই অসম যুদ্ধে তাদের লিটার‍্যালী মেরে ফেলতে হয়েছে। গণহারে তাদের দাস হিসেবে খাটানো সম্ভব হয়নি যেটা করা গেছে আফ্রিকার দাসদের সাথে। জাহাজ বোঝাই করে দলে দলে দাস আমদানি করা হয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকায়। কালোদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারকে অস্বীকার করে তাদের খাটানো হয়েছে অমানুষিক পরিশ্রমের সব কাজে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের মত প্রভাবশালী সব ব্যাঙ্কের জন্মই এই দাস ব্যবসাকে কেন্দ্র করে।

অথচ ইউরোপে তখন কিন্তু রেনেসাঁস শুরু হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বার্তা প্রবাহিত হচ্ছে দিকে দিকে। এমন একটা সময়েও ওরা কীভাবে পারলো কালোদের এরকম মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করতে?

একটা ব্যাখ্যা তো মাত্রই দিলাম। অর্থনীতির চাহিদা আর যোগানের খেল।

কস্ট মিনিমাইজ করাও ছিল একটা ফ্যাক্টর। আফ্রিকা ছিল আমেরিকার কাছের বাজার। সেনেগাল থেকে একটা দাস কিনে আনতে তার যে পরিমাণ ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হত, ভিয়েতনাম থেকে আনতে গেলে তার চেয়ে বেশিই হবে। শুধু শুধু কেন সে ভিয়েতনাম যাবে দাস আনতে?

তার উপর আগে থেকেই আফ্রিকা থেকে দাসের একটা সাপ্লাই চেইন গড়ে উঠেছিল মধ্যপ্রাচ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য। আরব্য রজনীর পাতায় পাতায় দেখবেন আফ্রিকানদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, খোঁজা করে হেরেমে রাখা হচ্ছে। অর্থনীতির নিয়মই হল, নতুন বাজার খোঁজার চেয়ে এগজিস্টিং বাজার থেকে কেনাকাটা করাই ভালো। আমেরিকাও সেই পথেই গেলো।

সবচেয়ে বড় কথা---আমেরিকার যে ফার্মগুলা ছিল, ভার্জিনিয়া, হাইতি আর ব্রাজিলে, সেগুলো ছিল প্লেগের আখড়া। ইউরোপীয়রা যেখানে প্লেগকে যমের মত ভয় পাইতো (আলবেয়ার কামু তো কয়েকশো পাতার উপন্যাসই ফেঁদে বসেছেন এই প্লেগকে নিয়ে), আফ্রিকানদের শরীরে সেখানে এইসব রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে একটা ইম্যুনিটি তৈরি হয়ে গেসিলো। ইম্যুনিটি তৈরি হওয়া শরীরের জন্য ভালো। কিন্তু সোশ্যাল পিরামিডে আপনার অবস্থানের জন্য ভালো কিনা---তা বলে দেবে ঐ সময় আর ঐ সময়ের পাওয়ার মেকানিজম। অভিজাত ইউরোপীয়রা (ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, আইরিশ) তাই গরীব ইউরোপীয়দের (ইউক্রেন, গ্রীস কিংবা বেলারুশের অধিবাসীদের) দাস না খাটিয়ে দাস খাটালো শক্ত সামর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আফ্রিকানদের।

ওহ! আসল ঘটনাই তো বলা হয়নি।

ইউরোপীয়রা যখন প্রথম আফ্রিকার কালো মানুষের সাক্ষাৎ পায়, তখন এই মানুষগুলো সত্যিই মানুষ তথা হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা—এই নিয়েই তারা সংশয়ে পড়ে গেসিলো। এই সংশয় কিন্তু তাদের ভারতীয় বা চাইনিজদের নিয়ে

ছিল না। কাজেই, মানুষ যে ন্যূনতম অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়—কালোদের ক্ষেত্রে তা পূরণ করার বাধ্যবাধকতা নিয়ে তাদের মনে কোন নৈতিক দায়বদ্ধতা ছিল না।

বাইবেল ঘেঁটে ধর্মগুরুরা এই নৈতিক দায়বোধ থেকে তাদের মুক্তি দেন।

বাইবেলের গল্পটা বলি:
নূহের তিন ছেলে। হ্যাম, শ্যাম আর জাপতেথ।
অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নূহ একদিন বেসামাল হয়ে যান। জামাকাপড় খুলে নিজ তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়েন।
ছেলে হ্যাম এসে বাপকে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুই ভাইকে ডেকে আনে সে।
দুই ভাই মিলে বাপকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। ঢেকে দেবার সময় তাদের মুখ ছিল উলটো দিকে ঘোরানো। যেন বাপের নগ্ন অবস্থা তাদের দেখা না লাগে।
ঘুম থেকে উঠে নূহ পুরো ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি হ্যামকে অভিশাপ দিলেন, হ্যামের বংশধররা যুগ যুগ ধরে অন্য দুই ভাই'র বংশধরদের দাসবৃত্তি করবে।
হ্যামের সন্তান ক্যানান। ক্যানানের বংশধরদের বলা হয় ক্যানানাইট। এই ক্যানানাইটদের পরবর্তীতে ইসরায়েলীরা দাসবৃত্তিতে বাধ্য করেছিল। আর এই ব্যাপারটাকে জাস্টিফাই করেছিল বাইবেলের এই ঘটনা দিয়ে।

পরবর্তীতে এই ব্যাখ্যা ইসরায়েলী ইহুদীদের যতোটা না পারপাস সার্ভ করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পারপাস সার্ভ করেছে ইউরোপীয় শেতাঙ্গদের। তারা যখন জাহাজ বোঝাই করে কালোদের এনে দাস হিসেবে কাজে লাগাতো, তখন চার্চ ফাদারদের মুখ দিয়ে বলাতো যে—এই দুর্মূখ কালোরাই হচ্ছে সেই হ্যামের প্রকৃত বংশধর। আর আমরা হচ্ছি নূহের দুই ভালো ছেলের বংশধর। আর বাইবেলে বলাই আছে, এদের

দাস হিসেবে খাটাতে। কাজেই, দাস ব্যবসা নৈতিক ও ধর্মীয় বৈধতা পেয়ে যায় এখান থেকে।

শেক্সপীয়ারের নাটকেও আমরা এই বর্ণবাদের দেখা পাই। শাদা প্রসপেরো সেখানে কালো ক্যালিবানকে বলছেঃ It wouldn't be such a ghetto if you took the trouble to clean.বোঝাতে চাচ্ছে, কালো মানেই অলস আর নোংরা। এতোটাই নোংরা, যে নিজের শোবার ঘরটা পরিষ্কার করার সময়ও তার হয়ে ওঠে না।

কালোদের সম্পর্কে এটা সমাজের গড়ে ওঠা এক স্টেরিওটাইপ ধারণা। সমাজ এটা মনে রাখে না, তারা যে সুসজ্জিত ইমারতে বসবাস করছে, তার পেছনে আছে নোংরা বসত-বাড়িতে বসবাসরত এই কালোদের শ্রম। পুঁজিবাদ কখনোই চায় না, তার শ্রমিকদের জীবনের কোনরকম মান উন্নয়ন হোক। কালোদের জন্য তাই সে বরাদ্দই করেছে ঐ নোংরা ঘেটো। যেখানে কালোরা দিনরাত পরিশ্রম করে এসে কেবল মরার মত ঘুমোবে। নিজের আবাসকে সুন্দর করার জন্য, স্নিগ্ধ করার জন্য এক মুঠো সময়ও সে পাবে না।

অলস, শ্রমবিমুখ যদি কাউকে বলতেই হয়—তবে ঐ শাদারা। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে যে, সে নিজের ত্রুটি কখনো নিজে দেখতে পায় না। দিনরাত শাদাদের বাড়িঘর আর ক্ষেতখামারে কাজ করা কালোদেরই তাই নোংরা থাকার দায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

এমনকি প্রসপেরো সন্দেহ করেন যে, কালো ক্যালিবান তার মেয়েক ধর্ষণ চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এটাও শ্বেতাঙ্গদের স্টেরিওটাইপ ধারণারই প্রকাশ। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মাত্রেরই ধারণা, কালোরা তাদের সতী-সাধ্বী নারীদের নষ্ট করে দিচ্ছে। ইতিহাস কিন্তু বলে উলটোটাই ঘটেছে বেশি। যতোজন না কালো পুরুষ শ্বেতাঙ্গ নারীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছেন, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কালো নারীদের ইচ্ছেমত ভোগ করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই সমাজে যথেষ্ট ধার্মিক ও অনুসরণীয় হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শেক্সপীয়ারের টার্গেট কনজিউমার ছিলেন শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ। তাই হয়তো তিনি তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই ক্যালিবানকে চিত্রায়িত করেছেন। নোংরা ক্যালিবান। অলস ক্যালিবান। লম্পট ক্যালিবান।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্ণবাদের যে প্রবাহ বইছিল, মহান সাহিত্যিকও তা থেকে ঠিক মুক্ত নন।

বর্ণবাদের শক্তিটা এইখানেই। কখন যে এটা আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে যায়, আমরা টেরও পাই না। আপাত নির্দোষ ভাবনাতেও তখন সে শক্ত ঠাঁই গেড়ে বসে। শত বছরের চেষ্টাতেও সেই শেকড় পুরোপুরি ওপড়ানো যায় না।

পাঁচ কিস্তি দুই

আরবরাই যে বর্বরতার সোল এজেন্ট ছিল---তা নয়। হাঁ, আরবরা কন্যাশিশুর জন্ম হলে তাকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। ঠিক একই কাজ কিন্তু চীনারাও করতো। কম্যুনিস্ট চীনে যখন এক সন্তান নীতি ঘোষণা করা হয়, তখন অনেকেই বংশে বাত্তি জ্বালাবার আশায় সেই কন্যাশিশুটিকে মেরে ফেলতো বা পরিত্যাক্ত করতো।

চীনাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে 'এক সন্তান' নীতিই দায়ী---এমনটা নয়। চীনাদের ইতিহাস সভ্যতাও খুব সুবিধার নয়। প্রাচীন চাইনিজ দলিল ঘাঁটলে চীনাদের তখনকার সাইকোলজিটা বোঝা যায়।

এক রাণীর সন্তান হবে। জ্যোতিষী মহাশয় অনেক গোণাগুনতি করে ঘোষণা দিলেন, অমুক বারে জন্ম নিলে হবে ভাগ্যবান। আর তমুক বারে জন্ম নিলে হিবে মহা ভাগ্যবান।

রাণী অমুক বা তমুক কোন বারেই সন্তান জন্ম দিলেন না। দিলেন আরেক বারে। জ্যোতিষী সন্তানের মুখ দেখে লিখে দিলেনঃ "Not lucky. It was a girl"

এটা যীশুর জন্মের ১২০০ বছর আগের ঘটনা। তারও আগে থেকেই মেয়েদের অশুভ হিসেবে দেখার একটা প্রবণতা চলে আসছে অধিকাংশ সমাজ জুড়েই; বাইবেলে তো মেয়েদের বরাবরই 'সম্পত্তি' হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বাইবেলের দর্শনটাই ছিল এরকম যে, কোন মেয়েকে ধর্ষণ করলে সেটা ভিকটিমের প্রতি কোন অন্যায় নয়। মেয়েটা যার সম্পত্তি, হোক সেটা তার বাপ, ভাই বা অন্য কোন আত্নীয়, তার প্রতি অন্যায়। বাইবেল তাই বলছে, কোন দুষ্টলোক যদি কোন কুমারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে, তবে সেই লোকের কাছ থেকে কিছু গয়নাগাটি নিয়ে মেয়েটিকে সেই লোকের কাছে বিয়ে দিয়ে দাও।

যে বাইবেল চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত আর জানের বদলা জান ঘোষণা করে, সেই কিনা ধর্ষণের বদলা রেখেছে বিয়ে! মজার ব্যাপার হল, বাইবেলের সেই লিগ্যাসী পৃথিবীর অনেক সমাজ এমনকি আমরাও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এখনো বহন করে চলেছি। আর যে মেয়েটা কারো সম্পত্তি নয়, তাকে ধর্ষণ করা তো রীতিমত জায়েজ। অনেকটা রাস্তায় একটা কয়েন কুড়ায়া পাইলাম, পকেটে করে নিয়ে গেলাম। এরকম একটা ব্যাপার।

আর স্বামী যদি স্ত্রীকে ধর্ষণ করতো, সেটা তো কোন অপরাধের পর্যায়েই পড়তো না। আইডিয়াটা ছিল এরকম, স্ত্রীর প্রতি তো স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছেই। বাই ডিফল্ট স্ত্রীর সেক্সুয়ালিটি-ও স্বামীর অধিকারেই পরে। স্বামী স্ত্রীকে ধর্ষণ করা যা, নিজের মানিব্যাগ থেকে নিজে টাকা চুরি করা তাই।

আগেই বলেছি, এই রকম চিন্তাধারা যে কেবল মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ ছিল--তা না। ২০০৬ সালে পৃথিবী জোড়া ৫৩টি দেশে এই 'অপরাধ' এর কোন শাস্তি ছিল না। আধুনিক, মুক্তমনা দেশ যে জার্মানি, তারা তাদের আইনে এই ক্যাটাগরীকে নিয়ে এসেছে সেইতো সেদিন; ১৯৯৭ সালে।

যে এথেন্সকে আমরা প্রাচীন সভ্যতার চূঁড়া ধরি, সেই এথেন্সের নগর রাষ্ট্রেও নাগরিক হিসেবে নারীদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। সক্রেটিস সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে গেছেন, কিন্তু নারীরা কেন নাগরিক নয়, তারা কেন বিচারসভায় জুরির আসনে বসতে পারে না------এই প্রশ্নগুলো করতে বেমালুম ভুলে গেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, নারীর প্রতি এই যে বৈষম্য, দেশ-কাল নির্বিশেষে তাদের ঊন-মানুষ হিসেবে দেখার এই যে প্রবণতা---এটা কি প্রকৃতিরই কোন নিয়ম? নাকি আর দশটা বৈষম্যের মত এটাও মানুষের ইমাজিনড হায়ারার্কির ফসল?

এটা বুঝতে হলে আমাদের কোনটা প্রাকৃতিক আর কোনোটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ---সেটা বুঝতে হবে।

এইখানেও ভেজাল আছে!
আপনি যদি ছেলে হয়ে এক ছেলেকে কিংবা মেয়ে হয়ে আরেক মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন, আপনার আম্মু হয়তো শকে বা শোকে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ন্যাচার আম্মু কিন্তু অজ্ঞান হবে না, সে অনেক কুল; তার কাছে সবই স্বাভাবিক।

আপনি যে মুখ দিয়ে চুমু খান, সে মুখ কিন্তু বেসিক্যালী তৈরি হয়েছিল খাবার খাওয়ার জন্য। খাবার খাওয়াটাই স্বাভাবিক, চুমু খাওয়াটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু হাজার বছরের বিবর্তনে মুখ দিয়ে চুমু খাওয়াটাকে আমাদের কাছে এখন আর অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ মনে হয় না।

মশা-মাছির যেমন এককালে পাখা ছিল না। আকস্মিক মিউটেশনের কারণে পতঙ্গের শরীরে একটা এক্সটেনশন তৈরি হয়। এতে করে তাদের শরীরের ক্ষেত্রফল বেড়ে যাওয়ায় তারা বেশি বেশি করে সূর্যালোক তথা এনার্জি সংগ্রহ করতে পারে। বেশি ক্ষেত্রফলওয়ালা এই পতঙ্গরা খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের চেয়ে এ্যাডভাণ্টেজ পেয়ে যায়; তারপর হঠাৎই একদিন এই এক্সটেনশন দিয়ে তারা গ্র্যাভিটিকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়, অবশ্যই তারা এক লাফে আকাশে ওড়া শিখে যায় না। প্রথমে হয়তো মাটি ছেড়ে এক ধাপ উপরে উঠা শিখে। তার বাচ্চা আরেক ধাপ, তার বাচ্চা আরেক ধাপ। এই করে করে মশা-মাছি আজ আমাদের কানের কাছে এসে গুণগুণ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে।

এখন আপনি যদি সেই মশাকে ডেকে বলেন, এই ব্যাটা। তোর পূর্বপুরুষ তো উড়তে পারতো না। তুই প্রকৃতির নিয়ম ভেঙে আমার কানের কাছে ওড়াওড়ি করছিস কেন? মশা সুন্দর করে আপনার কানের নিচে ঠাটিয়ে দুটো চুমু দিয়ে বিদায় নিবে।

কাজেই, ন্যাচারাল বা আনন্যাচারাল বলে আসলে কিছু নেই। সবই আমাদের ডিফাইন করে দেয়া কতগুলো ফ্রেম বা কাঠামো। প্রকৃতিই নারীদের এমন করে তৈরি করেছে---এই ধারণারও তাই কোন ভিত্তি নেই। প্রকৃতি আমাদের চয়েস দেয় কেবল, সেখান থেকে যে যার মত অপশন বেছে নেয়।

ইতিহাস জুড়ে নারীদের তবে এই দুর্দশা কেন? এই নিয়ে আলাপ করবো একটু পরেই।

পাঁচ কিস্তি শেষ

শারীরিক দুর্বলতার কারণেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে আছে---এটা আসলে ছোটবেলার পরীক্ষার খাতার ১ নং প্রশ্নের মুখস্থ উত্তর হয়ে যায়। সেটাই যদি হত, তবে ষাট বছরের বুড়োরা তিরিশ বছরের ছুড়োদের উপর ছড়ি ঘোরাতো না। কিংবা তুলনামূলক দুর্বল শাদারাও শক্তিশালী কালোদের শত শত বছর ধরে পায়ে শিকল পরিয়ে রাবার বাগানে কাজ করতে বাধ্য করতে পারতো না।
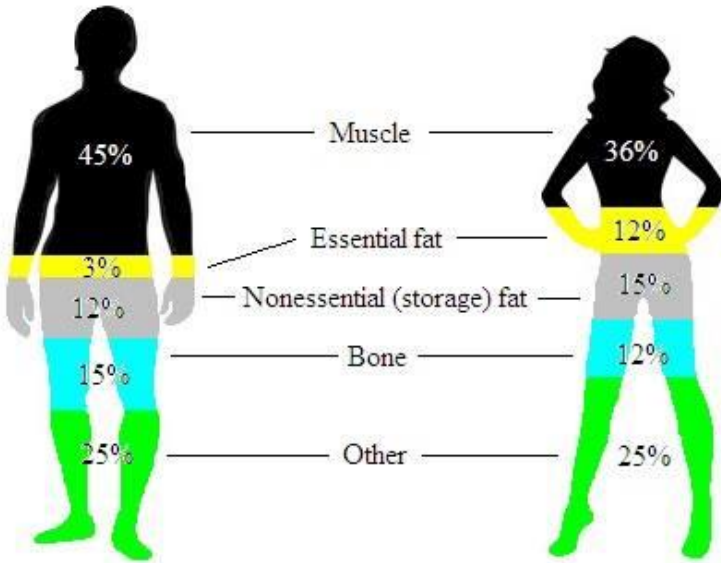
হাঁ, অন এভারেজ, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে শক্ত---এটা ঠিক। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি, প্রতিটা পুরুষই যে প্রতিটা নারীর চেয়ে শক্তিশালী--তা কিন্তু নয়। তার চেয়েও বড় কথা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অসুখ-বিসুখে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি রেজিস্টান্ট।

একটা ছোট্ট সার্ভে করেন। মনে করে দেখেন তো, আপনার বাবা সারা জীবনে কয়বার অসুখে পড়েছেন আর আপনার মা ক'বার পড়েছেন? তাহলেই বুঝবেন মেয়েদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কতো বেশি।

এজন্যই হয়তো যুগে যুগে আরামের যতো কাজ আছে, যেখানে শারীরিক পরিশ্রমের বালাই নাই, সেইগুলা সব ছেলেরাই করসে। যতো রকমের গুটিবাজি আছে, রাজনীতি, আইন প্রণয়ন কিংবা রাজ-রাজড়ার স্তুতি গেয়ে সাহিত্য রচনা---সবগুলাতেই মেয়েদের এ্যাক্সেস এক রকম বন্ধ করে রাখা হইসে। মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেয়া হইসে ফসলের কাজ, ঘরদোরের কাজ আর বাচ্চা মানুষ করার কাজ। সবগুলাতেই যেখানে প্রচণ্ড শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয়। কাজেই, মেয়েরা শারীরিকভাবে দুর্বল---এই দাবি আসলে কোন ধোপেই টেকে না।

ইতিহাস বরং আমাদের এই সূত্রই দেয় যে, শারীরিক ক্ষমতা আর সামাজিক ক্ষমতা পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক। মাফিয়া গ্রুপগুলোতে প্রায়ই দেখবেন, ছোটোখাট এক লোক হয়তো ডন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে বসে আছে। যাকে হয়তো কানের নিচে একটা দিয়েই শোয়ায়ে দেয়া যায়। কিন্তু যার মাথায় ঘুণাক্ষরেও এই চিন্তা আসবে, সে হয়তো এই মহৎ কাজ করার জন্য পৃথিবীর বুকে বেশিদিন বেঁচেও থাকবে না। জিয়াউর রহমান কিংবা মইন ইউ আহমেদ যেমন তাদের সময়ে আর্মির সবচেয়ে লম্বাচওড়া লোক ছিলেন না!

শারীরিক সামর্থ্যই যদি সব কিছু হত, তাহলে এতোদিনে বাঘ-সিংহ বা টি-রেক্স আমাদের খেয়ে হয় নির্বংশ করে ছাড়তো নয় গুহার তলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করতো। সেটা যেহেতু হয়নি, তারে মানে বুঝতে হবে, শারীরিক সামর্থ নয়, অন্য কিছু এখানে কী রোল প্লে করছে।

সেই অন্য কিছুটা কী?

অনেকে বলেন, সেই অন্য কিছুটা হচ্ছে পুরুষের এ্যাগ্রেসিভ মনোভাব। হাজার-লক্ষ বছরের বিবর্তন পুরুষকে হিংস্র করে গড়ে তুলেছে। তার মানে এই না যে, লোভ, পাপ, হিংসা---এইসব ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে আছে। কিন্তু যখনই শারীরিক ভায়োলেন্সের প্রয়োজন হয়েছে, ছেলেরা তাদের আগেপিছে চিন্তা না করে এগিয়ে গেছে। আর এটাই তাদের লং রানে এগিয়ে দিয়েছে।

যখনই কোথাও যুদ্ধ হয়েছে, আর্মড ফোর্সের দায়িত্বে ছিলে পুরুষ। যুদ্ধ শেষে শান্তিকালীন সময়ের ভারও তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাঁধে চলে এসেছে। নিজেদের অথরিটি প্রতিষ্ঠায় এরা আবার যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছে। যতো যুদ্ধ হয়েছে, পুরুষের স্কিল ততো বেড়েছে। সেই সাথে সমাজের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ।

তার মানে কি এই যে, যে বেশি এ্যাগ্রেসিভ, তার হাতেই সমাজের চাবি উঠে আসবে? তাহলে রোমান সাম্রাজ্যের চাবি অভিজাতদের হাতে থাকতো না। থাকতো ম্যাক্সিমাসদের মত সৈনিকদের হাতে। ব্রিটিশ সৈন্যদলের নেতা কোন ডিউক অফ ওয়েলিংটন হতেন না। হত আইরিশ ক্যাথলিক ঘরে জন্ম নেয়া কোন সাধারণ সৈন্য। আফ্রিকান সাম্রাজ্যের অধিপতি ঠাণ্ডা মাথার কোন ফ্রেঞ্চ অভিজাত হত না। হত অনেক বেশি এ্যাগ্রেসিভ, হয়তো মাঠের লড়াইয়েও অনেক বেশি স্কিলড কোন আলজেরীয় বা সেনেগালিজ।

লোকে বলে, মেয়েদের শরীরে টেস্টোস্টেরণ কম; তাই তারা ভালো আর্মি, জেনারেল বা পলিটিশিয়ান হতে পারে না। কিন্তু যুগে যুগে আমরা দেখেছি, যুদ্ধ জয়ে টেস্টোস্টেরণ লাগে না। যুদ্ধ কোন টেস্টোস্টেরণের খেলা না। যুদ্ধ অনেক কমপ্লেক্স একটা প্রজেক্ট যেখানে আপনাকে ভয়াবহ রকমের অর্গানাইজড হতে হবে, স্ট্রাকচারড হতে হবে। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকতে হবে, পারলে নতুন নতুন বন্ধু জোটাতে হবে। শত্রুপক্ষের মনের ভেতর কী খেলা চলছে, সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে।

এ্যাগ্রেসিভ কারো চেয়ে ম্যানিপুলেটিভ কারোরই এই খেলায় জেতার সম্ভাবনা বেশি। আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট আর জুলিয়াস সীজার তাই যা করে দেখাতে পারেননি, তাই করে দেখিয়েছেন সম্রাট অগাস্টাস। তিনি এদের মত ভালো জেনারেল ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন মাস্টার অফ ম্যানিপুলেশন। তার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব তাই ছিল এদের চেয়ে অনেক বেশি।

মেয়েরা কিন্তু গড়ের উপর ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যানিপুলেটিভ। শত্রুপক্ষের মনের খবরাখবর এরা ভালো রাখে। এই সূত্র অনুযায়ী সাম্রাজ্য তো তবে মেয়েদের হাতেই তৈরি হওয়া উচিত ছিল। মেয়েরা আদেশ দেবে আর পুরুষ সৈন্যরা সেই আদেশ পালন করবে। অনেকটা মৌমাছি সমাজের মত। বাস্তবে সেটা হয়নি যদিও। কেন---সেটা একটা রহস্য।

আরেকটা থিওরি বলে, নারীজাতির সারভাইভাল স্ট্রাটেজিই এদের পুরুষের চেয়ে দুর্বল করে বিকশিত করেছে।

একটা মেয়ের জন্য তার সাথে সেক্স করতে ইচ্ছুক---এমন গোটা দশেক ছেলে পাওয়া কোন সমস্যাই না; কিন্তু একটা ছেলের জন্য এটা মহা সমস্যা! একে তো তার মেয়েটাকে কনভিন্স করতে হয়েছে, তার উপর পছন্দের মেয়েটাকে অন্য কোন ছেলে যেন জোর করে নিয়ে না যায়, সেজন্য তাকে স্বজাতির বিরুদ্ধে বহুৎ লড়তে হয়েছে। লোহায় যতো ঘষা দিবেন, তার ধার ততো বাড়বে। ফলে, বাঁটে পড়ে হলেও, পুরুষের ধার ও ভার---দুটোই বেড়েছে। তার জিনগুলোও দিন দিন আরো এ্যাগ্রেসিভ হয়েছে, হয়েছে আরো কম্পিটিটিভ। আর মেয়েটা যেহেতু না চাইতেই অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে, তার জিনেও তার প্রভাব পড়ছে। তার জিন হয়ে উঠছে আরো প্যাসিভ, আরো সাবমিসিভ।

গর্ভাবস্থা একটা বিরাট ফ্যাক্টর এইখানে। একটা মেয়ের পেটে যখন বাচ্চা থাকে, সেই নয় মাস সে ফলমূল খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোথাও যেতে পারতো না। এই কঠিন সময়টা সে একজন পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই পুরুষের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখাটাও, যাকে আমরা ভালবাসার সম্পর্ক বলি---এই স্ট্রাটেজিরই ফলাফল। শুধু ঐ নয় মাস নয়, বাচ্চা হবার পর প্রথম দু-তিন বছরও সে ঐ বাচ্চার দেখভালের পেছনে কাটিয়ে দেয়। এই সময়টা তার ও তার বাচ্চার ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পড়ে তার পছন্দের পুরুষটির উপর। ফলাফল, সেই নারীর উপর পুরুষটির আধিপত্য।

এই থিওরিও ফুলপ্রুফ কিছু না। হাতি আর বোনোবো সমাজেও তো মেয়েদের প্রেগন্যান্ট অবস্থায় অন্যের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা অন্য পুরুষের সাহায্য না নিয়ে তাদের বান্ধবীদের সাহায্য নেয়। ফলে সমাজে ডমিন্যান্সের জন্য যে সোশ্যাল কানেকশানের প্রয়োজন হয়, সেটা মেয়েদের মধ্যে ডেভেলপ করেছে বেশি। হাতি আর বোনোবো সমাজ তাই মাতৃতান্ত্রিক। পুরুষেরা এখানে নিজেরা নিজেরা মারামারি করে জীবন পার করে দেয়। পুরুষ বোনোবো তো স্ত্রী বোনোবোদের এলাকায় ট্রেসপাস করতে গেলে গণধোলাই খাওয়ার রেকর্ডও আছে।

মানুষের ক্ষেত্রে কি ঠিক সেইম ঘটনাটা ঘটতে পারতো না? কিছু ট্রাইবাল গোষ্ঠীতে যে এমনটা হয় না---তা না। কিন্তু ব্যতিক্রমকে তো আর উদাহরণ বলা যাবে না।

বোঝা গেল, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কোন কারণই নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি তবে পুরুষের তৈরি মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়? তাই যদি হয়, তবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দিকে দিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই জয়জয়কার কেন?

অধ্যায় ছয় কিস্তি শূন্য

এইটা কোথা থেকে আসছে জানি না---কিন্তু আমাদের মধ্যে "আমরা ভার্সেস তোমরা" বলে একটা ব্যাপার আছে। এইটা জর্জ বুশ আমাদের মধ্যে ইনজেকশন দিয়া পুশ করে নাই, সুপ্রাচীন কাল থেকেই এটা আমাদের মধ্যে আছে।

আমরা নিজেদের সেইভাবেই ডিফাইন করি---যেটা আমরা না। স্যামুয়েল হান্টিংটন একটা চমৎকার উদাহরণ দিসেন। একজন কর্মজীবী নারী যখন তার দশজন গৃহিনী বান্ধবীর সাথে গল্প করেন, তখন তার মাথায় থাকে যে এই গ্রুপে তিনিই একমাত্র কর্মজীবী। সেই নারীই যখন অফিসে তার পুরুষ কলিগদের সাথে মিটিং করেন, তখন কিন্তু তার মাথায় থাকে না যে তিনি একই কোম্পানিতে একই পোস্টে জব করেন। তিনি যে একজন নারী---এই পরিচয়টাই প্রধান হয়ে ওঠে তখন।

চাইলে এরকম হাজারটা উদাহরণ দেয়া যাবে। চিটাগাং কলেজের যে ছেলেটা ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসে, তার নন-চিটাগাং বন্ধুদের সামনে হয়তো সে গর্বভরে বলে 'আঁরা চিটাগাংইয়া। আঁরাই বেস্ট'। সেই ছেলেটাই যখন বৈদেশ পড়াশোনা করতে যায়, তখন তার সুর পালটে হয়ঃ "আঁরা বাংলাদেশী; আঁরাই বেস্ট"।

এইভাবেই মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাই-বেরাদরসশিপ তৈরি করে। নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তৈরি করে। আর এটা করতে গিয়েই আরেকদল মানুষকে সে অনায়াসে 'তোমরার' দলে ফেলে দেয়। প্রতিটা সভ্যতাই তাই গর্বভরে অন্য সভ্যতার মানুষদের বর্বর ঘোষণা করেছে। মিশরের ফারাওরা অ-মিশরীয় মাত্রকেই বর্বর ভাবতো। রোমানরা ভাবতো অ-রোমানদের। খালি গায়ে ঘোরাফেরা করে বলে ভারতীয়দের

বর্বর ভাবতো ব্রিটিশরা। স্বামী-স্ত্রী প্রকাশ্যে চুমু খায় বলে আবার ব্রিটিশ সভ্যতাকে বর্বর ভাবতো ভারতীয়রা।

তবে এই "আমরা বনাম তোমরা" দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেও আমাদের মধ্যে কিছু কমন ব্যাপারে বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। প্রথম বিশ্বাসটা আসছে টাকায়। তারপর পলিটিক্যাল সিস্টেমে; আমাদের কাউকে না কাউকে দরকার আমাদের শাসন করার জন্য, সর্বশেষ আসছে ধর্ম।

ব্যবসায়ী, রাজ-রাজড়া আর ধর্মপ্রচারকরা তাই এই দুনিয়া সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ এলিমেন্ট। গুরুত্বপূর্ণ যদি নাও মানেন, এটা মানতে হবে---এই তিন দল হল সমাজ পরিবর্তনের মূল ফোর্স। আমরা বনাম তোমরা'র যে বাইনারীতে আমরা সাধারণ মানুষ আটকে থাকি, এরা আমাদের সেই বাইনারী থেকে বের করে নিয়ে আসে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক, শ্রমিক---বাদবাকি সবার দরকার সমাজকে ফাংশনাল রাখার জন্য। সমাজ বদলে এরা কোন ভাইটাল ফোর্স না। সমাজে যে র‍্যাডিকাল পরিবর্তনগুলো আসে, তা ঐ বণিক, রাজা আর পয়গম্বরের হাত দিয়েই আসে।

একজন ব্যবসায়ীর কাছে যেমন গোটা দুনিয়াটাই একটা বাজার। আর সব মানুষ তার পটেনশিয়াল কাস্টোমার। কোন ব্যবসায়ীকে এইজন্য দেখবেন না তার ব্যবসা নিয়া সন্তুষ্ট থাকতে। দেখা হলেই বলবে, ভাই, আগের মত আর ব্যবসাপাত্তি নাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সে তার ব্যবসা বাড়িয়েই চলেছে। ওষুধ থেকে জুতা, জুতা থেকে কসমেটিক্স, কসমেটিক্স থেকে রিয়েল এস্টেট। একই কথা খাটে রাজ-রাজড়াদের জন্যও। গোটা দুনিয়াটাই তার টেন্ট্যাটিভ সাম্রাজ্য। আর দুনিয়ার মানুষ তার পটেনশিয়াল প্রজা। এদিকে ধর্মপ্রচারক মনে করেন, দুনিয়া জুড়ে কেবল একটা সত্যই থাকবে। সবাই দল বেঁধে এই সত্যের অনুসারী হবে।

এই যে গ্লোবাল ভিশন, দুনিয়ার সব মানুষকে এক ফিলোসফির শামিয়ানায় আনার যে চেষ্টা--তাতে কিন্তু দিন শেষে জয়ী হয় টাকাই। পলিটিক্যাল সিস্টেম নিয়া মানুষের মধ্যে মতবিরোধ আছে। গণতন্ত্রই বেস্ট কিনা---এই নিয়া মানুষের মনে এখনো সন্দেহ আছে। অনেককেই বলতে শুনবেন, এর চেয়ে আর্মি ভালো ছিল। কিংবা আগের দিনের জমিদাররাই ভালো ছিল। কিংবা এরশাদের একনায়কতন্ত্রই ভালো ছিল।

ধর্ম নিয়া তো কথাই নাই। আমার গডে হয়তো আপনি বিশ্বাস করেন না। কিংবা আপনার গডে আমি বিশ্বাস করি না, টাকার গডে কিন্তু আমরা সবাই বিশ্বাস করি। আমেরিকান টাকার উপর লেখা থাকেঃ "In God We Trust". এই গড অবশ্যই খ্রিস্টান গড। যে লোকটা টিপিক্যাল গডে বিশ্বাস করে না কিংবা ভিন্ন গডে বিশ্বাস করে, সেও কিন্তু এই টাকা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে। টাকার উপর গডের কথা লেখা আছে দেখে সে ভারতীয় পণ্য বর্জনের মত এই টাকাও বর্জন করে না। কিংবা আমেরিকান সরকারের কাছে পিটিশনও দাখিল করে না যে; তোমার টাকার উপর গডের কথা লেখা আছে, তোমার টাকা আমি আর ইউজ করবো না।

এই একটা স্রোতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এক হয়ে মিশে যায়। টাকাকে আমি-আপনি যতোই গালি দিই না কেন, দুনিয়ার মানুষকে কেউ যদি এক করতে পারে, তবে এই টাকাই।

আমেরিকা ছিল লাদেনের এক নম্বর শত্রু। আমেরিকান কৃষ্টি-কালচার, পলিটিক্স---সব কিছুতেই তার ছিল ভয়ানক বিতৃষ্ণা। সেই লাদেনও কিন্তু আমেরিকান ডলারকে প্রিয়তমার মতোই বুকে আগলে রাখতো!

ছয় কিস্তি এক

আমাদের শিকারী পূর্বপুরুষদের মধ্যে টাকা-পয়সার কোন ধারণা ছিল না। এরা দল বেঁধে শিকার করতে যেতো। যা পেতো, তাই ভাগাভাগি করে খেতো। কেউ হয়তো শিকারে বেশি দক্ষ। তাই বলে যে মাংসের ভাগটা বেশি পেত---তা না। যে লোকটা শিকার ভালো জানে না, কিন্তু গাছগাছড়ার রস দিয়ে ক্ষত সারাতে পারে, তাকেও সে সমান ভাগই দিত। এইভাবে একটা অঘোষিত বিনিময় প্রথা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে।

কৃষিভিত্তিক সমাজও কমবেশি একইরকম ছিল। বনেজঙ্গলে ঘোরা মানুষগুলো একটা নির্দিষ্ট গ্রামে এসে থিতু হল। এদের মধ্যেই কেউ ছিল ক্ষত সারানোয় ওস্তাদ, কেউ কাপড় বোনায়, কেউ বা হাতুড়-বাটাল দিয়ে মিস্তিরিগিরিতে। আমরা যাকে বলি 'স্বনির্ভর অর্থনীতি'--ঠিক সেইটা ছিল তাদের। বাইরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা লাগতোই না বলা যায়। ফুলটাইম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা দর্জির তাই তখনো প্রয়োজন হয় নাই।

নগর ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা এসে সব কিছু ওলট পালট করে দেয়। শহর মানেই কুটি কুটি লোক। যাদের কেউ কাউকে চেনে না। কাজেই, আমার প্রতিবেশী, যে কিনা দাবি করে সে গাছগাছড়ার রস দিয়ে এক চুটকিতে আমার ক্ষত সারায়ে দিতে পারবে---তার এই দাবির সত্যমিথ্যা আমি জানি না। এই অবিশ্বাস থেকে জন্ম হল স্পেশালাইজেশনের। জন্ম নিল স্পেশালাইজড ডাক্তার, মিস্তিরি আর দর্জি।

স্পেশালাইজেশনের প্রভাব পড়লো গ্রামেও। একটা গ্রামে হয়তো পুইঁশাকের ফলন ভালো হয়। শহরের লোকে ভাবলো, কী দরকার কষ্ট করে বাড়ির পেছনে পুঁইশাক ফলানোর? এর চেয়ে ঐ গ্রাম থেকে কিনলেই তো হয়। ধীরে ধীরে এই গ্রামের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অন্য গ্রামগুলোও বসে রইলো না। যে ফসলটা তারা অতো ভালো ফলায় না, সেই ফসল তারা ফলানোই ছেড়ে দিল। সমস্ত মনোযোগ দিল যেই ফসল ভালো ফলে, তার উপর। এইভাবে আরেকটা গ্রাম হয়তো টমেটোর দিক দিয়ে, আরেকটা গ্রাম আলুর দিক দিয়ে নিজেকে স্পেশালাইজ করে নিল।

স্পেশালাইজেশনের ফলে কনজ্যুমার হিসেবে শহরের মানুষের সুবিধা হল। কিন্তু ওভারঅল অর্থনীতি হয়ে পড়লো জটিল। আর অর্থনীতি যতো কমপ্লেক্স হয়, বিনিময় প্রথা ততো অকার্যকর হতে থাকে। আগে গ্রামে থাকতে পাশের বাড়ির বৌদির কাছ থেকে কলাটা-মূলাটা আনা যেত। জানা কথা যে, সেও একদিন তার কাছ থেকে মাছের কুটোটা বিনিময়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু শহরে তো এই সুবিধা নাই। যে ধনঞ্জয় আমার ধরা ইলিশ মাছের বিনিময় কাল দেবে বলে নিয়ে গেলো, কাল কেন--- সারা জীবনেও তার সাথে আমার আর দেখা নাও হতে পারে।

বিনিময় প্রথার অসুবিধা বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিই।

ধরা যাক, আপনার আমের বিরাট বাগান। সেইখানে ল্যাংড়া, ফজলি, মোহনভোগ--- নানা স্বাদের আম ফলে। একদিন আপনার জুতা গেছে ছিঁড়ে। আপনার প্রতিবেশীর

কাছে আপনি শুনলেন, নদীর ঐপারে বাজারে এক মুচি আছে। তাকে দিয়া সে জুতা ঠিক করাইসিলো। আজ পাঁচ বছর হইসে, সেই জুতার কিচ্ছু হয় নাই। তো আপনি নাচতে নাচতে মুচি ভদ্রলোকের কাছে গেলেন। আশা, কয়টা আমের বিনিময়ে তার জুতা ঠিক করায়ে নিবে।

মুচি বেচারা পড়লো বিপদে। গত সপ্তাহেই সে তিনটা ফজলি আমের বিনিময়ে একজনের জুতা ঠিক করে দিসিলো। তিনটা নাকি চারটা? তার এখন ঠিক মনে পড়তেসে না। প্রতিদিন তো সে কতো কিছুর বিনিময়ে কতোজনের জুতাই ঠিক করে দেয়। ধান, গম, মাংস, কাপড়-চোপড়---দ্যা লিস্ট গোজ অন। এতো কিছুর ভীড়ে আমের হিসাব মাথায় থাকে নাকি?

ধরা যাক, তিনটাই আম। এইখানেও সমস্যা। তিনটা আমের বিনিময়ে সে এক কিশোরীর জুতা ঠিক করে দিসিলো। আর এটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের বুট। এর জন্যও কি তিনটা আম চাওয়া ঠিক হবে? কয়টা চাইলে সে ঠকবে না? বেশি আম না হয় নিল। বেশি আম নিয়ে সে করবেটা কী? বাসায় খালি সে আর তার বউ। ফ্রীজও নাই যে আম প্রিজার্ভ করে রাখবে। বেশি নিলে শুধু শুধু এটা পচবে।

আরেকটা কনসার্ন আছে তার। অতি সম্প্রতি দেশে একটা ছোঁয়াচে রোগের আমদানি হইসে। কাতারে কাতের গরু-ছাগল সেই রোগে আক্রান্ত হইতেসে। কাজেই, চামড়ার সাপ্লাই গেছে কমে। আগে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে সে যতোটুকু চামড়া পাইতো, এখন তার অর্ধেক পায়। এই ব্যাপারটাও তো কনসিডার করতে হবে।

এতো কিছু বিবেচনায় আনতে গিয়ে তার মাথামোথা গরম হয়ে গেল। নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সে আপনাকে 'ভাংতি নাই' বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। এই সমস্যা যে খালি ঐ মুচি ভদ্রলোকই ফেস করছে---তা না। গোটা বাজারে যদি ১০০টা পণ্যের ১০০ জন বিক্রেতা থাকে, তবে তাদের মধ্যে ৪৯৫০ রকম এক্সচেঞ্জ রেট থাকবে।

পণ্যের সংখ্যা বেড়ে যদি ১০০০ হয়, তবে এই এক্সচেঞ্জ রেটের সংখ্যা হবে ৪৯৯৫০০। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে এই রেট মনে রাখা সম্ভব না।

অবস্থা আরো খারাপ হইতে পারে যদি মুচি ভদ্রলোক বা তার স্ত্রী---কারোরই আমের প্রতি ভালোলাগা না থাকে। হয়তো দু'জনের মধ্যে বেশ খটাখটি চলছে এখন। মুচি ভদ্রলোকের এখন আম দরকার না, দরকার একজন ডিভোর্স লইয়ার। এক্ষেত্রে যেটা হতে পারে---আপনি এক ডিভোর্স লইয়ারকে খুঁজে বের করবেন, যার কিনা আম পছন্দ; আপনার আমের বিনিময়ে সে মুচির ডিভোর্স করায়ে দিবে। মুচি তার বিনিময় দিবে আপনার জুতা ঠিক করে। ডিরেক্ট বিনিময় না হয়ে এটা হল ইনডিরেক্ট বিনিময়। তিনধারী লেনদেন। কিন্তু আপনি যে ঐদিনই একজন আমখোর ডিভোর্স লইয়ার খুঁজে পাবেন--তার গ্যারান্টি কী?

সুতরাং, এইভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। কিছু সমাজ একটু অন্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করসিলো। তারা স্পেশালিস্টদের কাছ থেকে সমস্ত রকম পণ্য আর সার্ভিস কিনে রাখতো। তারপর যার যেটা দরকার, তাকে তার উৎপাদিত পণ্য বা সার্ভিসের বিনিময়ে সেটা দিয়ে দিত। এর সমস্যা হল এই যে, সেন্ট্রালি কালেক্ট করলে আপনি কখনোই ভালো দাম পাবেন না। ভালো দাম না পেলে

আপনার মধ্যে কাজ করার বা ভালো জিনিস বানানোর আর উৎসাহ থাকবে না। আপনি চাইবেন, মিনিমাম স্পেসিফিকেশনটুকু মিটায়া কোনমতে পণ্য বা সার্ভিস সাপ্লাই দিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেটা হইসিলো।

সমস্যার সমাধান করার জন্য দরকার একটা কমন জিনিস যেটা দিয়ে সবকিছু বিনিময় করা যাবে। সব শ্রেণির এক্সপার্টকে কানেক্ট করার জন্য একটা কমন গ্রাউন্ডের প্রয়োজন হল। আর সেই কমন গ্রাউন্ড তৈরি করলো টাকা। কীভাবে? সেইটা না হয় একটু পরেই বলি!

ছয় কিস্তি দুই

ছোটবেলায় একটা ব্যাপার নিয়ে আমি বেশ টেনশনে পড়ে গেছিলাম।

আমার আব্বু প্রতিদিন অফিস যেতো টাকা আনতে। কিন্তু অফিসের লোকজন তো খারাপ। এরা আব্বুকে প্রতিদিন টাকা দিতো না। মাসের শুরুতে কোন একদিন হয়তো কিছু টাকা আনতে দিত।

টাকার অভাবে আমরা যখন যা খুশি---তাই কিনতে পারতাম না। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হত। টাকা যে কেউ ছাপায়--এই ধারণা আমার ছিল। আব্বুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সরকার এই টাকা ছাপায়। তখন আমার মনে আইডিয়া এলো, সরকারই যদি টাকা ছাপায়, তাইলে তো সে বেশি বেশি করে টাকা ছাপালেই পারে। তাইলেই তো আর কারো ঘরে কোন অভাব-অনটন থাকবে না!

যে ভুলটা আমি করেছিলাম, সেই একই ভুলটা করেছিল মধ্যযুগে স্পানিশরা। এরা আমেরিকা এসে পিনিকগ্রস্তের মত স্বর্ণ লুটেপুটে নিয়ে গিয়েছিল। এদের এই পিনিক দেখে মেক্সিকোর তৎকালীন অধিবাসী এ্যাজটেকরা খুব অবাক হয়েছিল।

এমন না যে এ্যাজটেকরা কখনো সোনা ব্যবহার করেনি। তারাও এটা দিয়ে গহনা বানাতো, মূর্তি বানাতো। ব্যস, এইটুকুই। সোনা খাওয়া যায় না, পরা যায় না, পান করা যায় না। মোটামুটি আকামের একটা জিনিস। এই আকাইম্যা জিনিস নিয়া ইউরপিয়িদের এতো পিনিক কেনো? এ্যাজটেকরা ইউরোপীয়দের নেতা হার্নান কোর্তেকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলঃ সোনা নিয়া তোমাদের এতো পাগলামো কেনো? কোর্তের উত্তরটা ছিল চমৎকারঃ "I and my companions suffer from a disease of the heart which can be cured only with gold।"

রহস্যটা হচ্ছে এই যে, স্প্যানিশরা স্বর্ণকে বিনিময়ের কমন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। তাই তারা ভেবেছিল, যতো বেশি স্বর্ণ হবে তাদের, ততো তারা বড়লোক হয়ে যাবে। কিন্তু স্বর্ণ তো আসলে টাকা না। ইন ফ্যাক্ট, 'টাকা'-ও কোন টাকা না। টাকা তাই---যার বিনিময়ে আরেকজন আমাকে কিছু দিবে। সেটা স্বর্ণমুদ্রা না হয়ে কাদামাটিও হতে পারে। দেশের সমস্ত মানুষ যদি এই কাদামাটির বরকতে বিশ্বাস আনে, তবে বিয়েতে হয়তো স্বর্ণ নয়, কাদামাটির ওজন নিয়ে মুরুব্বিদের মধ্যে বাহাস হবে!

বুঝতেই পারছেন, কিছুদিনের মধ্যেই স্পেন দেশে স্বর্ণের ইনফ্লেশন হয়। আগে যে স্বর্ণ দিয়ে পাঁচ কেজি গম কেনা যেত, আজ তা দিয়ে এক কেজিও কেনা যায় না। স্বর্ণ বেড়েছে, সমাজে সম্পদের পরিমাণ তো আর বাড়েনি। আর এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই বাংলাদেশ সরকার স্রেফ একটা অবুঝ শিশুকে খুশি করার জন্য ইচ্ছেমত টাকা ছাপাতো না।

স্বর্ণমুদ্রা আসার আগেও নানাভাবে টাকার প্রচলন ছিল। কখনো শস্যের দানা, কখনো গরু-ছাগলের চামড়া, কখনো বা লবণকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হত। অনেকে বলেন, ইংরেজি Salt শব্দটা থেকেই Salary শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের বেতন হিসেবে যে লবণ দেয়া হত। সুবে বাংলাতেও যে স্যালারি হিসেবে লবণ দেয়া হত না---তাই বা কে বলতে পারে? 'নুন খাই যার, গুণ গাই তার'---কথাটা তো আর আকাশ থেকে এসে পড়েনি!

প্রিজন ব্রেক মুভিগুলোতে দেখবেন, সিগারেটকে এখানে টাকা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার কাছে যতো বেশি সিগারেট, জেলখানার সে ততো বড় হেডম। এমনকি যারা স্মোক করে না, তাদেরও জেলখানায় এই সিগারেট দিয়েই সব কিছু বিনিময় করে। এক প্যাকেট পাউরুটির দাম হয়তো দুইটা সিগারেট, একটা চলনসই ঘড়ি দশটা সিগারেট, এক বোতল বিদেশী মদ বিশটা সিগারেট।

আমরা অবশ্য টাকা বলতে বুঝি ব্যাংকনোটরূপী টাকা। যদিও দুনিয়ার সমস্ত টাকার একটা খুব ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে আছে এই ব্যাংকনোট। আজকের দুনিয়ায় টাকা আছে প্রায় ৬০ ট্রিলিয়নের মত। তার মধ্যে ব্যাংকনোট আর কয়েন রূপে আছে মাত্র ৬ ট্রিলিয়ন। পুরো টাকার মাত্র ১০%। বাকি টাকাটা আছে আমাদের কম্পিউটার সার্ভারগুলোতে। আমাদের দৈনন্দিন কেনাকাটা, বিদ্যুৎ বিল, মোবাইল বিল---সবই আজকাল ইলেকট্রনিক হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ক্রিমিনাল ছাড়া আজকাল আর কেউ স্যুটকেস ভর্তি টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না!

ইলেকট্রনিক ফর্মেই হোক আর ব্যাংকনোট রূপেই হোক, কোন কিছু টাকা হতে হলে সবার আগে যেটা লাগবে---সেটা হল কনভার্টিবিলিটি। রূপান্তরযোগ্যতা। আমি বাদাম বিক্রি করে আপনার কাছ থেকে সার্কিটের ডিজাইন শিখি না। কারন, সেটা আমার কোন কাজে লাগবে না। আমি নিই টাকা। কেননা এই টাকা দিয়ে আমি আবার মুদি দোকানীর কাছ থেকে তেল কিনতে পারবো। টাকা এইভাবে এক পণ্যকে আরেক

পণ্যে কনভার্ট করে দিচ্ছে। আপনি হয়তো ঘূষ খাচ্ছেন। সেই ঘূষের টাকায় দানখয়রাত করে মানুষের দোয়া কিনে নিচ্ছেন। একজনের সার্ভিস এখানে আরেকজনের দোয়ায় কনভার্ট হচ্ছে।

খালি কনভার্টিবল হলেই হবে না। এর আরো দুটো গুণ থাকা লাগবে। এক, একে সহজে স্টোর করা যাবে। আর দুই, একে সহজে ট্রান্সপোর্ট করা যাবে। শস্যকে টাকা হিসেবে ব্যবহার করলে দুটো সমস্যাই হয়। একে তো একে স্টোর করলে হয় ইঁদুরে খেয়ে ফেলবে নয়তো গুদামে আগুন লেগে যাবে। আর এটা সহজে পরিবহণযোগ্যও না। ধরা যাক, আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন। এখন বাড়ি বিক্রির বিনিময় হিসেবে কি কয়েক মণ ধান বা লবণ নিয়ে দুই ক্রোশ পথ পাড়ি দবেন? পেইনটা একটু বেশিই হয়ে গেলো না?

কয়েন আর নোটরূপী টাকা এসে এই সব সমস্যার সমাধান করেছে। নিজের কাছে রাখতে ভয় পাচ্ছেন? ওকে; বাড়ির কাছে ব্যাঙ্কে গিয়ে রেখে আসেন। টাকা নিয়ে দুই ক্রোশ দূরে যাওয়া দরকার? আপনাকে গরুর গাড়ি বোঝাই করে টাকা নেয়া লাগবে না। লুংগির গিঁটে বেঁধে নিলেই চলবে।

গুণীজনেরা তাই টাকাকে সকল সমস্যার মূল বললেও টাকাই আবার সকল সমস্যার সমাধানও!

ছয় কিস্তি শেষ

আগেই বলেছিলাম, মানুষের গল্প করতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের বার বার ফিরে আসতেই হবে। এখন যেমন আমরা আছি সুমেরীয়ানদের সাথে সুমেরে। আজকের ইরাকের দক্ষিণ প্রান্তে।

টাকার গল্পটাও এইখান থেকেই শুরু। যীশুর জন্মেরও তিন হাজার বছর আগে এখানেই প্রথম বার্লির দানাকে টাকা হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়।

এই দানা দিয়েই সমস্ত কিছু কেনাবেচা করা হত। বার্লির দানা ঠিকঠাক ওজন করা জন্য প্রায় এক লিটারের একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড বাটি তৈরি করা হল। স্যালারি দেয়া হত এই বাটিতে বার্লি ওজন করে।

এক লিটারের এই স্ট্যান্ডার্ডাইজড বাটিকে বলা হত এক সিলা। একজন পুরুষ শ্রমিক হয়তো মাসে ষাট সিলা কামাতে পারতো। নারী শ্রমিক কামাতো ত্রিশ সিলার মত। এদের যে ফরম্যান ছিল তার কামাই ছিল মাসে ১২০০-৫০০০ সিলার মত। ৫০০০ সিলা বার্লি খেয়ে নিশ্চয়ই সে শেষ করতে পারতো না। যেটুকু বেঁচে যেত, সেটা সে পরিবারের জন্য মাছ, মাংস, দুধ-ডিম কিনতো।

শুরু শুরুতে মানুষকে কনভিন্স করা আসলেই টাফ ছিল---যে তোমার বার্লি খালি বার্লি না, এটা হল টাকা। আপনি যদি এই ইতিহাসে অনুপ্রাণিত হয়ে বাসার চালের বস্তাটা পিজা হাটে নিয়া পিজা কিনতে চান, পিজা হাটের লোক হয় আপনাকে পাগল ভাববে নয়তো পুলিশ ডাকবে। সেই সময় তো কাগুজে টাকার ধারণা ছিল না। আর বার্লি

যেহেতু খাওয়া যায়, এর একটা নিজস্ব ভ্যালু আছে। কাজেই, শুরুটা খুঁড়িয়ে হলেও আস্তে আস্তে বার্লি আস্তিক মানুষের সংখ্যা ঠিকই বেড়ে গেলো।

বার্লির সমস্যা ছিল, এটা স্টোর করে রাখা যায় না অনেকদিন। কাজেই, এমন কিছুর দরকার হল টাকা হিসেবে যাকে ইঁদুরে খেয়ে ফেলবে না বা সহজেই আগুনে পুড়ে যাবে না। ব্রেকথ্রু টেকনোলজি হিসেবে এলো রুপার ব্লক। ৮.৩৩ গ্রাম রুপার একটা ব্লক; এই ব্লককে বলা হত শেকেল।

হামুরাবির সংবিধানে যখন বলা হত, কোন অভিজাত পুরুষ যদি কোন দাসীকে হত্যা করে, তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেই দাসীর মালিককে ২০ শেকেল দিতে হবে। এই ২০ শেকেল মানে ২০টা রুপার মুদ্রা না। ২০*৮.৩৩= ১৬৬ গ্রাম রুপার কথা বলা হচ্ছে এখানে। বাইবেলেও এই 'শেকেল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইউসুফ নবীকে তার ভাইয়েরা এই ২০ শেকেলের বিনিময়েই ইসমায়েলীদের কাছে বেঁচে দিয়েছিল।

কালের বিবর্তনে নির্দিষ্ট ওজনের ধাতুকে যে বিনিময়ের কমন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়---এই আইডিয়া আমাদের গ্রেট গ্রেট নানা-দাদাদের মাথায় পাকাপোক্ত হয়ে গেড়ে বসলো।

আমরা যাকে কয়েন বা মুদ্রা বলি, তার আবির্ভাব হয় আজকের তুরস্কে। ৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আগের মতই নির্দিষ্ট ওজনের সোনা/রুপা দিয়ে তৈরি হত এই

মুদ্রাগুলো। নতুনত্বটা ছিল অন্য জায়গায়। ইতিহাসে প্রথমবারে মত মুদ্রার উপর রাজ-রাজড়ার নাম খোদাই করা শুরু হয়। এর মানে, স্বয়ং রাজা আমাকে কথা দিচ্ছেন--- বৎস, আমার এরিয়ায় তুমি নিশ্চিন্তে এই মুদ্রা ইউজ করতে পারো। কেউ এই মুদ্রার বিনিময়ে তোমাকে কিছু দিতে না চাইলে আমাকে খালি বলবা। আমি তার চৌদ্দপুরুষকে দেখে নিব।

সোনা/রুপার ব্লকে একটা সমস্যা ছিল। ধরা যাক, আপনি আমাকে বাদাম বিক্রির জন্য দুই শেকেল রুপা দিলেন। এখন এই দুই শেকেল রুপা যে পিউর, তার গ্যারান্টি কে দিবে? দিনে আমার একশো জন কাস্টোমার। এখন একশো জনের দেয়া শেকেলের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে গেলে আমার আর বাদাম বেচা লাগবে না। রুপার কয়েন যখন চালু হইলো, তখন আমার এই টেনশন রাজামশাই নিজ কাঁধে নিয়ে নিল। কয়েনের উপুর রাজার খোমাখানা প্রিন্ট করার মানে, এইখানে আর যা কিছু প্রিন্ট করা আছে সব কিছুর দায় রাজার। কয়েনের উপর দুই শেকেল লেখা আছে মানে, এইখানে দুই শেকেলই আছে, বা না থাকলেও ক্ষতি নাই। দুই শেকেলের বিনিময়ে বাজারে যা পাওয়া যায়, আমি ঠিক তা-ই পাব।

দেশের রাজার সাথে আমার সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। কোনকালে ছিলও না। যেটুকু সম্পর্ক--- তা এই টাকা-পয়সার মাধ্যমে। টাকা-পয়সার তাই যেমন একটা অর্থনৈতিক ন্যারেটিভ আছে, তার পাশাপাশি আছে একটা রাজনৈতিক ন্যারেটিভ; আধ্যাত্মিক ন্যারেটিভ।

যুগে যুগে তাই টাকা জাল করাকে বিরাট অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হইসে। টাকা জাল করা মানে সরাসরি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। সোজা কথা, দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

তবে টাকা জাল করে বড়লোক হতে চাইলে আমি একটা ছোট্ট সাজেশান দিতে পারি, কখনোই বাজারে বড় নোট ছাড়বেন না। বড় নোট সবাই চেক করে, পাঁচশো বা এক হাজার টাকার নোট জাল করে ধরা খাওয়া চান্স তাই অনেক বেশি। জাল করবেন একশো বা পঞ্চাশ টাকার নোট; ধরা খাওয়া চান্স ৯৯% যাবে!

যা বলছিলাম, লোকে আসলে টাকায় বিশ্বাস করে না। টাকাটা যেই লোক বা অথরিটি ইস্যু করসে, বিশ্বাসটা আসলে তার উপর। আমেরিকান ডলারে আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশি টাকার চেয়ে বেশি কেন? কারণ, আমেরিকান সিস্টেমের উপর আমাদের বিশ্বাস। এখানকার স্ট্রাকচার আর সিকিউরিটির উপর বিশ্বাস। আমাদের এলিট সমাজ কেন বাংলাদেশে ইনভেস্ট না করে মালয়েশিয়ায় বাড়ি বানায়? কারণ সে জানে এখানকার টাকার কোন ভ্যালু নাই। আজ সরকার বদল হলে ব্যাঙ্কে তার হাজার কোটি টাকার কানাকড়িও ভ্যালু থাকবে না। বাধ্য হয়ে সে তাই টাকা সরিয়ে মালয়েশিয়া/সিঙ্গাপুর রাখে। যেখানে তার টাকার আজকে যেই ভ্যালু, কালকেও সেই একই ভ্যালু থাকবে।

এইজন্যই রোমান দিনারিয়াস কয়েনের এতো ভ্যালু ছিল পুরো আফ্রো-এশিয়ায়। রোমান সম্রাটের উপর বিশ্বাস এতোই প্রবল ছিল যে ভারতে পর্যন্ত এই দিনারিয়াসে কেনাবেচা হত হামেশাই। আরব মুদ্রার নাম যে দিনার, সেও এসেছে এই 'দিনারিয়াস' থেকেই।

আর টাকার সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কথা কে না জানে? যে আরব মুসলিম বিশ্বাস করে, যীশু আল্লাহর নবী, সন্তান নয়, তার কাছেও যদি প্রবল পরাক্রমশালী কোন মুদ্রা আসে, যার উপর লেখা---যীশু আল্লাহর সন্তান---সে খুশিমনে সেই মুদ্রা ব্যবহার করবে; তার ধর্মের অপমান হয়েছে বলে এই মুদ্রা সে বর্জন করবে না।

টাকার সাফল্য যদি কিছু থেকে থাকে---এটাই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা। আমাদের বিশ্বাসের যদি কোন স্তম্ভ তৈরি হয়ে থাকে, সেই স্তম্ভের সবচেয়ে উঁচু আসনটায় থাকবে এই টাকা

অধ্যায় সাত কিস্তি শূন্য

যে ফার্মাসিস্ট ছেলেটা দিনরাত সালমান এফ রহমানকে গালি দিত শেয়ারবাজার লুটেপুটে নেবার জন্য, পাশ করে সেই হয়তো বেক্সিমকোতে জব করে। হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় বলে গ্রামীণফোনকে যে মেয়েটা দুই চোখে দেখতে পারতো না, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে জিপি হাউসে ইন্টারভিউ দিতে আসে। যে বামপন্থী ছেলেটা আমেরিকাকে দুনিয়ার সব সমস্যার মূল মনে করে, সেও অনার্স পাশ করেই জিয়ারই পরীক্ষার ডেট খোঁজে। কাপলান, প্রিন্সটনে বোঝাই হয় তার পড়ার টেবিল।

সালমান এফ রহমান, গ্রামীনফোন কিংবা আমেরিকা---প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যবাদের এক একটা রূপ। আমরা সাধারণ মানুষেরা উঠতে বসতে এই সাম্রাজ্যবাদীদের গালি দিই। আবার সাম্রাজ্যবাদের ছায়াতলে না থাকলে আমাদের চলেও না। আমরা সিকিউরড ফীল করি না। মধ্যবিত্তের এ এক নিদারুণ ক্রাইসিস।

আমাদের জন্যে যেটা মানসিক ক্রাইসিস, সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সেটাই এক ধরনের খেলা, মজার খেলা। তারা জানে, সবাই তাদের ঘৃণা করে। আবার এও জানে, দিন শেষে একে একে সবাই তার নৌকাতেই উঠবে।

আমাদের অতি অতি পূর্বপুরুষেরা তাই জাহাজে করে ভূমধ্যসাগরে গেছে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। রোমের বাজারে জিনিস বেঁচতে। রামমোহন-রবীন্দ্রনাথেরা বিলেতে গেছেন ডিগ্রি আনতে। আর আমরা যাচ্ছি কানাডা-আমেরিকায়।

শুরু শুরুতে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স আসে না--তা না। ভালো রকমের প্রতিরোধ আসে। যেমন প্রতিরোধের দেয়াল গড়েছিলে স্পেনের পাহাড়ি শহর

নুম্যানশিয়ার অধিবাসীরা। অপ্রতিরোধ্য রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সম্বল বলতে ছিল কেবল মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।

রোমরা লেজিয়নের পর লেজিয়ন পাঠাচ্ছিল বেয়ারা স্প্যানিশদের শায়েস্তা করতে। আর হেরে ফেরত আসছিলো। সাম্রাজ্যের নিয়মই হচ্ছে, সে ছোট ছোট ব্যাটল হারবে। কিন্তু আল্টিমেট যুদ্ধ ঠিকই জিতে নিবে। রোমানদের ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। তারা জেনারেল স্কিপিওর নেতৃত্বে ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী পাঠালো। এই সে স্কিপিও যিনি রোমের ঠিক আগের সাম্রাজ্য কার্থেজকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কিপিও ছোট ছোট গেরিলা যুদ্ধে সময় আর সৈন্য নষ্ট না করে পুরো শহরকে এই বিরাট সৈণ্যদল দিয়ে ঘিরে ধরার প্ল্যান করলেন। বাইরের পৃথিবীর সাথে নুম্যানশিয়ার সমস্ত সংযোগ কেটে দিলেন। এক বছরের মাথায় ভেতরের অধিবাসীদের খাদ্যেয় সাপ্লাই ফুরিয়ে গেলো। তাদের বোধোদয় হল, হোপ ইজ এ্যা গুড থিং। কিন্তু এই

মুহূর্তে তাদের আর কোন আশা নাই। তারা পুরো শহরটাকে জ্বালিয়ে দিল। নিজেরাও আত্মহত্যা করলো, যেন রোমান দাস হয়ে অন্তত জীবন কাটাতে না হয়।

নুম্যানশিয়া পরে স্প্যানিশ স্বাধীণতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কবিরা এই নিয়ে কবিতা লিখেছেন, লেখকেরা গল্প-উপন্যাস। এইখানে স্মৃতিসৌধ হয়েছে। প্রতি বছর দেশপ্রেমী স্প্যানিশেরা এইখানে তাদের সাহসী পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে আসেন।

এই গল্পটা বললাম---তার একটা কারণ আছে। যে স্প্যানিশ ভাষায় গান-কবিতা লেখা হচ্ছে জাতীয় বীরদের স্মরণে, এই স্প্যানিশ কিন্তু দখলদার রোমানদের ভাষা ল্যাতিন-এরই সন্তান। নুম্যানশিয়া তথা স্পেনের অধিবাসীদের আদি ভাষা কিন্তু স্প্যানিশ না। এরা যে ভাষায় কথা বলতো, সেটা আজ মৃত।
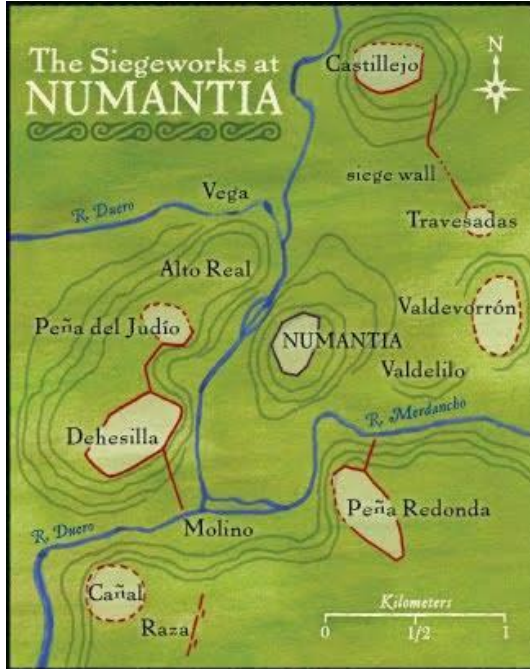
যে লোক The siege of Numantia লিখে সে জাতীয় বীরদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মানুষের লাছে, তার লেখার স্টাইলও সে কিন্তু পেয়েছে রোমান লেখকদের কাছ থেকেই। চার্চে যখন এই বীরদের জন্য দোয়া করা হয়, সেই দোয়ার ভাষাও কিন্তু আসছে এই রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকেই। স্প্যানিশ খাবার-দাবার বলেন, আইন-কানুন বলেন, আর্কিটেকচার বলেন---সবকিছুতেই হানাদার রোমানদের ছাপ স্পষ্ট।

যে নুম্যানশিয়াকে স্পেনের স্বাধীনতা চেতনার সিম্বল ভাবা হয়, সেই চেতনার ছাইটুকুও আজ তাদের মধ্যে নেই। সবটুকু রোমান সাম্রাজ্যবাদের পেটে ঢুকে পরেছে।

এইখানেই সাম্রাজ্যবাদের জয়। এর পতন আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। পতন তো ঘটবেই। রোমানদের ঘটেছে, অটোম্যানদের ঘটেছে, আমেরিকাও একদিন ফল করবে; কিন্তু মরে যাবার আগে এরা একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। এদের বেঁধে দেয়া জীবনযাত্রায় বসবাস করে, স্বপ্ন দেখে আরেক সভ্যতার মানুষ।

এই কাজটা ব্রটিশরা করেছে ভারতবর্ষের সাথে। চাকরির লোভ দেখিয়ে গোটা কৃষিভিত্তিক ভারতের খোলনলচে দিয়েছে পালটে। পাখি চলে গেছে, পালকখান রয়ে গেছে। ব্রিটিশ চলে গেছে, প্যান্ট-স্কার্ট রেখে গেছে। ঠিক এই কাজটাই একটু অন্যভাবে ভারত করছে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে। মুম্বাইয়ের অল্প কিছু মানুষ বসে ঠিক করে দিচ্ছে---আমার আপনার বিয়ের প্রোগ্রামটি কেমন হবে। এর স্টেজ সাজানো, গান বাজানো থেকে শুরু করে বর-কনের পোশাক পর্যন্ত ঠিক করে দিচ্ছে মুম্বাই মুমিনেরা।

আধুনিক নেশন স্টেটের যুগে এসেও তাই সাম্রাজ্যবাদের ফজিলতে অস্বীকার করার কোন উপায়ই আমাদের হাতে নেই।

সাত কিস্তি এক

মানুষ স্বভাবতই জেনোফোবিক। নিজ গোত্রের লোক ছাড়া বাইরের কাউকে সে দেখতে পারে না; কিংবা দেখলেও সন্দেহের চোখে দেখে।

ঢাকার রাস্তায় যদি হঠাৎ করে আফ্রিকানের সংখ্যা বেড়ে যায়, আপনার মনে খুঁতখুঁত করবে। এতো আফ্রিকান আইলো কোইথ থেইকা? ঠিক যে কারণে ফ্রান্স মুসলিমদের দেখতে পারে না। মুসলিমদের সে কখনোই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। ঠিক এই কারণেই অফিসের বস বরিশালের হলে সেই অফিস কিছুদিনের মধ্যেই বরিশালের লোকজনে গমগম করে। আইইউটি'র হলে আইউইটিয়ানদের কিচির মিচিরে।

আপনি এটাকে অঞ্চলপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বলবেন। সত্যিটা হচ্ছে এই যে, বরিশাল বা আইইউটি'র ঐ বসের কোন দোষ নেই। মানুষ মাত্রই কমফোর্ট জোনে থাকতে চায়। সে তার ফেলো বরিশালিয়ান বা আইইউটিয়ানদের পাশে ঐ কমফোর্ট জোনটা পায়। অন্য অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানের লোকের উপর সে ততোটা খবরদারি খাটে পারে না যেটা পারে নিজ অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানের ছেলেপিলের উপর। আমাদের ডিএন'এ'র গভীরে যে আমরা ভার্সেস তোমরা বলে একটা ব্যাপার আছে, সেই ভূগোলের আমরা অংশে পরে তার আপন এলাকার লোকজন। এর বাইরের পৃথিবী তার কনসার্নের মধ্যে পরে না। ইন ফ্যাক্ট, নিজ গোত্রের বাইরের মানুষকে আমরা মানুষের কাতারেই ফেলি না। আমাদের প্রাথমিক ভাষাগুলোতে এর অজস্র প্রমাণ রয়েছে। সুদানে Dinka নামে একটা গোষ্ঠী আছে। ওদের ভাষায় Dinka মানে মানুষ। তার মানে এর বাইরের কেউই মানুষের সংজ্ঞায় পড়ে না। Dinka দের চিরশত্রু হচ্ছে Nuer জনগোষ্ঠী। নয়ারেদের ভাষায় আবার Nuer মানে হচ্ছে আসল মানুষ। সুদানী সভ্যতা থেকে বহু দূরে আলাস্কায় ইয়াবাক জনগোষ্ঠীর বাস। গেস হোয়াট? ইয়াবাক শব্দের অর্থও হচ্ছে প্রকৃত মানুষ!

এই পর্যায়ের জেনোফোবিক মানুষ কীভাবে সাম্রাজ্যের জন্ম দিল---সেটা একটা রহস্য বটে। সাম্রাজ্য ঠিকঠাক ফাংশন করার জন্য যে পরিমাণ সহনশীলতার প্রয়োজন, সহযোগিতার প্রয়োজন মানুষের মধ্যে তো ব্যাসিক্যালী সেটা নাই। সাম্রাজ্য তাহলে চলে কীভাবে?

খুব সিম্পল। অন্যায় আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে।

আমেরিকা যখন ইরাক বা আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন নিজেদের কাজকর্মকে জাস্টিফাই করে এই বলে যে---তোমাদের ভালর জন্যই আমরা এটা করতেসি। হাসপাতালে বোমা পড়ছে, শিশুরা এতিম হচ্ছে, মানুষজন ঘরছাড়া হচ্ছে---এগুলো সব স্থূল দর্শন। বর্তমানের এই ঘোলাটে কাচ পরিষ্কার করে তোমরা যদি একটু দূরে তাকাও, দেখবা আজকের এই কষ্টের বিনিময়ে দিন শেষে তোমাদের জন্য ভালোই আছে।

'তোমাদের ভালোর জন্যই করতেসি'---শাসকদের স্ক্রিপ্টে এটা কোন নতুন কথা না। রোমানরা মনে করতো, তাদের সভ্যতাই সেরা। যারা এই সভ্যতার স্বাদ পায়নি, তারা অন্ধকারে আছে। এদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য হলেও রোমান শাসনের অধীনে আনা জরুরী। সেটা যদি ফরাসী বা জার্মান নারীদের বিধবা করে হয়---তবুও। বরং যারা বেঁচে আছে, তাদেরকে রোমান শিক্ষা, সংস্কৃতির ছোঁয়ায় এনে এদের প্রতি এক প্রকার এহসান করতেসে বলেই এদের মনে হত।

নিজ সভ্যতাকে সে ছড়িয়ে দেয় বটে। পরাধীন জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্যতাকে দৈনিক ব্রাঞ্চের সাথে হজম করে ফেলে সে। আবার পরাধীন জনগোষ্ঠীর কেউ যদি সেই সভ্যতায় সুসভ্য হয়ে ওঠে, তাকে সে সার্টিফিকেট দিতেও তার চরম অনীহা।

এক ভারতীয় ভদ্রলোকের গল্প বলি। ঊনিশ শতকের শেষ দিক তখন। ভদ্রলোক ইংরেজিদের মতই ফটাফট ইংরেজি বলতেন, তাদের মতই নাচতে জানতেন, ছুরি-কাঁচি দিয়ে খেতে পারতেন বেশ। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করা এই ভদ্রলোক আরেক ব্রিটিশ উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন প্র্যাকটিস করতে। স্যুট-টাইয়ের গরমে চড়ে বসলেন ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায়। খালি স্যুট-টাই পরলেই তো হবে না, গায়ের রং-টাও তো ফর্সা হতে হবে। তার মত কালোদের জন্য বরাদ্দ ছিল থার্ড ক্লাশের কামরা। ফলাফল, নিয়ম ভাঙার দায়ে তাকে ফার্স্ট ক্লাস থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়।
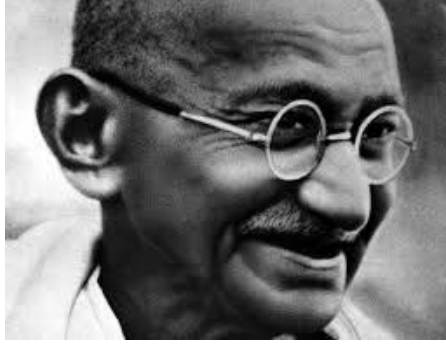
এই ভদ্রলোকের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

এইসব ঘটনা অবশ্য সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে ঘটে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব যতো বাড়তে থাকে, সে সাম্রাজ্যের কোর জনগোষ্ঠীর বাইরের মানুষদেরও পলিসি মেকিং লেভেল ওয়েলকাম করা শুরু করে। হাতের কাছেই সবচেয়ে বড় উদাহরণ বারাক ওবামা। ১০০ বছর আগে হলে কেনিয়ার রক্ত গায়ে থাকা কোন লোকের ইউএস প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই ভাবা হত না। সিরিয়া আর লিবিয়ার লোক এসে এক সময় রোমের তখতে বসে গেছে। ইসলামের মুকুট আরবদের হাত থেকে চলে গেছে টার্কিশদের হাতে।

Weather: Scattered showers, 72/60 SPORTS ★ FINAL Wednesday, June 4, 2008

DAILY NEWS

50¢ 2.5 MILLION READERS EVERY DAY NYDailyNews.com

HISTORY!

Barack Obama writes new chapter in American politics as he takes giant step to becoming nation's first black President

ELECTION SPECIAL PAGES 2-6

DEFEATED HIL SAYS SHE COULD BE VEEP

সাম্রাজ্যের এ এক অবশ্যম্ভাবী জীবনচক্র। বিশুদ্ধ চাকুরী বলে যেমন কিছু নেই, বিশুদ্ধ সাম্রাজ্য বলেও কিছু নেই। আজ আপনি যাকে পদানত করছেন, সে কিংবা তার সন্তান ঐ একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একদিন আপনাকে পায়ের নিচে ফেলবে।

সান্ত্বনা এইটুকুই যে, ঐ প্লাটফর্মটা পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদেরই তৈরি করা।

আমরা চায়ের কাপে ঝড় তুলে ব্রিটিশদের যতোই গালিগালাজ করি না, এই চায়ের অভ্যাসটাও কিন্তু ব্রিটিশদেরই দান। কিংবা যে ক্রিকেট নিয়ে আমাদের এতো মাতামাতি, যে একটা ইস্যুতে আমরা সবাই একমত হই---সেই ক্রিকেটটাও ব্রিটিশরাই আমাদের শিখিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ খেদাও বললেই আমরা চোখ বুঁজে এর সব কিছু খেদাতে পারি না।

আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের লুঙ্গিতেই টান পড়বে তখন!

সাত কিস্তি দুই

গ্রীক দেব-দেবী বলতে সবাই জিউস, হেরা, এ্যাপোলো---এদের নাম জানি। যেটা জানি না, সেটা হল এদের সবার মাথার উপরে একজন ছিল যাকে এরাও সমঝে চলতো। ইনার নাম আনাখ বা ভাগ্য। প্রায় সকল পলিথেয়িস্টিক ধর্মেই এমন একজন সুপ্রীম সত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। পলিথেয়িস্টিক হয়েও এরা তাই বিশুদ্ধ পলিথেয়িস্টিক নয়। এক আর বহু---দু রকম ঈশ্বরে বিশ্বাসই এখানে জড়াজড়ি করে অবস্থান করে।

চাইলে অজস্র উদাহরণ দেয়া যাবে। পশ্চিম আফ্রিকায় ইয়োরুবা নামে একটা ধর্ম আছে। যার বিশ্বাস মতে, সকল দেব-দেবতার জন্ম Olodumare নামের এক সুপ্রীম দেবতার ঔরসে। সবচেয়ে জনপ্রিয় বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম হিন্দু ধর্মেও 'পরমাত্মা' নামক

এক মহান সত্তার কথা বলা হয়েছে, যে কিনা সমস্ত মানুষ, জীব-জানোয়ার আর অতি অবশ্যই দেব-দেবীদেরও নিয়ন্ত্রণ করে।

পলিথেয়িজমের ঈশ্বরের সাথে ট্রাডিশনাল মনোথেয়িজমের ঈশ্বরের পার্থক্য হচ্ছে---পলিথেয়িজমের ঈশ্বর মানুষের দৈনিক মামলায় নাক গলান না। কার ক্যান্সার হইলো, যুদ্ধে কে মরলো কে বাঁচলো, কে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চায়---এগুলা তার কনসার্নের বিষয় না। মানুষও চালাক। গ্রীকরা তাই আনাখের উদ্দেশ্যে কিছু বলি দিত না কিংবা হিন্দুরাও আত্মার সম্মানে কোন মন্দির বানায় না।

পরম ঈশ্বরের সাথে একমাত্র দেন দরবার হতে পারে যদি তুমি নির্বাণ চাও। হিন্দু সাধুরা যেটা করে। তারা একটা বার্ডস আই ভিউ থেকে জগৎটাকে দেখার অভ্যাস রপ্ত করে। একবার এই অভ্যাস হয়ে গেলে জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য, জরা কোন কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। তারা এগুলাকে স্বাভাবিক আর ক্ষণস্থায়ী ন্যারেটিভ মেনে নিয়ে পরম ঈশ্বর যেমন এ সব কিছুর প্রতি উদাসীন, তারাও এই উদাসীন এ্যাটিটুডটা গেইন করে।

সাধুরা না হয় বউ-বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে পরম ঈশ্বরের সন্ধান পাইলো। আমাদের মত ছাপোষা মানুষের কী হবে? আমরা তো পরম ঈশ্বরের ঐ লেভেলে পৌঁছাতে পারতেসি না। আমাদের ১৪০০ স্কয়ার ফিটের বাসা বা সিভিক হোন্ডার চাহিদা তো ঐ পরম ঈশ্বর মেটাবে না। তো আমাদের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে স্পেশালাইজড ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারমেডিয়েট দেব-দেবী। লক্ষ্মী আমদের ফ্ল্যাট দিবে, সরস্বতী ডিগ্রি।

বহু ঈশ্বর কিন্তু এক সেন্সে এক ঈশ্বরের চেয়ে ভালো। যে লোক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে তার বিশ্বাসের কারণেই গোড়া হতে বাধ্য। অন্য ধর্মের দেব-দেবীকে তার ধর্মে কনটেইন করার জায়গা তার নেই। বহু ঈশ্বরবাদীদের এই সমস্যা নাই। এরা অনেক বেশি ওপেন, অনেক বেশি লিবারেল। তার ধর্মে ফ্ল্যাটের দেবী আছে, ডিগ্রির দেবী আছে, কিন্তু ফুটবলের দেবী নাই। এখন অন্য কোন কালচার যদি তার ধর্মে ফুটবলের দেবী আমদানি করে, সে তাতে খুব একতা আপত্তি করবে না। উলটা ওয়েলকাম করবে।

রোমানরা যেমন গ্রীকদের সব দেব-দেবীকে নিজেদের করে নিসে। গ্রীক জিউস রোমে এসে হয়ে গেছে জুপিটার, এরোস হয়ে গেছে কিউপিড আর আফ্রোদিতি, ভেনাস। রোমানরা এই ব্যাপারে এতোটাই উদার ছিল যেঁ এশিয়ান দেবী সিবিল আর মিশরীয় দেবী আইসিসকেও এরা এদের মন্দিরে স্থান দিতে দ্বিধা করেনি।

একমাত্র যে দেবতার সাথে এদের খটোমতো লাগসিলো---সেটা হল খ্রিস্টানদের দেবতা। গড। আল্লাহ। ইয়াওয়েহ। রোমানরা চাচ্ছিলো খ্রিস্টানরা যেন তাদের আল্লাহর পাশাপাশি জুপিটার আর বেনাসেরও পুজা করে। এটা

খালি ধর্মীয় লয়্যালটির প্রশ্ন না, রাজনৈতিক রয়্যালটিরও প্রশ্ন।

খ্রিস্টানরা তো কোনভাবেই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবে না। এটাকে যতোটা না ধর্মের বিরুদ্ধে, তার চেয়ে বেশি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

হিসেবে দেখা হইলো। ফলাফল, যীশুর মৃত্যুর ৩০০ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে কয়েক হাজার খ্রিস্টানের মৃত্যু। মজার ব্যাপার হল, এর পরের ১৫০০ বছর খ্রিস্টানরা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছেমত কচুকাটা করসে। তাও, খুব সিলি একতা ব্যাপার নিয়ে।
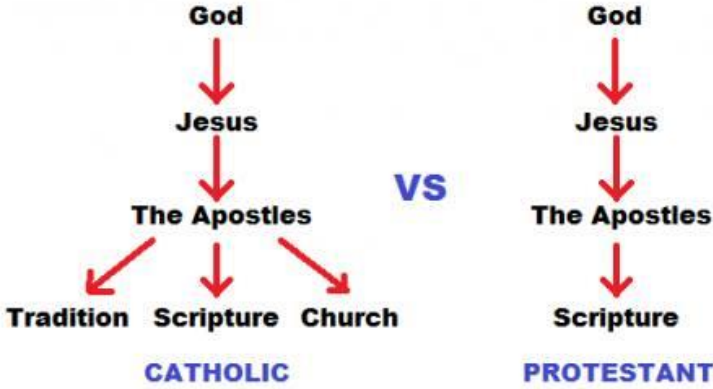
খ্রিস্টানদের দুইটা সেক্ট। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট। দুই দলই বিশ্বাস করে, মরিয়মের ছেলে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার বাণী ছড়ায়ে গেসেন। এখন এই ভালোবাসার স্বরূপটা কী---সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রোটেস্ট্যান্টরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর স্বয়ং যীশুর বেশে রক্তমাংসে এই পৃথিবীতে আসছেন, আমাদের জন্য অত্যাচার সহ্য করসেন, শেষমেশ ক্রুশবিদ্ধ হইসেন। আমাদের যেঁ আদি পাপ ছিল, সেটা উনি নিজ কাঁধে নিয়ে নেওয়ায় আমাদের বেহেশতের দরজা আসলে খুলে গেসে। উনার উপর জাস্ট বিশ্বাস স্থাপন করলেই আমরা তরতর করে বেহেশতে চলে যাব। ক্যাথলিকরাও এই মূল প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করে। তবে ওদের একটু সংযোজন আছে। এরা মনে করে, বেহেশতে যেতে হলে আমাদের নিয়মিত চার্চে যেতে হবে আর ভালো কাজ করতে হবে। The Big Bang Theory তে বার্নাডেট যখন বলে, সে ক্যাথলিক স্কুলে পড়সে, সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না---ঠিক এই কারণেই পারে না। দুনিয়া

যেঁ আখিরাতের শস্যক্ষেত্র ---গোঁড়া ক্যাথলিকরা এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করে। প্রোটেস্ট্যান্টরা সেটা করে না।

তাদের কথা হল, ক্যাথলিকরা খোদার সাথে সওদাবাজি করতেসে। ভালো কাজ করলে, আমাকে মান্যিগণ্যি করলে আমাকে প্রমোশন দিবে--এটা অফিসের বসের আচরণ হতে পারে। খোদার না। এতে করে খোদার মহত্বকে খাটো করা হয়। যীশু যে এতো কষ্ট করলো আমাদের জন্য, সেটারও কোন ভ্যালু থাকে না।

এই সামান্য পার্থক্যই ১৬-১৭ শতাব্দীতে হিংস্র রূপ নিলো। ১৫৭২ সালের ২৩শে আগস্ট ফ্রেঞ্চ ক্যাথলিকরা প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর নারকীয় হামলা চালায়। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ১০,০০০ প্রোটেস্ট্যান্টের লাশ পড়ে যায়। রোমানরা ৩০০ বছরেও এতো খ্রিস্টানের লাশ ফেলতে পারে নাই। রোমের পোপ এই খবর শুনে দুঃখ পাওয়া তো দূরে থাক, খুশিতে ফেটে পড়ে বিরাট ভোজ কাম প্রার্থনার আয়োজন করলেন। ভ্যাটিকানের একটা রুমে এই গণহত্যার ফ্রেস্কো করার জন্য এক পেইন্টারও নিয়োগ দিলেন।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়, এই সহনশীলতার অভাবেই মনোথেয়িজম থেকে বার বার 'মুরতাদ' এর জন্ম হয়েছে, পলিথেয়িজম থেকে হয়নি।

সাত কিস্তি শেষ

ইনস্টিটিউশনালাইজড একেশ্বরবাদের দেখা আমরা প্রথম পাই মিশরে। যীশুর জন্মের ৩৫০ বছর আগে। সম্রাট আখেনাতেন ঘোষণা দেন যে, আতেন নামের এক দেবতাই সত্যি। আর সব দেব-দেবী মিথ্যা। এক আতেনের পুজাকে তিনি রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। অন্য সব দেব-দেবীকে মন্দির থেকে দেন খেদায়ে।

তার এই বিপ্লব অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার মৃত্যুর পর পরই বিপথগামী মিশরীয়রা আবার পুরান সব দেব-দেবীকে ফিরায়ে আনে।

মুসা নবী অবশ্য তার আগেই একেশ্বরবাদের প্রচার করে গেছেন। কিন্তু মুসার খোদা ছিলেন একজন লোকাল দেবতা। যার সমস্ত ইন্টারেস্ট ছিল ইহুদী জাতির দেখভাল

করা। গোটা মানবজাতির কী হলো, এই নিয়ে তার বিন্দুমাত্র কনসার্ন ছিল না। এরকম লোক আর যাই হোক, 'ঈশ্বর' পদের অধিকারী হইতে পারে না।

ব্রেকথ্রুটা আসে যীশুর হাত ধরে। আসলে যীশুর না, সাধু পলের হাত ধরে। শুরুতে খ্রিস্টানরা নিজেদের ইহুদীদের একটা সেক্ট মনে করতো। সাধু পল-ই প্রথম বলেন যে, আমাদের পাপ মোচনের জন্য খোদা স্বয়ং যীশুর রূপ ধরে পৃথিবীতে আসছে। ক্রুশবিদ্ধ হইসেন। আমাদের তো উচিত এই গল্প সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে করা। জন্ম হয় গসপেলের।
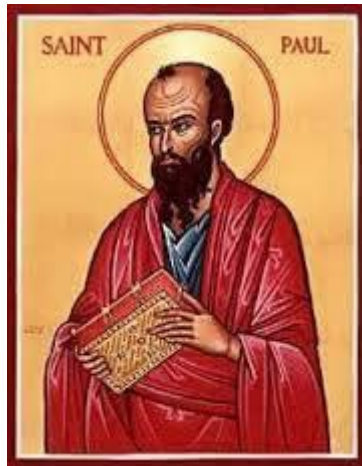
সাধু পলের আইডিয়া বিফলে যায়নি। খ্রিস্টান মিশনারীর দল ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা অস্বাভাবিক আর ইউনিক ঘটনা। এর আগে মানুষ যার যার ধর্ম নিয়া সন্তুষ্ট থাকতো। প্রথমবারের মত অন্য জাতির লোকদেরও নিজ ধর্মে টানা শুরু হইলো। তোমার ধর্ম খারাপ আর আমার ধর্ম ভালো, কাজেই তোমার উচিত আমার ধর্ম কবুল করা---এই আইডিয়ার জন্ম হয় তখনই। এর ফলাফলকে যুগান্তকারী বললে কম বলা হবে। কয়েকশো বছরের মধ্যে খ্রিস্টানরা রোমের গদি দখল করে ফেললো।

খ্রিস্টানরা যেটা করসে, ইসলাম সেটা কপি পেস্ট করসে মাত্র। পার্থক্য এইটুকুই---ইসলামের প্রসারটা ছিল আরো তীব্র, আরো ব্যাপক। কেউ ভাবে নাই, যে আরবের একটা ধর্ম দুনিয়ায় এতো প্রভাব বিস্তার করবে। মুসলমানদের তাই শুরু দিকে কেউ অতো পাত্তা দেয় নাই। ভাবসে, দুর্বল একটা সেক্ট হয়েই থাকবে এরা। এই অশিক্ষিত বেদুইনের দল যে গোটা ভূমধ্যসাগরে মাস্তানি শুরু করবে---এটা যে কারো ধারণারও বাইরে ছিল।

পরিবর্তনটা চোখে পড়ার মত। যীশুর জন্মের আগে যেখানে গোটা দুনিয়ায় গুটি কতক একেশ্বরবাদী মানুষ ছিল, সেখানে এক হাজার বছরের মধ্যে হিমালয় থেকে আটলান্টিক একেশ্বরবাদীদের কলরবে মুখর হয়ে উঠলো।

তাই বলে যে একেশ্ববাদের মনোপলি শুরু হয়ে গেলো---ব্যাপারটা অমন নয়। লোকে ঠিকই পুরনো অভ্যাসমত একেশ্বরবাদের খোলসের ভেতর পুরনো পলিথেয়িজমের চর্চা জারি রাখলো।

পলিথেয়িজমের যুগে জুপিটারের কাজ ছিল রোমের দেখভাল করা। মনোথেয়িজমের যুগে এসে আগের অভ্যাসমত নব্য খ্রিস্টানরা নিজেদের রক্ষার জন্য আলাদা আলাদা সাধুর দরবারে মানত করা শুরু করলো। ব্রিটিশরা করলো সেন্ট জর্জের কাছে,

স্কটিশরা সেন্ট এ্যান্ড্রু, আর ফরাসীরা সেন্ট মার্টিনের কাছে। এমনকি শহরগুলোরও নিজেদের ভালোমন্দ দেখাশোনার জন্য আলাদা আলাদা পীরের বন্দোবস্ত ছিল। মিলানের ছিল সেন্ট এ্যামব্রোস, ভেনিসের সেন্ট মার্ক। মাথা ব্যথা করলে সেন্ট আগাথিয়াসের কাছে দোয়া করা হত, আর দাঁতের ব্যথায় সেন্ট এ্যাপোলোনিয়ার দরবারে।

অনেক ক্ষেত্রে তো আগের পলিথেয়িস্টিক দেব-দেবীই আকিকা করে নতুন নাম নিয়ে থাকলেন। আইরিশদের দেবীর নাম ছিল ব্রিজিদ। আইরিশদের সাথে সাথে এই ব্রিজিদও খ্রিস্টান হলেন। তার নতুন নাম হল সেন্ট ব্রিজিত।

পলিয়থেয়িজম যে কেবল মনোথেয়িজমের জন্মই দিয়েছে, তা নয়। ডুয়ালিজমের জন্মদাত্রীও সে। ডুয়ালিজম বলে---আমাদের এই পৃথিবীটা একটা ব্যাটলফিল্ড। এই রণক্ষেত্রে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলেছে দুই কুশীলব। ভাল আর মন্দ। সু আর কু। আল্লাহ আর শয়তান।

আমরা যখন ভাবি---এই দুনিয়ায় এতো অন্যায়-অত্যাচার কেন? কেন মানুষের এতো দুর্দশা? কেন মানুষ মানুষের কল্লা কেটে নেয়? তখন একটা কমন উত্তর আসে---শয়তান মানুষকে দিয়ে এইসব করাইতেসে। তখনই আরেকটা প্রশ্ন আসে। শয়তান তো আল্লাহরই তৈরি। আল্লাহই বা কোন বুদ্ধিতে শয়তানকে তৈরি করলেন?

একেশ্বরবাদ বলে---আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিসেন। ইচ্ছাশক্তি দিসেন। সেই ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগায়া আনুষ ভালো-মন্দ ফারাক করতে পারে। শয়তান না থাকলে তো কোন মন্দ থাকতো না। আর মানুষ ভালো-মন্দ পার্থক্যও করতে পারতো না। ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা আছে দেখেই তো সে 'মানুষ'---আশরাফুল মাখলুকাত।

এখন কিছু লোক তো মন্দ পথ বেছে নিবেই। সমস্যা হল, ঈশ্বর কী সর্বজ্ঞ নন? তিনি কী ঐ মানুষটার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন না? জানলে তো এও জানবেন যে---ঐ লোকটা পৃথিবীতে এসে মন্দ কাজ করবে। আর মন্দ কাজের ফলস্বরূপ শাস্তি পাবে। ঈশ্বর যদি আগে থেকেই এতো কিছু জানেন, তাহলে ঐ লোককে আর সৃষ্টি করার দরকার কি? আগে থেকেই তার আত্মাকে দোজখে পুরে দিলে হয়। মোটকথা, একেশ্বরবাদীদের বেশ টাফ টাইম পোহাতে হয় এই প্রশ্নগুলোর কনভিন্সিং উত্তর খুঁজে বের করতে।

Zarathustra

ডুয়ালিজমের জন্য ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সোজা। তারা মনে করে, এই পৃথিবীতে দুইটা প্যারালাল গভর্নমেন্ট চলে। একটা ঈশ্বর চালান, আরেকটা শয়তান। ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় ভালো কাজগুলো হয়। আর শয়তানের প্ররোচনায় মন্দ কাজগুলো।

সমস্যা হল, দুইজন দুইজনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলে পৃথিবীতে যে একটা মিনিমাম লেভেলের কনসিস্টেন্সি আছে---সেটা থাকার কথা না। সেক্ষেত্রে সূর্য একদিন পূর্ব দিকে ওঠার

কথা, আরেকদিন পশ্চিমে। কিছুদিন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরবে, কিছুদিন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে। কিন্তু এমনটা তো হয় না। F=ma মহাবিশ্বের সর্বত্রই সব সময়ের জন্যই খাটে। স্বাধীন শয়তানের আইডিয়াটাও তাই ঠিক জুৎ করে উঠতে পারে না।

ডুয়ালিজম তাই বলে একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। জরথুস্ত্রবাদের মধ্য দিয়ে এটা আজও পৃথিবীতে টিকে আছে। পারস্য থেকে এই ধর্ম ভারতের মুম্বাইতে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। বলিউড অভিনেতা ব্যোমান ইরানী থেকে শুরু করে শারমান যোশী ও আরো অনেকেই এই ধর্মের অনুসারী। জরথুস্ত্র বলেন, পৃথিবী একটা চিরায়ত যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে ভালোর প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর লড়ে চলেছেন আহুর মাজদা। শয়তানের বিরুদ্ধে এই লড়াই তিনি একা লড়তে পারেন না। তার প্রয়োজন হয় মানুষের সাহায্য।

ডুয়ালিজমের আরেকটা ভার্শন আছে। এই ভার্শন বলে, ভালো ঈশ্বর আমাদের আত্মা দিয়েছেন। আর বদ ঈশ্বর দিয়েছেন দেহ। দেহ তাই খালি আকাম কুকাম করতে চায়। আর আত্মা তাকে এইসব থেকে বিরত রাখে। আমরা মানুষেরা আত্মা আর শরীরের মধ্যকার এই যুদ্ধের একটা গ্রাউন্ড ছাড়া আর কিছুই না।

মানুষ হবার এই এক জ্বালা। দেহ আর আত্মার এক নিরন্তর গৃহযুদ্ধের নাম আমাদের এই মানব জনম।

অধ্যায় আট কিস্তি শূন্য

পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী যখন আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন কেউ কি ভেবেছিল নয় মাসের মধ্যেই এই জনপদে একটা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটবে?

পরের বছর দশ জানুয়ারী যখন তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন, তখন কি কেউ ভেবেছিল সাড়ে তিন বছরের মাথায় এই বাঙালদের হাতেই তাকে মরতে হবে?

কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় হল না বলে যেদিন শাহবাগে জনতার ঢল নামলো, সেদিন কি কেউ ভেবেছিল মাস তিনেকের মাথায় এই ঢাকা শহরেই হেফাজত নামে কেউ এসে দেশের রাজনীতির গতিপথ বদলে দেবে?

ইতিহাসের নিয়মই হচ্ছে এই যে, সে কোন নিয়ম বা ফর্মুলা মেনে চলে না। কিংবা বলা যায়, সে কেবল একটা ফর্মুলাই মেনে চলে। তা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবিলিটি।

এ কারণেই কোন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর ইতিহাসবিদরা আগের ঘটনার সূত্র ধরে পরের ঘটনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যেন প্রথম ঘটনা ঘটেছে বলেই তার রাস্তা ধরে দ্বিতীয় ঘটনার জন্ম হয়েছে। প্রথম ঘটনার সাথে দ্বিতীয় ঘটনা জোর করে লিঙ্ক করার এই যে প্রবণতা---এর নামই হাইন্ডসাইট ফ্যালাসি (Hindsight fallacy)।

এই ফ্যালাসির কারণেই আপনার মনে হবে, পেছনের ঘটনার কারণেই আজকের এই ঘটনাটা ঘটছে। অথচ পেছনের ঘটনা না ঘটলেও হয়তো আজকের এই ঘটনা ঘটতো। আবার পেছনের ঘটনার কারণেই আজ আরো হাজারটা ঘটনা ঘটতে পারতো, যা কিনা ঘটেনি।

ইতিহাসবিদরাও বুঝে না বুঝে হামেশাই এই ফ্যালাসির শিকার হন। চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনস্ট্যানটিন খ্রিস্টধর্মকে রাজধর্ম করে নেন। খ্রিস্টধর্ম কীভাবে রাজধর্ম হল---এই গল্প ইতিহাসবিদরা আমাদের বলেন। কিন্তু কেন খ্রিস্টধর্মই রাজধর্ম হল, বৌদ্ধধর্ম বা জরথুস্ত্রবাদ কেন হল না---এই গল্প বলেন না।

ইতিহাসবিদরা সবসময়ই আমাদের 'কীভাবে হল'---এর উত্তর দেন। 'কেন হল'---এর উত্তর খুব কমই দেন। তারা একের পর এক ঘটনাসূত্র মিলিয়ে এমনভাবে গল্পটা বলেন---যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। কিন্তু একটা সূত্র মিস হয়ে গেলে কী ঘটতে পারতো---সেটা তারা খুব কমই বলেন। ধরা যাক, ভারত একাত্তরে আমাদের এক কোটি শরণার্থী নিল না। সেক্ষেত্রে কি আমরা নয় মাসেই স্বাধীনতা পেতে পারতাম? নাকি ভিয়েতনামের মত সাত-আট বছর যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেতাম? নাকি ফিলিস্তিনের মত আমাদের ধুঁকে ধুঁকে মরতে হত? স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের আর পাওয়াই হত না!

জিয়াউর রহমান রাজাকার তোষণ করেছেন। জিয়াউর রহমান না এসে যদি কর্ণেল তাহের বা খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় আসতেন, তারা যে কেউ রাজাকার তোষণ করতেন না---তার গ্যারান্টি কী? বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে উনি নিজেই যে এক সময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে যেতেন না---এরই বা নিশ্চয়তা কে দেবে?

সমস্যাটা হচ্ছে, একটা ঘটনা যখন ঘটে, তখন সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটিও পরের ঘটনার ব্যাপারে সম্পূর্ন ক্লুলেস থাকে। সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা তো দূরের কথা।

টকশোতে করা বুদ্ধিজীবীদের বয়ান যে বারেবারে ভুল প্রমাণিত হয়, এই কারণেই হয়। এটা যেমন অতীতের জন্য সত্য, তেমনি বর্তমানের জন্যও। আজ আমরা ভাবছি, আমেরিকা ফল করলে চায়না তার জায়গা নেবে। পঞ্চাশ বছর পর চায়নার জায়গায় যদি ব্রাজিল আমেরিকার জায়গা দখল নেয়, তখন ইতিহাসবিদরা ঘটনাগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে, যেন ব্রাজিলই ছিল অবশ্যম্ভাবী রিপ্লেসমেন্ট। অথচ ব্রাজিলকে এখনো কেউ গোনায় ধরছে না।
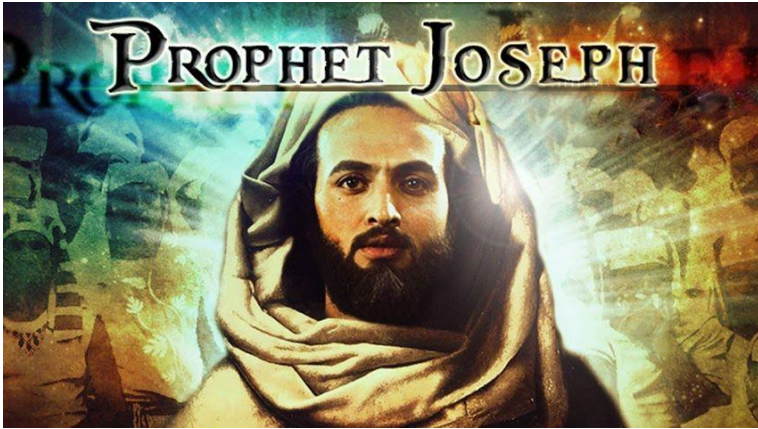
কনস্ট্যানটিন রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় খ্রিস্টধর্মকে ইহুদী ধর্মের একটা ক্ষুদ্র সেক্টের বেশি ভাবা হতো না। সেই সময় কেউ যদি এমনটা প্রেডিক্ট করতো যে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই খ্রিস্টধর্ম হবে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম---তাকে পাগল ছাড়া কিছু ভাবা হত না। আপনি যদি এখন প্রেডিক্ট করেন---২০৫০ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রধর্ম হবে হিন্দু ধর্ম---আপনার বন্ধুই আপনাকে বলবে, তোর মাথা ঠিক আছে তো? ১৯১৩ সালে বলশেভিকরা ছিল রাশিয়ার একটা ক্ষুদ্র উপদল। ধরেন আমাদের বামফ্রন্ট। এরা যে ৪ বছরের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটায়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতায় চলে আসবে---এটা ছিল কল্পনারও অতীত। আরব বেদুইনদের ধর্ম যে এদিকে দিল্লীর গেট আর ঐদিকে বসফরাস প্রণালী পর্যন্ত চলে আসবে---সেটাই বা কে ভেবেছিল?

আমরা যারা নিজেদের যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে ভাবতে ভালোবাসি---তারা মনে করি ইতিহাসও বোধ করি এই যুক্তির পথ ধরে চলবে। একটা ঘটনার ফলাফল হিসেবে আরেকটা ঘটনা ঘটবে। ইতিহাসের মশকরা হচ্ছে এই যে, ব্যাটা কোন যুক্তি-টুক্তির ধার ধারে না। কোন একটা সময়ে এতো বেশি ফোর্স কাজ করে আর এতো বেশি ভ্যারিয়েবল ইনভলভড থাকে---যে আপনি কোন ইকুয়েশন বা সিস্টেম অফ ইকুয়েশন দিয়েও গোটা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। ক্যাওসের অপর নাম এই ইতিহাস।

ক্যাওস দুই রকমের আছে। লেভেল ওয়ান ক্যাওস আর লেভেল টু ক্যাওস।

লেভেল ওয়ান ক্যাওস হচ্ছে সেইসব ঘটনা যা আপনার প্রেডিকশনকে থোড়াই কেয়ার করবে। আপনি যাই বাণী দেন না কেন, সে তার মত করে ঘটে যাবে। আবহাওয়া যেমন। বৃষ্টি হবে কি হবে না---এইটা প্রেডিক্ট করার জন্য আপনি হাজারটা কম্পিউটার মডেল খাড়া করাতে পারেন। সেই মডেলে আপনি যতো বেশি প্রিভিয়াস ইনপুট দিবেন, মডেল ততো এ্যাকিউরেট হবে। কিন্তু কখনোই ১০০% এ্যাকিউরেট হবে না।

লেভেল টু ক্যাওস হচ্ছে উল্টাটা। আপনার প্রেডিকশনকে সে পাত্তা দিবে। আর সেই মত রেসপন্স করবে। তেলের বাজার যেমন। ধরা যাক, আপনি অনেক খেটেখুটে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দাঁড় করাইলেন, যেটা তেলচক্র দামের ১০০% সঠিক প্রেডিকশন দিবে।

আজকে বাজারে তেলের দাম গ্যালন প্রতি ৪০০ টাকা। আপনার প্রোগ্রাম বললো, কালকে দাম বেড়ে ৫০০ টাকা হবে। কাজেই, দাম বাড়ার আগেই আপনি তেল কিনতে গেলেন স্টেশনে। আপনার মত আরো অনেকেই গেল। বিক্রেতা তো তেলের এই চাহিদা দেখে আজকেই দাম বাড়ায়ে ৫০০ টাকা করলো। খেয়াল করে দেখেন,

প্রোগ্রাম বলসিলো--- কাল দাম বেড়ে হবে ৫০০ টাকা। আপনাদের তাড়াহুড়ার কারণে সেটা আজকেই ৫০০ টাকা হয়ে গেল। ১০০% এ্যাকিউরেট প্রোগ্রাম কিন্তু এখানে ফেল মারলো!

তেলের বাজার আর রাজার বাজারে এইখানে কোন তফাৎ নাই। অনেকে আরব বা মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের দোষ দেয়--তারা কেন আরব বসন্তের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলো না। আরে বাবা, কোন বিপ্লবই ভবিষ্যদ্বাণী মেনে হয় না। এটা ইউসুফ নবীর সময় না যে, আপনি আগে থেকে দুর্ভিক্ষের প্রেডিকশন করে রাখবেন, সেই মত খাদ্যশস্য জমায়ে রাখবেন আর দুর্ভিক্ষ এলে সেই শস্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করবেন।

আর ধরা যাক, আমরা কোন এক পলিটিক্যাল জিনিয়াসের সন্ধান পেয়েছি। যিনি ইউসুফ নবীর মতই ভবিষ্যৎ দেখেন। ২০১০ সালে (আরব স্প্রিং এর এক বছর আগে) তিনি মিশর প্রধান হোসনি মোবারকের কাছ থেকে টেকাটুকা খেয়ে একটা পলিটিকাল এলগরিদম দাঁড় করালেন। প্রোগ্রাম রান করে তিনি মোবারককে এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সামনের বছর একটা বিপ্লব হতে যাচ্ছে। মোবারক গদিচ্যুত হবি। কাজেই, সাধু সাবধান!

মোবারক তখন কী করবে? সে ট্যাক্স কমায়ে দিবে, দরকার হলে নিজে না খেয়ে জনগণের বেতন বাড়ায়ে দিবে, যেন তারা সুখে-শান্তিতে থাকে। আর, জাস্ট ইন কেস, গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারি বাড়াবে। পোলাপান ভার্সিটিতে কী নিয়া কথা বলতেসে, ফেসবুকে কী স্ট্যাটাস দিতেসে, টুইটারে কী টুইট করতেসে---এগুলো চোখে চোখে রাখবে।

ঠিকঠাক পদক্ষেপ নিয়ে দেখা গেল, পরের বছর আর বিপ্লব হইলো না। মোবারক তখন আধুনিক জোসেফকে ধরবে। বলবেঃ "চুলের প্রোগ্রাম বানাইসো তুমি। আমার টাকা ফেরত দেও। এই টাকা দিয়া আমি আরেকটা রাজমহল বানাইতে পারতাম।" মোবারক তো আর এইটা বুঝবে না, যে ডিজিটাল জোসেফ প্রেডিক্ট করসিলো দেখেই বিপ্লবটা আর হয় নাই।

কথা হচ্ছে, এরকম ডিজিটাল জোসেফের কথা আমরা থিওরেটিক্যালী-ই বলতে পারি। বাস্তবে এদের সন্ধান পাই না। ইতিহাসবিদরা কখনোই ঠিকঠাক ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন না। ইতিহাসের এতো এতো নলেজ নিয়েও পারেন না।

কারণ, ইতিহাস ফিজিক্স না। যে সবকিছু আপনি একটা ফর্মুলার মধ্যে ফেলে দিবেন। তাহলে ইতিহাস পড়ে আমাদের লাভটা কী? ইতিহাস থেকে আমরা যখন শিক্ষাই নিতে পারি না। কিংবা নিলেও সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে পারি না।

লাভ একটাই। আমাদের চিন্তাভাবনার পরিধিটা বড় করা। এটা বোঝা--যা হইসে, সেটাই একমাত্র পসিবিলিটি ছিল না। আরো হাজারটা পসিবিলিটি ছিল যা হতে পারতো। ইউরোপীয়ানরা আমাদের ডমিনেট করসে। শাদারা করসে কালোদের। এটা চিরায়ত কিছু না বা প্রকৃতির কোন নিয়ম না যে শাদারা কালোদের প্রভু হবে। কিংবা আমাদের ইউরোপীয়দের ফলো করতে হবে। উল্টাটাও হতে পারতো। কিংবা কালই হতে পারে। জাস্ট এখনো হয় নাই আর কি!

আট কিস্তি এক
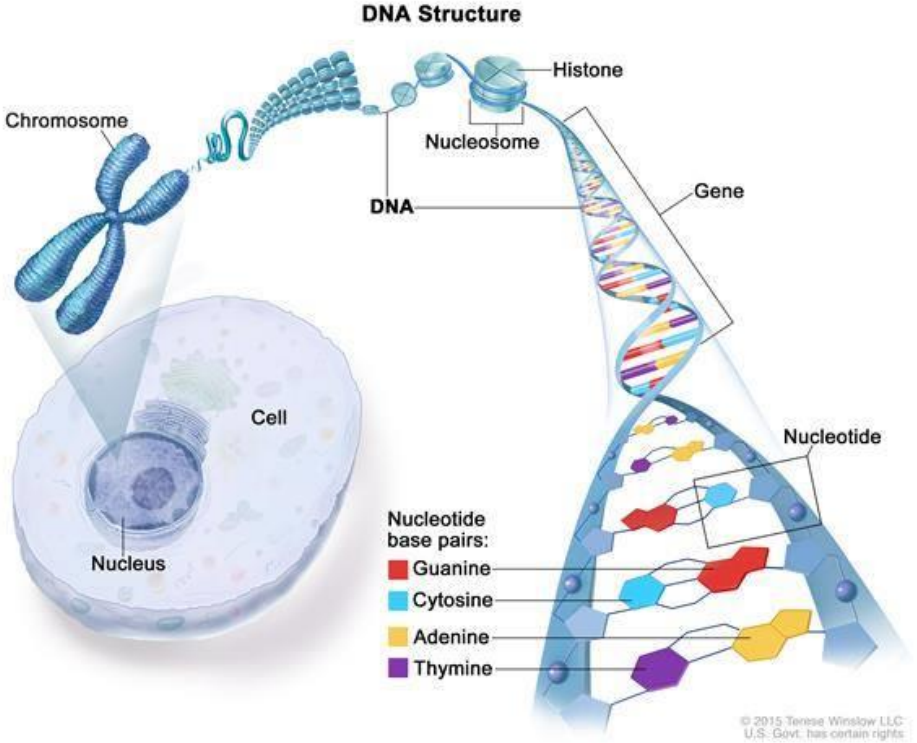
জিন মাত্রই স্বার্থপর! সেটা বংশগতির জিনই হোক আর কালচারাল জিনই হোক।

কালচারাল জিনের আবার বলিহারি একটা নাম আছে। ১৯৭৬ সালে রিচার্ড ডকিন্স তার 'The Selfish Gene' বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারে এই নতুন প্রকার জিনের সাথে

আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এই জিনের নাম 'Meme'। মেমে নয়, মিমি নয়। মিম। এই জিনের নাম মিম।

সফল জিন যেমন মানষের শরীরকে আশ্রয় করে কাল জয় করে টিকে থাকে, মিমও তেমনি মানুষের মনকে আশ্রয় করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। মানুষ মরে যায়। জিন ঠিকই তার সন্তানের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়। মানুষ মরে গিয়ে ভূত হয়। সফল মিম ঠিকই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলে।
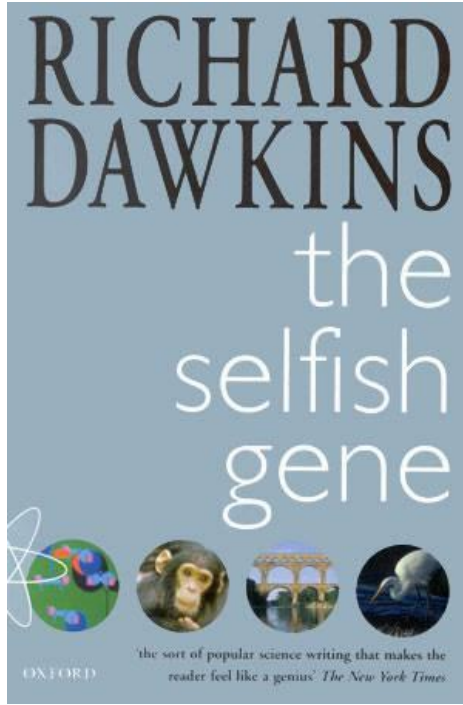
ডকিন্সখুড়ো আমাদের বলেন, মিম হল একটা কালচারাল ইনফরমেশন। ভাইরাসের মতই এটা আমাদের মনে বাসা বাঁধে। দিনে দিনে আমাদের দেহ মন দুর্বল করে দেয়। আর নিজে শক্তিশালী হয়। ভাইরাস বলে কয়ে আমাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে। মিমও অনেক সময় সেটাই করে। তবে আমাদের অবচেতনে। ইসলামী

খেলাফত কায়েম হবে কিংবা প্রলেতারিয়েতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে---এই মিমগুলোর কবলে পড়ে আমরা তাই হাসিমুখে মৃত্যুকে ডেকে আনি।

ছোটবেলায় কারো ভাইরাস জ্বর হলে আমরা দিন কয়েক স্কুলে যেতাম না। গেলে যদি সবার মধ্যে ঐ ভাইরাস ছড়িয়ে যায়। মিমের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম খাটে না। সেলফি ম্যানিয়া যেমন এক রকমের ভাইরাস বা মিম। এখন কেউ সেলফি রোগে আক্রান্ত হলে তার মা নিশ্চয়ই তাকে বলবে না---"দিন দুয়েক স্কুলে যাস না। সবার মধ্যে রোগ ছড়ায়ে দিবি।" বরং সে বিপুল উৎসাহে মাঠে-ঘাটে-লরিতে-বাসে সেলফি-কুলফি-ঈদফি-পূজাফি সব রকমের ভাইরাস ছড়াতে শুরু করে। কেউ তাতে বাধাও দেবে না।
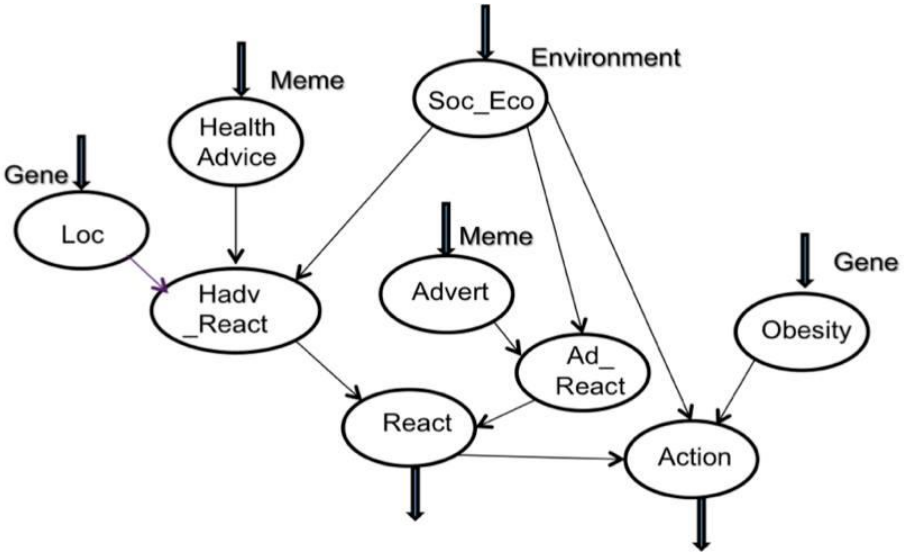
ইন্টারনেটে যে মিমের দেখা আমরা পাই, তা এই ডকিন্সখুড়র মিমেরই সংকীর্ণ ভার্সন। মুশাররফ করিম যখন বলেন, খোদা দড়ি ফালাও, বায়া উঠি যাই কিংবা বন্ধুদের আপনি যখন ফ্রেন্ডস না বলে ফ্রান্স বলে সম্বোধন করেন---এরা প্রত্যেকেই

এক এক জন সফল মিম। এদের নিজেদেরে একটা জীবন আছে, জীবনচক্র আছে। কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বল্পায়ু।

সমস্যা হচ্ছে, এই মিম থিওরি অনেকে হজম করতে পারেন না। সোশ্যাল ডিনামিক্স ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের পছন্দ গেম থিওরি।

গেম থিওরির কী---বোঝার জন্য একটা উদাহরণটা দিই। খুবই পপুলার এগজাম্পল। Prisoners dilemma একে বলে। অনেকেই শুনে থাকবেন। তাও বলি।

ধরেন, আপনাকে আর আপনার এক বন্ধুকে জঙ্গী সন্দেহে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। দুটো আলাদা কক্ষে আপনাদের জেরা করা হল। আপনাদের দু'জনকেই একটা প্যাকেজ অফার করা হল। যদি দু'জনের কেউই দোষ স্বীকার না করেন, তাহলে দু'জনকেই এক বছরের জেল দেয়া হবে। যদি আপনি রাজসাক্ষী হন আর আপনার বন্ধুকে ফাঁসিয়ে দেন, সেই সাথে আপনার বন্ধু চুপচাপ থাকে, তাহলে আপনার সাজা মওকুফ। আর আপনার বন্ধুকে তিন বছরের জেল দেয়া হবে। এবং ভাইস ভার্সা। আর দুইজনই যদি দুইজনকে ফাঁসিয়ে দেন, তাহলে দু'জনেরই দুই বছর করে জেল হবে।

এখন আপনি কী করবেন? বেস্ট হচ্ছে দু'জনই চুপ থাকা। তাহলে দু'জনেরই এক বছর করে জেল হবে। কিন্তু আপনার বন্ধুও যে চুপ থাকবে---তার গ্যারান্টি কী? আপনি চুপ থাকলেন আর আপনার দোস্তো আপনাকে ফাঁসিয়ে দিল---সেক্ষেত্রে তো আপনার তিন বছরের জেল হবে। সেফ থাকার জন্য আপনি আপনার বন্ধুকে ফাঁসিয়ে দিলেন। আপনার বন্ধু বোকাচ্চো হলে আপনার ভাগ্য ভাল। ধেই ধেই করে জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন। আর সে তিন বছর জেলে পুড়ে মরবে। কিন্তু সেও যদি আপনাকে ফাঁসিয়ে দেয়! তখন দু'জনই দু'বছর ধরে জেলের ঘানি টানবেন।

খেয়াল করে দেখেন, সেইফ খেলতে গিয়ে আপনি নিজের কিছুটা হলেও ক্ষতি করছেন। গেইম থিওররি মূলকথা এটাই। নিজেদের ক্ষতি হবে জেনেও আমরা এমন কিছু করি, যাতে অন্যেরও অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়। নিজের ক্ষতিটুকু তখন আর অতো গায়ে লাগে না।

বাস্তব জীবনটাও এমনই। আপনাকে সবসময়ই এমন দুটো অপশন দেয়া হবে যার একটা খারাপ আর একটা বেশি খারাপ। আপনি তখন মন্দের ভালোটাকেই বেছে নিতে বাধ্য হবেন। বাংলাদেশ বা আমেরিকার নির্বাচনে যেটা বরাবরই হয়ে আসছে। ভালো অপশন বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। 'ভালো' একটা মিথ।

অস্ত্রের দৌড়ই ধরি না কেন! এই দৌড়ে কারোরই কোন লাভ হয় না। উলটা দেশ, জনগণ---সবাই পথে বসে। তাও রাষ্ট্র সেইফ থাকার জন্য এই দৌড়ের লোভ সামলাতে পারে না। পাকিস্তান যখন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনে, তখন ভারতও কিনতে বাধ্য হয়। নাইলে মান সম্মান থাকে না। আবার ভারত যখন পারমাণবিক বোমা বানায়, তখন পাকিস্তানও তার জনগণকে না খাইয়ে না পড়িয়ে হলেও বোমা বানায়। দিন শেষে দু'জনের এ্যাবসোলিউট ক্ষমতা আগের চেয়ে বাড়ে হয়তো, রিলেটিভ ক্ষমতা আগে যা ছিল--তাই থাকে। মাঝখানে অস্ত্রের দৌড়ের জয় হয়। ভাইরাস যেভাবে নিজেকে বিস্তার করে, অস্ত্রের দৌড়ও আমাদের মাথায় কিলবিল কিলবিল করে নিজেকে বিস্তার করে নেয়।

সোজা কথা হচ্ছে, কেউ আমাদের ভাল চায় না। সে গেমই হোক আর মিম-ই হোক। সবাই যার যার ধান্দায় ব্যস্ত। সারাজীবন নিজেদের স্বার্থে আমাদের ইউজ করে কেবল; আর ইউজ শেষ হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

আট কিস্তি দুই

দাইদ্যালুস ও আইকারুসের গল্প তো আমরা সবাই জানি।

ঐ যে! রাজার রোষ থেকে বাঁচার জন্য দাইদ্যালুস মোমের তৈরি পাখায় ভর করে আকাশপথে সমুদ্র পাড়ি দেবার প্ল্যান করে। ছেলে আইকারুসকে নিয়ে পাখার পিঠে চড়েও বসে। আইকারুস ছেলে মানুষ। রক্তে তারুণ্যের বান। সে অতি আবেগে আপ্লুত হয়ে সেই ডানায় করে সূর্যের কাছাকাছি চলে যায়। ফলাফল, সূর্যের তাপে তার ডানা ভস্ম হয়ে যায়।

সাথে মানুষের আকাশ পাড়ি দেবার স্বপ্নটাও।

আকাশে ওরা জিবরাইলের কাজ, ইকারাসের নয়। মানুষ যখনই ঈশ্বরের ক্ষমতাকে এভাবে ছুঁতে চেষ্টা করেছে, তখনই সে ধ্বংস হয়েছে। তাকে ইনডিরেক্টলি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে---তুমি সামান্য মানুষ। এসব তোমার কাজ নয়।

তবু মানুষ বারবার বিপথে গেছে। নূহের বন্যার অনেক দিন পর তার বংশধররা শিনার নামে এক জায়গায় বসতি গড়ে। এই সবুজকে কেন্দ্র করে তারা একটা শহর গড়বার স্বপ্ন দেখে। সেই শহরের মধ্যিখানে থাকবে এক আকাশছোঁয়া মন্দির।

ঈশ্বর ভাবলেন---আমাকে ছোঁবে? এতো বড় সাহস। ঈশ্বরের অহমে ঘা লাগলো। তিনি ঠিক করলেন, এই প্ল্যান ভেস্তে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই বন্যা বা ভূমিকম্প দিয়ে এই প্ল্যান ভেস্তে দিতে পারতেন। তিনি তা করলেন না। উনি এক সূক্ষ্ম চাতুরির আশ্রয় নিলেন এইবার।

সেকালে দুনিয়ার সব মানুষ একই ভাষায় কথা বলতো। ঈশ্বর তাদের মুখে নানা রকম জবান ঢুকিয়ে দিলেন। যে শ্রমিকেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিল, তারা আর একে অন্যের কথা বুঝতে পারলো না। ইট আনতে বললে আনে বালু, বালু আনতে বললে সুড়কি। তৈরি হল ব্যাপক কনফিউশন।

অগত্যা মন্দির নির্মাণের চেষ্টা বাদ দিয়ে এক এক দল এক এক দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। ঈশ্বর থাকেন উঁচুতে। অনেক উঁচুতে। বোঝা গেল, তার উচ্চতায় পৌঁছানোর চেষ্টা কখনোই ভালো ফল বয়ে আনে না।

এখানেই শেষ নয়। এমন চেষ্টা ঈশ্বরের প্রিয় বান্দা ইহুদীরাও করেছিল।

ঈশ্বর কাদামাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করেছেন। সেই মানুষ কথা বলে, হাঁটে, টুকটাক কাজকর্মও করে। মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ঈশ্বর হওয়া? সেও কি পারবে কাদামাটি দিয়ে এমন কিছু তৈরি করতে যে কথা বলবে, হাঁটবে, টুকটাক কাজকর্মও করবে?

ইহুদীদের পুরাণ বলে, হ্যাঁ। সম্ভব। ইহুদী পুরাণে তাই গোলেম নামক এক সৃষ্টির কথা বারবার এসেছে। (গোলামের সাথে মিল পাচ্ছেন কি?)

ইহুদী পুরাণ বলে, খোদা স্রেফ মুখের কথা দিয়ে মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি বললেন, "হও"। আর হয়ে গেছে। ইহুদী মিস্টিসিস্টরা ঠিক একই রেসিপিতে গোলেম তৈরি করতে চাইলেন। এক চা চামচে এক মুঠ বালি নিয়ে তাতে যথাযথ মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে সেই বালু থেকে শূন্যের মধ্যে গজিয়ে উঠবে একটি মূর্তি।

গোলেম কাহিনীর সবচেয়ে বাজার চলতি ভার্সনটা পাওয়া যায় প্রাগে।

মধ্যযুগের কথা। সেখানকার এক র‍্যাবাই (ইহুদী হুজুর) মন্ত্রতন্ত্র পড়ে গোলেম তৈরিই করে ফেললেন। কিন্তু গোলেমের সাইজ তার নিয়ন্ত্রণে থাকলো না। বড় হতে হতে সেটার মাথা ছাদ ছুঁইয়ে ফেলছিলো প্রায়। র‍্যাবাই তো দেখেন সর্বনাশ। বাড়িঘর সব ভেঙে তার মাথার উপর পড়বে।

তিনি তখন বুদ্ধি করে একে মাথা নিচু করে তার জুতার ফিতা বাঁধতে বলেন। যখনই মাথা নিচু করে তার হাতের নাগালে আসবে, তখনই তার কপাল থেকে ম্যাজিক সিম্বলটি খুলে নিবেন। এই ম্যাজিক সিম্বলই যতো নষ্টের গোড়া। এটা খুলে নিলে ব্যাটা মাটির তাল ছাড়া আর কিছুই না।

এইখানেই র‍্যাবাই ভুল করে ফেললেন। সিম্বলটি উঠিয়ে নেয়া মাত্র গোলেমটি হুড়মুড় করে র‍্যাবাইর মাথায় ভেঙে পরে। সৃষ্টির হাতে মৃত্যু হয় স্রষ্টার।

এই গল্পের আরেকটা ভার্সন আছে। প্রাগ থেকে তখন ইহুদীদের তাড়িয়ে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র চলছিলো। র‍্যাবাই মহারাল ভাবলেন, এই গোলেমের সাহায্যে তিনি ইহুদীদের রক্ষা করবেন। করলেনও। প্রাগে ইহুদীরা থেকে গেলো।

গোলটা বাঁধলো অন্য জায়গায়। শনিবার ছিল ইহুদীদের জুম্মাবার। শুক্রবার সন্ধ্যায় র‍্যাবাই গোলেমকে লক করে রাখতেন। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি এটা করতে ভুলে গেলেন।

এর মধ্যে কেউ একজন গোলেমের বুকের ম্যাজিক সিম্বল চুরি করতে গেলে সে রেগে যায়। রেগেমেগে সে ঘেটোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দাউদাউ করে চারদিক জ্বলতে থাকে।

মরাল অফ দ্যা স্টোরি---মানুষ যতোবারই গোলেম বানাতে গেছে, সফল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই গোলেমকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারেনি।

পুরাণ এইভাবে মানুষকে তার সীমাবদ্ধতার কথা, তার দুর্বলতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। প্যারাডক্সটা হচ্ছে এই যে, মানুষ পুরাণকথা শুনতে চায়। কিন্তু মিথ বা পুরাণকাহিনী শুনিয়ে তাকে ডিমোটিভেট করা যায় না। সে আকাশে উড়বেই।

আজ মানুষ স্পেসশিপে করে চাঁদে গিয়েছে। মঙ্গলে যাচ্ছে। ইকারাসের মত ঝলসে যায়নি। বুর্জ খলিফা বানিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। আরব ভূমিতে এসে ইংরেজভাষী ডিজাইনার এটা বানিয়ে গেছে। ভাষা এখানে কোন বাধাই হয়ে দাঁড়ায়নি। আর

গোলেম তো আমরা হরদম দেখি। আপনি যে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সামনে বসে আছেন, সেও এক রকমের গোলেম। আর সবচেয়ে বড় গোলেম হচ্ছে রোবট।

মানুষ বরাবরই চেয়েছে ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে। আধুনিক মানুষ সেটা পেরেছেও। বিজ্ঞান নামক ম্যাজিক বাক্সকে সঙ্গী করে একে একে সব অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে।

যে ডিপার্টমেন্টগুলো একদিন ছিল ঈশ্বরের একান্ত নিজস্ব, মানুষ সেই সব ডিপার্টমেন্টে হানা দিয়েছে। বজ্র যেমন ছিল ঈশ্বরের অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে পাপী তাপীদের ঘায়েল করতেন তিনি।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বজ্রপাতের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে প্রমাণ করলেন, বজ্র আর কিছুই না। ইলেকট্রিক কারেন্ট মাত্র। ইলেকট্রিসিটির মূলনীতি কাজে লাগিয়ে তৈরি করলেন বজ্রনিরোধক দণ্ড। ঈশ্বরের অস্ত্র এবার মানুষের হাতে চলে এল। বিদ্যুতের সোল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর থেকে এখতিয়ার হারালেন মহামান্য ঈশ্বর।

মানুষের ইতিহাস তাই ঈশ্বরের নিরস্ত্র হবার ইতিহাস।

পৃথিবীর ইতিহাস ঈশ্বরের ক্ষমতায় মানুষের ভাগ বসানোর ইতিহাস।

আট কিস্তি শেষ

আমাদের দেশে প্রশ্ন করাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। অজ্ঞতাকে তো না-ই। অজ্ঞতা এক রকমের অপরাধ এইখানে। যে টপিকটা স্কুলে শিখে আসার কথা, সেটা ঠিকঠাক শিখে না আসলে কলেজে এসে আমাদের স্যারদের হাতে নাকানিচুবানি খাইতে হয়। "এইটা জানো না? স্কুলে কী শিখসো তাইলে?" কিংবা "স্কুলের স্যাররা কী শিখাইসে?"---এগুলো তো খুবই কমন কোশ্চেন। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জব লাইফ পর্যন্ত অজ্ঞতাকে উপহাস করার এই সাইকেল চলতে থাকে।

আমরা যতোটা সময় শেখা বা শেখানোয় ব্যয় করি, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করি অন্যের অজ্ঞতা নিয়ে উপহাস করায়।

আমাদের দেশে যেখানে অজ্ঞতাকে উপহাস করা হয়, পশ্চিমে সেখানে অজ্ঞতাকে রীতিমত সেলিব্রেট করা হয়। আমাদের এখানে প্রশ্ন করা যেখানে পাপ, পশ্চিম সেখানে প্রশ্নের জন্য মুখিয়ে থাকে। সে যতো লেইম প্রশ্নই হোক না কেন! আমাদের ল্যাবে তো একটা কথা প্রায়ই বলা হয়---No question is a silly question. জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েও যে তোমার অনেক কিছুই অজানা থাকতে পারে---এইটুকু মনে করিয়ে দিতেই এই রিমাইন্ডার।

পশ্চিমা সভ্যতা ফল করতেসে সবাই বলে। তারপরও আমরা পশ্চিমেই যেতে চাই। পূর্বে না। তার একটা বড় কারণ বোধয় প্রশ্ন করার এই অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাটুকু আছে বলেই নোয়াম চমস্কির মত স্ট্রাকচারের বাইরের মানুষরাও এখানে

খেয়েপরে বাঁচতে পারেন, কেউ তাদের গলা কাটতে আসে না। এইটুকু স্বাধীনতাটুকু যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন পশ্চিম চোখ বুঁজে পৃথিবীকে লীড করবে।

হ্যাঁ, সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মেই হয়তো এই সভ্যতাও একদিন ফল করবে। যেমনটা করেছিল রোমান বা অটোমান সভ্যতা। তবু রোমান বা অটোমানদের সাথে এই সভ্যতার একটা বেসিক পার্থক্য আছে। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞানকে সম্বল করে। বিজ্ঞান আমাদের যে টুলগুলো দিয়েছে, সেই টুলগুলোকে নয়, যে নতুন চিন্তাধারা দিয়েছে সেই চিন্তাধারাকে সম্বল করে।

আধুনিক বিজ্ঞান কখনোই বলে না যে---আমরা সব কিছু জানি। বরং বারবার এটাই বলে যে, 'আমরা অনেক কিছুই জানি না'। না জানাটাই সুন্দর। না জানাটাই পবিত্র। কেননা, 'জানি না', এটা যখন স্বীকার করবো---তখনই নতুন কিছু জানার আগ্রহ তৈরি হবে।

জানি না---এই বোধ যখন আমার মধ্যে আসবে, তখনই আমি জানার জন্য নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবো। ডাটা কালেক্ট করবো। ম্যাথমেটিক্যাল টুলের সাহায্যে সেই ডাটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। আর আধুনিক বিজ্ঞান এইখানেই থেমে থাকে না। সে নলেজকে কাজে লাগিয়ে সে নতুন নতুন অস্ত্র বানায়। অস্ত্র মানে খালি AK-47 না। টেলিভিশন এক রকমের অস্ত্র। ওষুধ এক রকমের অস্ত্র। হালের ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানও এক রকমের অস্ত্র যদি আপনি কাজে লাগাইতে পারেন!

আধুনিক বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, সেটা আসলে জ্ঞানের বিপ্লব না। সেটা অজ্ঞতার বিপ্লব। মানুষ বিপুল উৎসাহে আবিষ্কার করসে---সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্নগুলোর উত্তরই তার জানা নাই। কাজেই, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে সে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

অজ্ঞতা আবার দুই রকমের। ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়ে অজ্ঞতা। আর আনইম্পর্ট্যান্ট বিষয়ে অজ্ঞতা।

ইম্পর্ট্যান্ট কিছু তোমার জানা নাই থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, তুমি জ্ঞানী কোন লোকের কাছে যাবা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে। আমি সামান্য মানুষ। দিন আনি দিন খাই। এখন আমার মনেও তো প্রশ্ন আসতে পারে---এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমনে তৈরি হইলো? ৫০০ বছর আগে হইলে আমি প্রশ্নের উত্তর জানতে চলে যাইতাম এলাকার হুজুরের কাছে। তিনি কোরান ঘেঁটে আমাকে হয়তো একটা জবাব দিতেন।

ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়ের জ্ঞান না হয় জ্ঞানীগুণীদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। আনইম্পর্ট্যান্ট যে বিষয়গুলা---ওগুলা জানা যাবে কীভাবে? কিছু আজাইরা বিষয় আছে, যেগুলো হয়তো সমাজের কেউই, একজন আদম সন্তানও জানে না। কিন্তু ঐ বিষয়েও তো কারো জানার আগ্রহ থাকতে পারে।

ধরেন, মাকড়সা কেমনে জাল বোনে, কবে থেকে কী পরিস্থিতিতে তারা জাল বোনা শুরু করসে---এটা আমার জানার খুব ইচ্ছা। এলাকার হুজুরকে এটা জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই। কেননা, কোরানে এর কোন জবাব নেই। তার মানে এই না যে, কোরান একটা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। তার মানে এই যে, এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়া আল্লাহ মাথা ঘামান নাই। কাজেই, এইসব আজাইরা বিষয় আমাদের না জানলেও চলবে।

আধুনিক বিজ্ঞান অজ্ঞতার এই ধারণাকে অস্বীকার করে। সে বলে, মাকড়সা কেমনে জাল বোনে---এর মধ্যেও অনেক অনেক রহস্য লুকায়ে থাকতে পারে। কাজেই এর গবেষণার পিছনেও সে মিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি আছে।

মুহম্মদের দেয়া জীবন পদ্ধতিকে আমরা সর্বশেষ way of life বলে জানি। আমরা কীভাবে জীবন যাপন করবো--তার সব কিছু এখানে বলে দেয়া হয়েছে। মুহম্মদের

মধ্য দিয়ে তাই নবী-রাসূল আর যে পাইপলাইন, তা রোধ করে দেয়া হয়েছে। একে আমরা 'খতমে নবুওয়্যত' বলে জানি।
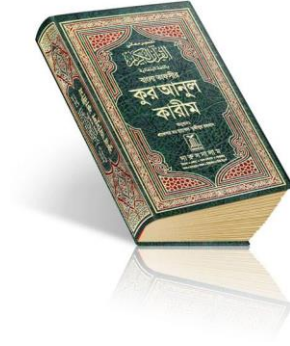
আধুনিক বিজ্ঞানে এই 'খতম' ব্যাপারটার কোন স্থান নেই। সে কখনো বলে না, যে ডারউইনের মধ্য দিয়ে 'খতমে বায়োলজিত' হয়েছে। কিংবা আইন্সটাইনের মধ্য দিয়ে 'খতমে ফিজিক্সত' হয়েছে। কেননা, ব্রেন কীভাবে ডেভেলপ করেছে আমরা জানি, কিন্তু এই ব্রেন কীভাবে আমাদের মধ্যে বোধ বা চেতনা তৈরি করে---আমরা জানি না। বিগ ব্যাং হয়েছে--আমরা জানি। কিন্তু কীভাবে এই বিগ ব্যাং হল---আমরা এখনো ঠিক জানি না।

স্বভাবতই, আধুনিক বিজ্ঞানে পীরবাদের কোন স্থান নেই। এইখানে নিউটনের পেপারের ভুল ধরেন আইনস্টাইন, আইনস্টাইনের পেপারের অন্য কেউ। নিউটন 'নিউটন' হইসেন বলে তার মন্দির বানায়া আমরা পূজা করবো---ব্যাপারটা এমন না। ব্যক্তি বা থিওরির পূজা এইখানে নিষিদ্ধ।

আধুনিক বিজ্ঞানের মজাটা এইখানেই। আপনি যতো ভালো থিওরিই দেন না কেন, বিজ্ঞানে ন্যূনতম জ্ঞান আছে, এমন যে কেউ তথ্য প্রমাণ নিয়ে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। ইকোনমিস্টদের যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় প্রায়ই। আপনি যতো ভালো ইকোনমিক মডেল নিয়েই আসেন না কেন, একটা ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইসিস বা শেয়ার বাজার ক্রাশের পর আপনাকে সবাই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই।

চ্যালেঞ্জ করার এই অধিকার আছে বলেই আধুনিক বিজ্ঞান এখনো এতো ডাইন্যামিক। নিজের অজ্ঞতাকে সে বুক ফুলিয়ে স্বীকার করে। অবশ্য এই ডাইন্যামিজম-এর কিছু সাইড ইফেক্টও আছে।

ধরা যাক, বিজ্ঞান প্রমাণ করলো যে আল্লাহ বলে কেউ নাই। এখন যে সোশ্যাল অর্ডার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতো---সে সমাজকে আপনি ধরে রাখবেন কীভাবে? সমাজকে ধরে রাখার জন্য তো একটা গল্প শুনাতে হবে। সেই গল্প আপনি পাবেন কই?

রাশিয়ানরা একটা গল্পের আশ্রয় নিসিলো। তারা বলতো, কার্ল মার্ক্স যে ইকোনমিক মডেল দিসেন---সেটাই পরম সত্য। এইটা দিয়েই আমাদের ইহকাল সুখে শান্তিতে চলে যাবে। আর পরকাল বলে তো কিছু নাই-ই। কাজেই, আমাদের আর অন্য সত্য খোঁজা লাগবে না। দুঃখজনকভাবে, এই গল্প বেশিদিন চলে নাই।

বেশি দিন চলে নাই জার্মান নাৎসিদের গল্পও। তারা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করে ফেলসিলো, যে তারাই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাত। নাৎসিরা বিজ্ঞান মানতো, কিন্তু বিজ্ঞানের সমালোচনা মানতো না। বিজ্ঞানের মূল সার যে কেবল আবিষ্কার না, আবিষ্কারের ক্রিটিসিজম শোনাও---এই তত্ত্বে তাদের বিশ্বাস ছিল না। ক্রিটিসিজম না শোনার ফলাফল তো তারা নিজে চোখেই দেখেছে।

আধুনিক সমাজ এই সমস্যার সমাধান করার জন্য লিবারেল হিউম্যানিজমকে বেছে নিয়েছে। বিজ্ঞান আর বিশ্বাস আলাদা থাকবে---এটাই এই চিন্তাধারার মূল কথা। এরা বলে, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মত চলুক। তুমি যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন বিশ্বাস নিয়ে থাকতে চাও তো থাকো। সেটা যদি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ও, বিজ্ঞান তাতে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

অধ্যায় নয় কিস্তি শূন্য
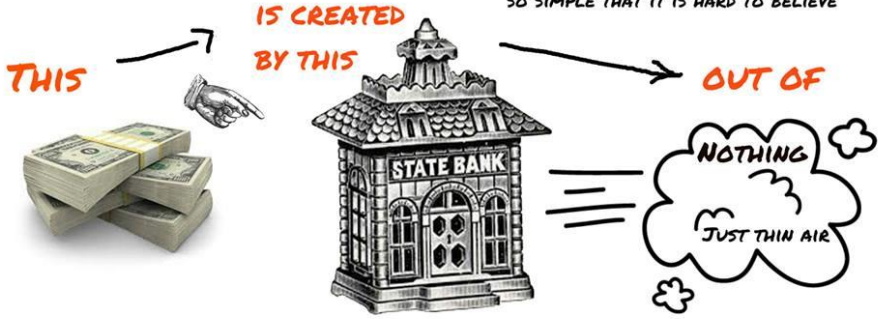
পাঁচশো বছর আগে গোটা পৃথিবীর মোট সম্পদের মূল্যমান ছিল ২৫০ বিলিয়ন ডলারের মত। আজ সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার।

কেবল মানুষ বাড়সে বলেই কি সম্পদের এই বিস্ফোরণ? উহুঁ।
সেসময় মাথা পিছু মানুষের উৎপাদন ছিল বছর প্রতি ৫৫০ ডলার। এখন যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮,৮০০ ডলার।

এই যে ভয়ানক গ্রোথ, এর পেছনে কারণটা কী?
কারণটা আর কিছুই না, আধুনিক অর্থনীতি। আধুনিক অর্থনীতি খুব জটিল একটা ব্যাপার। জটিল ব্যাপারকে সহজ করার জন্য একটা গল্প শোনাই বরং।
অনেকগুলা ক্যারেক্টার আছে এই গল্পে। দেইখেন, ট্র্যাক হারায়ে ফেইলেন না আবার!

সৈয়দ সাহেব খুবই উঁচু বংশের লোক। ঢাকা শহরে উনার একটা ব্যাঙ্ক আছে।
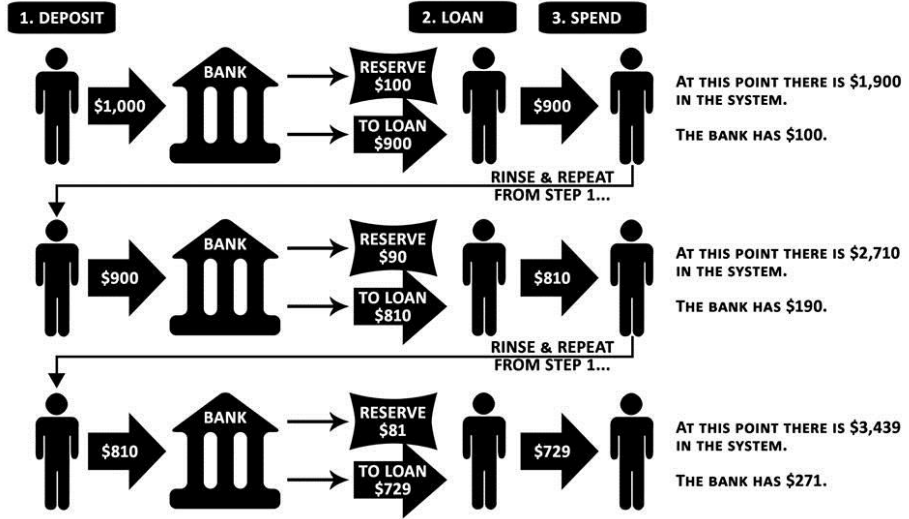
চৌধুরী সাহেব ঢাকা শহরেরই একজন উঠতি কন্ট্রাক্টর। একটা প্রজেক্টে উনি বিরাট লাভ করলেন। সেই লাভের ১ কোটি টাকা উনি সৈয়দ সাহেবের ব্যাঙ্কে রাখলেন। তার মানে সেই ব্যাঙ্কে এখন ১ কোটি টাকার ক্যাপিটাল আছে।

টমি মিয়া তখন ঢাকায় এলেন। এসে খেয়াল করলেন, তিনি শহরের যে অংশে থাকেন, ঐ অংশে কোন ভালো ভাতের হোটেল নাই। সব স্যান্ডউইচ, বার্গার আর ফ্রাইড রাইসে ভর্তি। নিখাদ ভাত-মাছের দোকান নাই কোন।

টমি মিয়া ঠিক করলেন, এইখানে একটা ভাতের হোটেল দিবেন। কিন্তু হোটেল যে দিবেন, তার জন্য তো টাকা লাগবে। সেই টাকা সে পাবে কই? সে গেলো ব্যাঙ্কের কাছে। ব্যাংকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বুঝাতে সক্ষম হল, যে এইখানে ভাতের হোটেল দিলে বেশ চলবে।

ব্যাঙ্ক তাকে ১ কোটি টাকা লোন দিল। সেই লোন দিয়ে সে কনট্রাক্টর ভাড়া করলো। কাকে করলো? সেই চৌধুরী সাহবেকে যে কিনা ব্যাঙ্কে টাকা রাখসিলো।
চৌধুরী সাহেব সেই টাকা ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করলো। এইখান থেকে সে দরকারমত চেক ভাঙিয়ে ইট-বালু, রড-সিমেন্ট যা দরকার কিনবে।
মজার ব্যাপার হল, চৌধুরী সাহেবের টাকাই আবার তার এ্যাকাউন্টে ফেরত আসছে। ব্যাঙ্কের হিসাব খাতা দেখাচ্ছে, চৌধুরী সাহেবের এ্যাকাউন্টে এখন ২ কোটি টাকা আছে। সত্যিকার ক্যাশ কিন্তু ঐ ১ কোটিই রয়ে গেছে। টাকা কিন্তু বাচ্চা দেয় নাই।
ঘটনা এইখানেই শেষ না। ২ মাস শেষে কিছুদূর কাজ আগানোর পর কনট্রাক্টর সাহেবের মনে হইলো, যে কাজটা শেষ করতে আরো টাকা লাগবে। সে আরো ১ কোটি টাকার বিল ধরায়ে দিল।
টমি মিয়া বিল দেখে বেজার হইলো। কিন্তু কাজ অনেকখানি আগায়ে গেছে। এখন আর ফেরৎ আসাও ঠিক হবে না। সে আবার ব্যাঙ্কে দৌড় দিলো। ম্যানেজারকে বুঝায়ে সুঝায়ে আরো ১ কোটি টাকা লোনের বন্দোবস্ত করলো। এই ১ কোটি কিন্তু সেই ১ কোটি যেটা কন্ট্র্যাক্টর রড-সিমেন্ট কিনবে বলে ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করে রেখেছিল।
যাই হোক, এই লোনের টাকা সে আবার কন্ট্রাক্টরের এ্যাকাউন্টে পাঠালো।
তো, কন্ট্রাক্টরের এ্যাকাউন্টে এখন কতো টাকা হল?
৩ কোটি টাকা। শুরুতে নিজের জমা করা ১ কোটি আর টমি মিয়ার দেয়া ২ কোটি। আর ব্যাঙ্কে সত্যিকার অর্থে ক্যাশ টাকা আছে কত? সেই ১ কোটিই। যেই ১ কোটি চৌধুরী সাহেব বহু আগে জমা করসিলো।

এই কাজটাই বর্তমান আমেরিকান ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ১০ বার করা যাবে। (বাংলাদেশের সিস্টেমে ক'বার করা যাবে---আমি জানি না। কেউ জানলে জানাবেন, প্লিজ) মানে কন্ট্রাক্টরের এ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকা দেখানোর জন্য ব্যাঙ্কের ভল্টে ১০ কোটি টাকা থাকা লাগবে না। ১ কোটি টাকা থাকলেই চলবে।

সোজা কথা, আমাদের সবার এ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা আছে, ঐ পরিমাণ ক্যাশ ব্যাঙ্কে নাই। এখন দেশে যদি একটা গুজব উঠে যে সামনে যুদ্ধ, ব্যাঙ্ক সব কল্যান্স করবে, ব্যাঙ্কে যার যত টাকা আছে সব উঠায়ে নেও আর দেশের সব মানুষ সেটা বিশ্বাস করে ব্যাঙ্কে টাকা উঠাতে যায়, ব্যাঙ্ক কিন্তু সবার টাকা ফেরত দিতে পারবে না। দিবে কোথ থেকে? থাকলে না দিবে!

এই ব্যাপারটাই ঘটসিলো It's a wonderful life এর নায়কের সাথে। তার ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে শুনে সবাই টাকা উঠাইতে চলে আসলো। এখন তার কাছে তো টাকা নাই। সে কাস্টোমারদের বুঝাইতেই পারে না, যে সে কোন টাকার ম্যাশিন না। সে একটা সিস্টেম মাত্র। সে X এর টাকা Y কে, Y এর টাকা Z কে আর Z এর টাকা X কে ধার দিয়ে এই সিস্টেমটা চালু রাখসে মাত্র।

এখন এইটাকে আপনি ভণ্ডামি বলতে পারেন। তাহলে গোটা আধুনিক অর্থনীতিই একটা বিরাট ভণ্ডামি।

এক ভণ্ডামি না বলে বরং বলা যায়, ভবিষ্যতের উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস। সৈয়দ সাহেব বিশ্বাস করে যে, টমি মিয়ার হোটেল একবার চালু হয়ে গেলে সেখান থেকে লাখ লাখ টাকা মুনাফা আসবে। সেই প্রফিট থেকে সে আস্তে আস্তে তার ঋণ সুদাসলে শোধ করবে। এক বোল ভাতও সিদ্ধ হয় নাই---তার আগেই সে তাই এই ঝুঁকি নিতে রাজি হইসে।

এই ব্যাপারটাকে আজ আমরা বলি Credit. ল্যাটিন Credo শব্দ থেকে এটা আসছে। এর মানে I trust you. বিশ্বাসটা যতোটা না একজন মানুষের উপর আরেকজনের, তার চেয়ে অনেক বেশি একটা সুখী, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। ব্যাঙ্কার আর হোটেলওয়ালা---দুই জনই একই স্বপ্নে বিশ্বাস করে বলেই এই গোটা সিস্টেমটা কাজ করতেসে। ঐ বিশ্বাসটুকু না থাকলে সিস্টেমটা মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে।

ব্যাঙ্ক যদি টমি মিয়াকে লোন না দিত, তখন সে কী করতো? সে এমন কোন কনট্রাক্টর খুঁজে বের করতো, যে কিনা নিজের টাকায় তার হোটেলটা করে দিবে। পরে হোটেল লাভ করা শুরু করলে তার পেমেন্টটা নিবে। সমস্যা হল, এমন কনট্রাক্টর পাওয়া ভূ-ভারতে সম্ভব না। কাজেই, তার হোটেলও বানানো হবে না। হোটেল না হলে মানুষ খেতে আসবে না। তার ট্যাঁকে পয়সা আসবে না। পয়সা ছাড়া সে কন্ট্রাক্টর পাবে না। আর কনট্রাক্টর ছাড়া তার স্বপ্নের হোটেলও হবে না।

যুগের পর যুগ ধরে মানুষ 'না হবার' এই দুষ্টচক্রে বন্দী হয়ে ছিল। ইতালির কিছু মানুষ সামান্য Bench এ বসে ধার দেবার যে কালচার শুরু করেছিল, সেই কালচারই ফুলেফেঁপে Bank এর রূপ ধারণ করে মানুষকে এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করেছে। আমরা মনে করি, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। ব্যাংকারদের ফিলোসফি উল্টা। তাদের কথা হচ্ছে---আজকের দিন যেমন তেমন, সামনের দিন সোনার মতন!

ব্যাঙ্কগুলো আমাদের টাকা ধার দেয় না। ধার দেয় স্বপ্ন। এই স্বপ্নের কেনাবেঁচা করেই আমরা গড়ে তুলি আধুনিক সভ্যতা। বর্তমানকে বিক্রি করে কিনি সোনালী ভবিষ্যৎ।

নয় কিস্তি এক
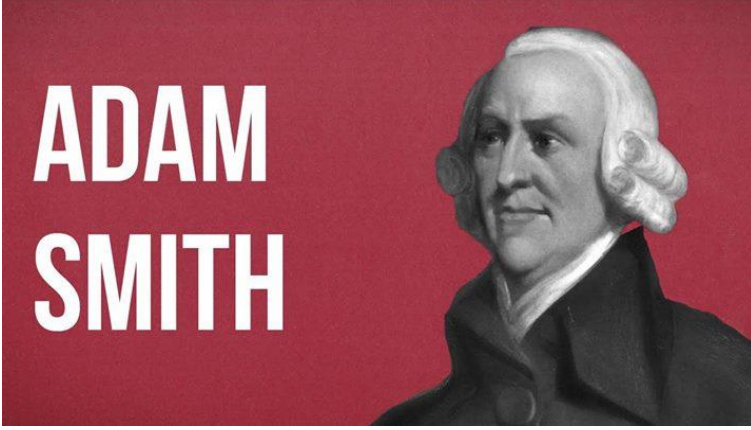
১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীন হয়। ঐ বছরই এডাম স্মিথ একটা দুর্দান্ত বই লেখেন। বইয়ের নাম The Wealth of Nations, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা বাদ দিলে এইটা আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ বই।

এই বইয়ের আট নম্বর চ্যাপ্টারে স্মিথ একটা সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়া নিয়ে হাজির হন। আইডিয়াটা এমনঃ ধরা যাক, পুরান ঢাকার ফজলু মামার মত আপনার একটা ছোটখাটো পিঠার দোকান আছে। নিজেই পিঠা বানান, নিজেই সেটা বেঁচেন। পিঠা বেঁচে আপনার কিছু লাভও হল।

এখন এই লাভ দিয়ে আপনি কী করবেন? বিড়ি-সিগারেট খেয়ে শেষ করবেন? না দোকানের বেচাবিক্রি বাড়ানোর জন্য কোন পিচ্চি আকা কুদ্দুস আকা বাবুল নিয়োগ করবেন?

যুগ যুগ ধরে ফজলু মামারা লাভের টাকা দিয়ে গাঁজায় দম দিয়ে সেটা উড়িয়ে আসতো। এডাম স্মিথ এসে মামাকে বললেন, তুমি এই টাকা দিয়ে একটা এ্যাসিস্ট্যান্ট রাখো, ব্যবসা বড় করো। লাভের টাকা দিয়ে মৌজ না করে সেটা আবার ইনভেস্ট করো। তাইলে খালি তোমার একার লাভ তা না, আশেপাশের দশটা মানুষেরও লাভ।

শুনে মনে হতে পারে, আরে, এ আর এমন কী আইডিয়া! এই আইডিয়া তো আমিও দিতে পারি। এডাম স্মিথের জায়গায় আমি থাকলে আজকে আমি অর্থনীতির জনক হইতে পারতাম।

আমাদের এমনটা মনে হচ্ছে। কারণ, আমরা ঠিক এই ক্যাপিটালিস্টিক সমাজের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। প্রাচীন মানুষ কিন্তু একটু টাকাপয়সা হলেই এই মৌজমাস্তির খপ্পরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেটা রোম সম্রাট ক্যালিগুলা থেকে শুরু করে মোগল বাদশা শাহজাহান পর্যন্ত সবাই। এডাম স্মিথ এসে এই দুষ্টচক্র ভাঙেন। তিনি আমাদের সূত্র দেনঃ সমাজের মোট সম্পদ স্ট্যাটিক কিছু না। বরং চেষ্টাচরিত্র করে একে বাড়ানো যেতেই পারে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের চেয়ে এই সূত্র তাই কোন অংশে কম শক্তিশালী না।

আমাদের ধর্মে, মিথোলজিতে সবসময়ই লোভকে খারাপ চোখে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। স্মিথই প্রথম আমাদের বলেন---Greed is good. তুমি যদি নিজের লাভের জন্য খাটো, লোভের জন্য খাটো--- তাইলে খালি নিজের না, সমাজেরই লাভ।

আচ্ছা, আমার ইচ্ছা আমি গরিব থাকবো। কার কী সমস্যা?
সমস্যা আছে। আমি গরিব থাকলে আমি বাজারের সেরা মোবাইলটা কিনতে পারবো না। তাইলে যেই লোক কষ্ট করে মোবাইলটা বানাইসে, সেও গরিব থাকবে। কারণ

তার তো বিক্রি হচ্ছে না। আর আমি বড়লোক হইলে আপনিও বড়লোক হবেন। কারণ, আপনার বানানো জিনিস তখন আমি কিনতে পারবো। এটাকে বলে উইন উইন সিচুয়েশন।

ধনবানদের পাপী হিসেবে দেখা আমাদের আরেকটা ট্রাডিশন। ধন আর পাপ মোটামুটি সমার্থক ব্যাপার। স্মিথ এইসব ট্রাডিশনাল ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি বলেন, বড়লোক মানেই পাপী না। বরং বড়লোক-ই ভালো। সে দশটা লোকের চাকরির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। স্বর্গের দরজা যদি খোলা হয়, তবে এই লোকটাই সবার আগে ঢুকবে। দিনরাত ইবাদত করা লোকটা তার পেছনেই থাকবে।

আমাদের অবশ্য ধারণা, আমি বড়লোক হতে হলে আশেপাশের সবাইকে দাবায়ে বড়লোক হতে হবে। স্মিথ এটারও বিরোধিতা করেন। স্মিথ বলেন, চাইলেই তুমি আশেপাশের সবাইকে নিয়েই বড়লোক হতে পারবা। লাভের গুড়টা নিজের পকেটে না পুরে সেই গুড় দিয়ে ফ্যাক্টরির সাইজ বাড়াও। নতুন প্রডাক্ট বানাও। নতুন প্রডাক্ট নিয়ে আসলে মানুষ সেটা খাবেই। তুমি দুধ-চা বানাতে। একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট রেখে মাল্টা চা-ও বানানো শুরু করো। দুধ চা-র বিক্রি তাতে কমবে না।

এইভাবে প্রডাক্ট ডাইভার্সিটি তৈরি করে মানুষের কনজামশন বাড়ানো সম্ভব। এটাই ক্যাপিটালিজম। এটাই পুঁজিবাদ। পুঁজির সাথে সম্পদের এইখানে পার্থক্য। মিশরের ফারাওরা পুঁজিবাদী ছিলেন না। তারা ছিলেন সম্পদবাদী। স্প্যানিশ যে নাবিকটা আমেরিকায় এসে কাড়ি কাড়ি স্বর্ণ লুট করে গেছে, সেও পুঁজিবাদী না। যে লোকটা কষ্ট করে মাস শেষে কিছু টাকা জমিয়ে সেই টাকা আবার শেয়ার বাজারে রি-ইনভেস্ট করে, সেই প্রকৃত পুঁজিবাদী।

মধ্যযুগ পর্যন্ত এই পুঁজিবাদীদের দেখা পাওয়া ছিল বিরল। মধ্যযুগের বড়লোকদের দেখেন। কী জমকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াইতো। আর এখনকার টাকার

মেশিনদের দেখেন। সামান্য জিন্স আর টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। অথচ আজকের জাকারবার্গদের সম্পদের পরিমাণ কিন্তু মিশরের যে কোন ফারাওর চেয়ে অনেক বেশিই হবে। সেসময় মানুষ দান খয়রাত করে পুণ্য কামাইতো। পকেটে টাকা বেশি হয়ে গেলে বউয়ের জন্য তাজমহল বানাইতো। আজকের পুঁজিপতিরা সেটাই করে লাভের টাকা আবার খাটিয়ে। সমাজে টাকার ফ্লো-টা ঠিক রেখে।

ফলাফল---মধ্যযুগে অভিজাত সমাজের কেন্দ্রে থাকা ডিউক আর নবাবদের সরিয়ে সেই জায়গাটা আজ দখল করে নিয়েছে ব্যবসায়ী আর পুঁজিপতিরা। যে মিডল ক্লাসের সুখ-দুঃখ আবেগ নিয়ে আমরা দিনরাত জিকির করি, সেই মিডল ক্লাসের জন্মও দিয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় আছর পড়সে বোধয় আধুনিক বিজ্ঞানের উপর। একটা রিসার্চ গ্রান্ট যখন লেখা হয়, তখন প্রথম যে প্রশ্নটা ফেস করতে হয়, তা হল---এই প্রজেক্টটার ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট কী? এইটা সমাজকে নতুন কিছু দিবে কিনা। বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান তখন মন খারাপ করে সাইড বেঞ্চে বসে থাকে।

আজ আমেরিকা, চীন অলমোস্ট শূন্য থেকে টাকা ছাপায়ে বাজারে ছাড়তেসে। এতো যে টাকা ছাড়তেসে---সমাজে সেই পরিমাণ সম্পদ তো তৈরি হচ্ছে না। তারপরও তারা কেন এই ঝুঁকিটা নিচ্ছে? তার কারণও বিজ্ঞানের উপর এই অগাধ বিশ্বাস। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিগগিরই ল্যাবগুলো থেকে নতুন নতুন সব ব্রেকথ্রু টেকনোলজি বের হবে। জন্ম নিবে নতুনতর সব ইন্ডাস্ট্রি। সামনে বাবল অবশ্যম্ভাবী। আর তা ঠেকানোর পুরো দায়িত্ব এখন এই বিজ্ঞানীদের। সারা দুনিয়া তাই তাকায়া আছে এই ল্যাবগুলোর দিকে। কখন তারা নতুন কিছু নিয়া আসবে আমাদের জন্য?

ব্যাঙ্কগুলো তো টাকা ছাপায়েই খালাস। এই টাকার আসল মূল্য তৈরি করে বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়াররাই।

নয় কিস্তি দুই

ইউরোপেই প্রথম ব্যবসায়ীরা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে শুরু করে। ব্যাপারটা এতো সহজে হয়নি। এর পেছনে কাজ করেছে এদের ক্রেডিট ইকোনমির সাফল্য।

কোন এক দুঃসাহসী লোক হয়তো মানুষজনের কাছে ধারকর্জ করে অজানার পথে পাড়ি দিল। সেখান থেকে সোনাদানা নিয়ে এসে আগের ধার ফেরত দিল। ফলে ব্যবসায়ী মহলে তার একটা ক্রেডিবিলিটি গড়ে উঠলো। পরে যখন সে আরো বড় অংকের ক্রেডিট এর জন্য এ্যাপ্লাই করলো, সেটা সহজেই মিললো। সেই টাকা দিয়ে আবার যাত্রা, আবারো লাভ, আবারো যাত্রা---এইভাবে চলতেই থাকলো। এমনকি সে নিজের লাভের টাকা থেকে অন্যকে ধারকর্জ দিতেও শুরু করলো। এইভাবে গোটা সমাজে একটা ক্রেডিট ফ্লো গড়ে উঠলো।

যে ক্রেডিট সিস্টেমের কথা আমরা বলছি, সেই ক্রেডিট সিস্টেম যে ইউরোপীয়দের একক আবিষ্কার---তা না। চায়না, ভারত এমনকি মুসলিম জাহানেও এর চল ছিল। আঠারো শতক পর্যন্ত তো পৃথিবীতে পুঁজির ভরকেন্দ্র এশিয়ার দিকেই হেলে ছিল।

কিন্তু প্রাচ্যের সমাজে ক্রেডিট সেই সম্মানটা পায়নি, যা সে পেয়েছে পশ্চিমে এসে। প্রাচ্যের হিরো ছিল নাদির শাহ'র মত খুনী। কিংবা অটোম্যানদের মত ব্যুরোক্র্যাটেরা। যাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স। ক্রেডিট আর বণিক---দুটোকেই এখানে খুব হেয় চোখে দেখা হত।

ইউরোপের রাজারা ওদিকে প্রাচ্যের শাসকদের মত 'খেয়ে ছেড়ে দিব' টাইপ চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে ব্যবসায়ীদের মত চিন্তাভাবনা শুরু করেন। কোথায়

ইনভেস্ট করলে লাভ হবে, কারে ধার দিলে সেটা দ্বিগুণ ফেরত আসবে---এই ওয়েতে। রাষ্ট্রকে তারা আর স্রেফ রাষ্ট্র রাখলেন না। একে একটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের আদলে চালাতে শুরু করলেন। যার মূল লক্ষ হচ্ছে প্রফিট।

শুরুটা করেন স্পেনের রাণী ইসাবেলা। কলম্বাসের যাত্রার পুরোটাই স্পন্সর করেন তিনি। কলম্বাস অবশ্য ফার্স্টেই ইসাবেলার দরবারে যাননি। তিনি গেছিলান পর্তুগাল রাজার দরবারে। পর্তুগাল সম্রাটকে কনভিন্স করতে ব্যর্থ হন তিনি। একজন সফল উদ্যোক্তার মতই তিনি থেমে যাননি। সাতঘাট ঘুরে অবশেষে ইসাবেলার মন জয় করতে সক্ষম হন তিনি। বোঝান, পৃথিবী গোল---এই তত্ত্বে যেহেতু আমাদের ঈমান আছে, সেহেতু পশ্চিমে যাত্রা করলে একদিন ঠিকই স্বর্গের ভারতে যাওয়া যাবে।

আজ আমরা জানি, স্পেন সেইবার বাজিমাৎ করেছিল। কলম্বাসের সফল অভিযানের পর ব্যাংকাররা এইসব অভিযানে ইনভেস্ট করতে আরো সাহস পান। স্পেন অবশ্য বেশিদিন এই সেক্টরে রাজত্ব করতে পারেনি। স্পেনের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে স্পেনেরই অধীনস্থ ডাচরা এই ক্রেডিট সেক্টরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ডাচরা ছিল স্পেনের খুবই ছোট্ট একটা উপনিবেশ। কেউ তাদের গোনাতেই ধরতো না। ১৫৬৮ সালে তারা স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মাত্র আট বছরের মধ্যেই তারা স্বাধীনতা তো পায়ই, সেই সাথে স্প্যানিশদের হটিয়ে পায় সমুদ্রপথে আধিপত্য।

এই আধিপত্য কোন নাদির শাহ বা কলম্বাস এনে দেয়নি ডাচদের। এনে দিয়েছে ডাচ ব্যাংকার আর ব্যবসায়ীরা। টাকাপয়সার ব্যাপারে ডাচদের একটা সুনাম ছিল ইউরোপে। ডাচরা ছিল ইউরোপের আল-আমিন। তাই কোন যাত্রা করার আগে তারা সহজেই ধার পেত। নিজেদের কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না তাদের। ধারের টাকা

দিয়ে সৈন্যবাহিনী ভাড়া করতো তারা। যাত্রা শেষে লাভের টাকা দিয়ে ধার ফেরত দিত। এই করে করে তারা গোটা ইউরোপের মহাজনদের আস্থা অর্জন করে। স্পেনের রাজপরিবার যেখানে অযথা যুদ্ধবিবাদ করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, দেনার সমুদ্রে ডুবছে, ডাচরা সেখানে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলছে। ডাচ সাম্রাজ্য কোন রাজাধিরাজ গড়ে তুলেনি। তুলেছে এর ব্যাংকার আর ব্যবসায়ীরা।

কীভাবে? একটা উদাহরণ দিচ্ছি।
ধরা যাক, আপনার বাবা জার্মানির বিরাট মহাজন। উনি দেখলেন, ইউরোপের বাজার বড় হচ্ছে। কাজেই, তার ব্যবসাও বড় করা দরকার। তিনি আপনাকে পাঠালেন আমস্টারডাম আর আপনার ছোট ভাইকে পাঠালেন মাদ্রিদ। সাথে দিলেন ১০,০০০ করে স্বর্ণমুদ্রা।

আপনার ভাই তার টাকাটা স্পেনের রাজাকে ধার দিল। সে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধের রসদপাতি লাগবে না? আর আপনি দিলেন হল্যান্ডের এক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকে। সে আটলান্টিকের ঐপারে ব্যবসা করে। তার ইচ্ছা, ম্যানহাটন নামে এক জায়গায় কিছু জমি কিনে রাখার। তার প্রেডিকশন বলে, কয় দিনের মধেয়ি এই জমির দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। তখন সে বেশি দামে বেঁচে লাভ করবে।

ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টালো। হাডসন নদীর তীর শূন্য বিরানভূমি থেকে জনবহুল ট্রেড রুটে পরিণত হলো। ডাচ ব্যবসায়ী কড়া দামে তার জমি বেঁচে ধারের টাকা ইন্টারেস্ট সহ ফেরত দিল। আপনি খুশি, আপনার বাপও খুশি।

এদিকে স্পেনের রাজাও যুদ্ধে জিতসে। কিন্তু এই ফাঁকে তুর্কীদের সাথে তার লেগে গেছে। তুর্কীদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। তার যে ঋণ আছে--এটা তার মাথায়

আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ঋণ শোধ করার চেয়ে তুর্কীদের সাইজ করাটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।

আপনার ভাই ঠিকই চেষ্টাচরিত্র চালিয়ে যাচ্ছে টাকাটা উদ্ধার করার জন্য। রাজপ্রাসাদে তার যে লিঙ্ক-টিঙ্ক আছে, এদের দিয়ে ওদের দিয়ে ট্রাই করে যাচ্ছে। এই করে তার পায়ের জুতাই ক্ষয় হল কেবল, টাকা আর ফেরত এলো না।

অবস্থা আরো খারাপ হল যখন সে আপনার ছোট ভাই-এর আগের ঋণ তো শোধ করলোই না, উলটা আরো ১০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা ধার চেয়ে বসলো। এখন জলে নেমে তো আর কুমিরের কথা অমান্য করলে চলে না। আপনার ছোট ভাই আপনার বাপকে বলে আরো ১০,০০০ মুদ্রা আনায়ে রাজার হাতে তুলে দিল।

আপনার ব্যবসা এদিকে ভালোই যাচ্ছে। ধার দিচ্ছেন, ফেরত পাচ্ছেন। বেশ মোটা অংকের লাভ হচ্ছে মাসে মাসে। দিন তো আর সবসময় সমান যায় না। এক ক্লায়েন্ট আপনাকে কনভিন্স করলো যে, সামনে কাঠের জুতার ট্রেন্ড আসতেসে বাজারে। এই বাজার ধরতে হলে এখনই একটা কাঠের জুতার ফ্যাক্টরি দিতে হবে। আপনি তার কথায় ইম্প্রেসড হয়ে ধার দিলেন। দুর্ভাগ্যনকভাবে, কাঠের জুতা মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হইলো। সে ধার তো ফেরত দিতে পারলোই না। ফেরত চাইলে ধারের কথা বেমালুম অস্বীকার করলো।

আপনার পিতা মহাশয় গেলেন ক্ষেপে। তিনি আপনাদের দু'জনকেই বললেন আইনের আশ্রয় নিতে। কথামত আপনি আইনের দরবারে গেলেন। নেদারল্যান্ডের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন। কাজেই, আইন আপনার কথা শুনলো। শুনে আপনার পক্ষেই রায় দিল। ঐ ব্যাটা জুতাখোরকে আপনার পয়সা ফেরত দিতে বাধ্য করলো। স্পেনে কী হইলো?

স্পেনের আইন আদালত তো আর সেপারেট কোন প্রতিষ্ঠান না। সবই রাজার অঙ্গুলি হেলনে চলে। বিচারক পয়সা ফেরতের কোন বন্দোবস্ত তো করলোই না, উলটা কয়দিন পর রাজা আপনার ছোট ভাইর কাছে ২০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা চাইলো। দিতে পারলে ভালো। না পারলে তাকে জেলে পুরে রাখবে। কোন কারণে তার ধারণা হইসে, আপনার ছোট ভাই হচ্ছে টাকার খনি। যখনই চাইবো, তখনই পাওয়া যাবে।

সব শুনে আপনার বাপ সিদ্ধান্ত নিলেন, ইনাফ ইজ ইনাফ। স্পেন দেশে আর কোন বিজনেস নয়। এইসব রাজাগজার সাথে তো নয়ই। উনি ছেলের মুক্তিপণটুকু দিয়ে স্পেন থেকে তার ব্যবসা উঠায়ে নিলেন। দুই ভাইকেই আমস্টারডামে বসালেন দুটো ব্রাঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে। অবস্থা তখন এতোই শোচনীয় তখন যে খোদ স্পেনের বণিকেরাও আর সেখানে ইনভেস্ট করার সাহস পাচ্ছে না। তারাও তাদের পুঁজি স্পেন থেকে সরিয়ে হল্যান্ডে এনে খাটাচ্ছে।

একটা শিক্ষা তো হল। পকেটে টাকা থাকলেই সেই টাকা বাচ্চা দেয় না। কিন্তু আইনের শাসন থাকলে মানুষ এসে তোমার পকেট ভর্তি করে টাকা দিয়ে যাবে।

ডাচরা তাদের এই সততা আর বিশ্বস্ততা দিয়েই হাডসনের তীরে একটা চমৎকার শহর গড়ে তুলেছিল। নিজেদের রাজধানীর নামে এর নাম দিয়েছিল নিউ

আমস্টারডাম। চতুর ইংরেজরা পরে অবশ্য এটা দখল করে নেয়। আকিকা দিয়ে এর নতুন নাম রাখে নিউ ইয়র্ক।

ব্রিটিশদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ডাচরা শহরে একটা দেয়াল গড়ে তোলে। সেই দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ-ই কালক্রমে পরিণত হয়েছে আজকের দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। যার নাম ওয়াল স্ট্রীট।

ব্যবসায়ীদের হাতে, বা ব্যবসায়ী মাইন্ডেড লোকেদের হাতে দেশের পলিসি তুলে দেবার কিছু সমস্যাও আছে।

নয় কিস্তি শেষ

গল্পের শুরুটা একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দিয়ে।

কোম্পানির নাম মিসিসিপি কোম্পানি। মিসিসিপি তখন ছিল আটলান্টিকের ওপারের জলা জনমানবশূন্য একটা দেশ। এক কুমির ছাড়া এখানে বলার মত কিছু ছিল না। এই জলা জনমানবহীন জায়গা নিয়েই এই কোম্পানি তখন কল্পকাহিনী ছড়াতে শুরু করে। একে তো আমেরিকা তখন মানুষের কাছে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। আর সেই সময় এই গালগপ্পো ভেরিফাই করার কোন উপায়ও ছিল না। কাজেই, ফ্রান্সের মানুষ গোগ্রাসে এই গপ্পো খেতে শুরু করে।
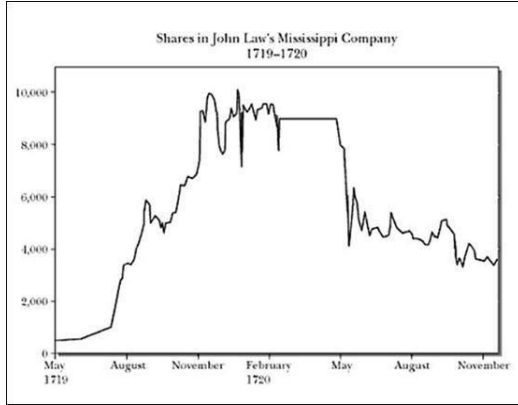
এই কোম্পানির যে ডিরেক্টর, উনি আবার ছিলেন ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্ণর। নিজের প্রভাব আর কানেকশান খাটিয়ে উনি প্যারিস স্টক এক্সচেঞ্জে তার কোম্পানির শেয়ার ছাড়েন। মিসিসিপি হাইপ তখন চরমে। এই হাইপকে কাজে লাগিয়ে সেই শেয়ারের দাম হু হু করে বাড়িয়ে নেন। যে শেয়ারের দাম ছিল ১০০০ টাকা, তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,০০০ টাকা। ফ্রান্সের এলিট শ্রেণী তো তার এই ফাঁদে পড়েই,

সাধারণ মানুষ জায়গাজমি বেঁচে এই কোম্পানির শেয়ার কেনা শুরু করে। বড়লোক হবার এতো সোজা রাস্তা পেলে কে ছাড়ে?

কিছুদিনের মধ্যেই প্যানিক শুরু হয়। বুদ্ধিমান দুই - একজন বুঝতে পারে, শেয়ারের দাম তো এতো হবার কথা না। মিসিসিপিতে যতো সোনাদানাই থাক না কেনো, মানুষজন যে দামে শেয়ার কিনতেসে, এই পরিমাণ সম্পদ ওখানে নাই। তারা দাম বেশি থাকতে থাকতে শেয়ার বেঁচে দেয়া শুরু করে। তাদের দেখাদেখি আরো লোক দাম কমার আগেই শেয়ার হাত থেকে ঝেড়ে দিতে শুরু করে। পুরো বাজারে একটা হিস্টিরিয়া তৈরি হয়। যে শেয়ারের দাম ১০,০০০ উঠসিলো, সেটা আবার ১০০০ এ নেমে আসলো। পাকা খেলোয়াড়রা তথা পুঁজিপতিরা ঠিকই তাদের আখের গোছায়ে নিল। মারা খেলো সাধারণ মানুষ। অনেকে আত্মহত্যাও করলো। (আমাদের শেয়ার বাজারের কথা মনে পড়ে কি?)

মিসিসিপি বাবলের ফলাফল দুইটা।
এক, এই যে ফ্রান্সের অর্থনীতি কল্যাপ্স করসিলো, প্রায় এক শতাব্দী তা আর এর ধকল কাটায়ে উঠতে পারে নাই। ফ্রান্সের অভিজাতদের দেখে আমাদের ভুল ধারণা হইতে পারে। সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। খুব খারাপ মানে খুবই খারাপ। এক টুকরা রুটির জন্য একজন আরেকজনকে খুন করতো---এই অবস্থা। আই ক্রাইসিসই পরে ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের রাস্তা তৈরি করে দেয়।

দুই, ফ্রেঞ্চ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর গোটা ইউরোপের আস্থা উঠে গেলো। এরা আর আগের মত বড় বড় মহাজনদের কাছ থেকে ধার পাইলো না। ফলে, উপনিবেশ নিয়া ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলতেসিলো, তাতে আগায়ে গেলো ব্রিটেন। কিছুদিনের মধ্যেই অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাট হিসবে আবির্ভাব ঘটলো ব্রিটিশদের।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাও পৃথিবীকে শান্তি দেয়নি। ব্রিটিশ নাবিকেরা দেশে দেশে তাদের নৌতরী ভিড়িয়েছে। আর ব্রিটিশরাজ চোখ বুজে তার বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী তো আমরা সবাই জানি। পলাশীর যুদ্ধ থাক। আজ আমরা আরেকটা যুদ্ধের গল্প শুনি।

ঊনিশ শতকের শুরুর দিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন চায়নায় আফিম বেঁচে বেশ দুই পয়সা কামাচ্ছে। এক সময় দেখা গেলো, গোটা জাতি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। চাইনিজ সরকার নড়েচড়ে বসে। আইন করে আফিম নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশরা তো আর কারো কথা শুনে না। তারা চাইনিজদের মধ্যাঙ্গুল দেখিয়ে ঠিকই ড্রাগের চালান পাঠাচ্ছিল।

গভর্ণমেন্ট তখন কঠোর অবস্থানে যায়। ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে জব্দ করা শুরু করে। অনেকগুলো ধ্বংসও করে দেয়। এদিকে ড্রাগ কোম্পানিগুলোতে এমপি-দের একটা বড় শেয়ার ছিল।

এমপি-রা নিজের পেট বাঁচাতে একজোট হয়। ব্রিটিশরাজকে কনভিন্স করে চায়নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়। মুক্ত বাণিজ্যের নামে এ যুদ্ধ হলেও আসলে এটা ছিল অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। যার মূল বক্তব্য হল---আমি তোকে ভাত খাইতে বললে তুই ভাত খাবি; আর আমি তোকে গাঁজা খাইতে দিলে তুই গাঁজা খাবি। দিন শেষে আমার প্রোডাক্টই তোর বাজারে থাকবে।

অসম এ যুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশরা অনায়াসে জয়ী হয়। চাইনিজরা নাকে খত দিয়ে আফিমের অবাধ ট্রানজিট মেনে নিতে বাধ্য হয়। হংকং তো ব্রিটিশরা পুরোটাই দখল নিয়ে নেয়। দীর্ঘদিন এই হংকং ছিল চায়নায় ব্রিটিশ ড্রাগ কার্টেলের মূল বেস।

পুঁজিবাদ এইভাবে গুটিকতক লোকের পকেট ভারি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বলির পাঁঠা বানিয়েছে। কখনো খোলাখুলি প্রফিটের নামে করেছে। কখনো সেবার নামে। যদিও দুনিয়ায় নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বলে কিছু নাই। সবই মানুষকে একটা বুঝ দিয়ে নিজেদের প্রফিট অর্গানাইজেশনের লাভ বাড়ানোর ধান্দা। ট্যাক্স না দেবার ধান্দা।

১৮৭৬ সালে বেলজিয়ামের রাজা মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোয় একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন খুলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকা নিয়ে গবেষণা করা আর এখানে যে দাস বাণিজ্য হয়, লাখ লাখ দাসকে যে জাহাজে করে আটলান্টিকের ঐপারে পাঠানো হয়---তা বন্ধ করা। আফ্রিকার জনমানুষের জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল করাও ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য।

কয়েক বছরের মধ্যে এই মানবিক প্রতিষ্ঠানটি দানবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যার মূল লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় গ্রোথা আর প্রফিট। স্কুল-কলেজ লাটে উঠলো। তার জায়গায় বসানো হল কয়লার খনি আর রাবার বাগান। রাবার ছিল কঙ্গোর প্রধান রপ্তানি পণ্য।

পুঁজিবাদের নিয়ম অনুযায়ী, মালিকেরা প্রতি বছর রাবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতো। আর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে তার দায় মেটাতে হতো কৃষকদের তাদের জীবন দিয়ে।

ধারণা করা হয়, ১৮৮৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে বেলজিয়ান আর্মির হাতে; কারো কারো মতে এই সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

এইভাবে পুঁজিবাদ মানুষকে বারবার ব্যর্থ করেছে। তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তার পরও মানুষ পুঁজিবাদকে ছাড়তে পারেনি। এর কারণ বোধয়, তার কাছে এর চেয়ে ভালো কোন অপশন এখনো আসেনি।

কিংবা পুঁজিবাদ অনেকটা কৃষির মত একটা টেকনোলজি। শিকারী মানুষ যেমন একবার হাল ধরার পর শত অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও আর শিকারী জীবনে ফিরে যেতে পারেনি, আমরাও পুঁজিবাদের হাজারটা ফাঁক-ফোকড় জেনেও একে ডিভোর্স দিতে পারছি না। আমাদের অর্থনীতি এখন এতোই কমপ্লেক্স যে, চাইলেই আমরা 'গ্রামে ফিরে যাই' নীতিতে সবকিছু ছেঁড়েছুঁড়ে সহজ একটা জীবন যাপন করতে পারবো না। বড়জোর যেটা করতে পারি, পুঁজিবাদের গলদগুলো শুধরে বেটার কোন মডেলে পৃথিবীটাকে দাঁড় করাতে, যেন কঙ্গোর কালো মানুষটা কিংবা চা বাগানের শ্রমিকেরাও তাদের বেসিক চাহিদাগুলো মেটাতে পারে।

অধ্যায় দশ কিস্তি শূন্য

বছরের পর বছর চলে গেছে। মানুষের চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটেছে। বোকা মানুষ সেটা খেয়াল করে নাই।

একটা কেটলিতে পানি গরম করতে দিয়ে ঢেকে দিন। যে মুহূর্তে পানি ফুটে বলক দিবে, সেই মুহূর্তে ধক করে ঢাকনাটা উপরে একটা লাফ দিয়ে উঠবে। পানি বাষ্প হয়ে ঢাকনাটাকে ধাক্কা দিচ্ছে বলেই এটা হচ্ছে। পানির তাপ এখানে ঢাকনার গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ মানুষ এই ঘটনার সাক্ষী হচ্ছিল প্রতিদিন। অথচ কেউ এর ভেতরে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, সেটা কেউই ধরতে পারে নাই।

প্রথম ইঙ্গিতটা আসে গানপাউডার দিয়ে। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি চায়নার এর আবির্ভাব। সেই সময় গানপাউডার ব্যবহার হত আগুনের গোলা বানাতে। কিন্তু সেই

গোলার পিছনে যে ঠিকঠাক তাপ দিলে সেই গোলাই বহুদূর যাবে, এই ভাবনা তখনো মাথায় আসে নাই। যখন মাথায় আসছে, ততোদিনে আরো ৬০০ বছর পেরিয়ে গেছে। বন্দুকের মূলনীতি আবিষ্কারের অনেক কাছাকাছি এসেও তাই চাইনিজরা এই এ্যাচিভমেন্ট আনলক করতে পারে নাই। আনলক করসে ইউরোপীয়ানরা।

তাও আরো তিনশো বছর পর। তাপশক্তি যে গতিশক্তিতে রূপান্তর হয়---এইটা তারা বুঝছে স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করে। যদিও স্টীম ইঞ্জিনের আঁতুরঘর কোন রেলওয়ে শপ বা মেশিন শপে নয়। এর জন্ম নোংরা, ছোটলোক কয়লা খনিতে।

ব্রিটেনে তখন জনসংখ্যা বাড়ছে। আর বেশি জনসংখ্যা মানে এনার্জি কনসামশনও বেশি। নতুন মানুষ মানে নতুন নতুন বাড়িঘর তৈরি করতে হবে তাদের জন্য। সেকালে সব কাঠের বাড়িঘর তৈরি হত। রিয়েল এস্টেটের চাহিদা মেটাতে বনকে বন বন উজাড় করা হল। ফলে জ্বালানি কাঠের অভাব দেখা দিল। সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এল কয়লা। কয়লা পুড়িয়ে রান্নার চল হল।

সমস্যা হল কয়লা উত্তোলনে। অনেক কয়লাখনিতে একটু নিচের দিকের স্তরে পানি জমে থাকে। ঐ স্তর থেকে আর কয়লা কালেক্ট করা যায় না। তো এই সমস্যার সমাধান কী?

সমাধান নিয়ে এল স্টীম ইঞ্জিন।
কয়লা পুড়ায়া যে তাপটা তৈরি হয়, সেই তাপ দিয়ে পানি গরম করা হয়। পানি ফুটে বাষ্প হয়। সেই বাষ্প একটা পিস্টনকে ধাক্কা দেয়। পিস্টন নড়ে। এখন পিস্টন নড়লে পিস্টনের সাথে যাকেই বেঁধে দেয়া হবে, সেও নড়বে। ব্যাং! ঘরে বসেই আপনি তৈরি করে ফেললেন একখানা আস্ত স্টীম ইঞ্জিন।

কয়লা খনিগুলোতে এই পিস্টনটা একটা পাম্পের সাথে লাগানো থাকতো। এই পাম্প খনির গভীরের পানি বাইরে বের করে দিত। শুরুর দিকের পাম্পগুলো ছিল খুবই

ইনএফিশিয়েন্ট। বস্তা বস্তা কয়লা পুড়াইলে হয়তো সামান্য পরিমাণ পানি বের হইতো। যেহেতু কয়লাখনির পাশে কয়লার কোন অভাব ছিল না---এটা কোন বড় ইস্যু হয়ে দেখা দিল না।

আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের এফিশিয়েন্সি বাড়লো। কয়লা খনি থেকে তুলে একে স্থান দেয়া হল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে। চোখের পলকে গোটা টেক্সটাইল শিল্পে একটা বিপ্লব ঘটে গেলো। কাপড়ের দাম হু হু করে পড়ে গেলো।

সেই সাথে পড়ে গেলো আমাদের উপমহাদেশের তাঁত শিল্প। মিথ আছে, ব্রিটিশরা নাকি আমাদের সেরা তাঁত শিল্পীদের আঙুল কেটে দিত; যাতে তারা মসলিন আর যতো মিহি কাপড় বুনতে না পারে। এটা যতোটা না ঐতিহাসিক সত্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সিম্বলিক সত্য। টেক্সটাইলের আগ্রাসনের সাথে আমাদের কুটির শিল্প তাল মেলাতে পারছিল না। বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা হেরে যাচ্ছিলাম। হেরে যাচ্ছিলো আমাদের তাঁত শিল্পীরা। এই হেরে যাওয়াটা লিটার‍্যালী আঙুল কাটার চেয়ে কোন অংশে কম কষ্টের না।

স্টীম ইঞ্জিন মাটির নিচ থেকে উপরে উঠে আসায় টেকনোলজিক্যাল ব্যারিয়ারের সাথে সাথে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ারও আমরা কাটিয়ে উঠলাম। কয়লা পুড়ায়া যদি তাঁত চালানো যায়, তবে অন্য জিনিস নয় কেনো? ধরেন, গাড়িঘোড়া।

১৮২৫ সালে এক চতুর ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার স্টীম ইঞ্জিনের সাথে ট্রেনের কতগুলা বগি জুড়ে দিলেন। কাকতালীয়ভাবে, সেই বগিগুলোও কয়লাই নিয়ে যাচ্ছিল। তখন মানুষের মাথায়া আসলো--- আরে, স্টীম দিয়ে যদি কয়লা আনা-নেয়া করা যায়, তবে মানুষ নয় কেন? আমরা মানুষেরা তো আর বানের জলে ভেসে আসি নাই।

আমাদেরও আছে অধিকার। স্টীম ইঞ্জিন চালিত যানে চলার।

১৮৩০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আসলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দুনিয়ার প্রথম কমার্শিয়াল রেলওয়ে সেদিন চালু হইলো। লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার। কয়েক বছরের মধ্যে রেলওয়ে ট্র্যাক গোটা ব্রিটেনকে ছেয়ে ফেললো।

যদি ভেবে থাকেন, ব্রিটিশরা তাদের চাতুর্য দিয়েই অর্ধেক দুনিয়া জয় করেছিল, তাহলে ভুল করবেন। ব্রিটিশরা সেকালে ছিল টেকনোলজিক্যালী সবচেয়ে এগিয়ে। শিল্প বিপ্লব বলতে গেলে এই জাতির হাত ধরেই হয়েছে। আর পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের বলে, যে জাতি টেকনোলজিতে এগিয়ে থাকবে, তারাই অন্যদের উপর রাজত্ব করবে। খুব সোজাসাপটা হিসাব। এর মধ্যে কোন আইডিওলজিকাল ব্যাপার-সেপার নেই।

স্টীম ইঞ্জিনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনোজগতে একটা বড় পরিবর্তন আসলো। দীর্ঘদিন তার বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ায় এনার্জি খুবই সীমিত। আর আমরা মানুষেরা সেই এনার্জি সব শেষ করে ফেলতেসি। প্রথমবারের মত তার মধ্যে কনফিডেন্স এলো, যে চাইলেই তো আমরা এক এনার্জিকে আরেক এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারতেসি।

কাজেই, এনার্জি সোর্স শেষ হয়ে যাইতেসে---এই ভেবে ভয়ের কিছু নাই। ভয়ের ব্যাপার হবে তখন, যখন এনার্জিকে কনভার্ট করার নিত্যনতুন উপায় আমরা আর বের করতে পারবো না।

মোটরগাড়ি আবিষ্কারের আগে লন্ডনের রাস্তা ঘোড়ার লাদিতে কয়েক ইঞ্চি ঢাকা ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, এরকম চলতে থাকলে মানুষ লন্ডন ছেড়ে পালাবে। মানুষ কিন্তু তাপশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলসে। আইনস্টাইন E=mc^2 আবিষ্কার করে দম ফেলার টাইম পান নাই। চল্লিশ বছরের মধ্যেই আমরা পারমাণবিক বোমা বানায়ে ফেলসি। দুনিয়ার জায়গায় জায়গায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসায়ে ফেলসি।

তারপরও মানুষের মধ্যে এই ভয় যায় নাই যে, আমরা আমদের সব এনার্জি শেষ করে ফেলতেসি। জীবাশ্ম জ্বালানির ভাণ্ডার খতম হয়ে যাচ্ছে। অথচ জীবাশ্ম জ্বালানি কিন্তু আমাদের এনার্জির খুব গুরুত্বপূর্ণ সোর্স না। সবচেয়ে বেশি এনার্জি স্টোর হয়ে আছে সূর্যে। সূর্য থেকে প্রতি বছর ৩,৭৬৬,৮০০ এক্সাজুল পরিমাণ শক্তি পৌঁছায় আমদের পৃথিবীতে। দুনিয়ার সব মানুষ আর ইন্ডাস্ট্রি মিলে বছরে আমাদের লাগে মাত্র ৫০০ এক্সাজুল। এক্সাজুল যে কতো বড় ইউনিট তা বোঝানোর জন্য বলি---১ এর পর ১৮টা শূন্য বসান। তাইলে ১ এক্সা হয়।

বোঝাই যাইতেসে, সূর্যদেব আমাদের দুহাত ভরে যা দেন, তার কিছুই আমরা ঠিকমত নিতে পারতেসি না। নিতে পারলে উনি দেড় ঘণ্টায় আমাদের যা পাঠান, তা দিয়েই আমাদের বাৎসরিক এনার্জির দুশ্চিন্তা শেষ হয়ে যেত। লোডশেডিং-এর জন্যও সরকারকে আর গালি দেয়া লাগতো না।

এতো মাত্র একটা সোর্সের কথা বললাম। চোখ মেলে তাকালে বোঝা যাবে---আমাদের চারপাশে এনার্জির ছড়াছড়ি। পরমাণুর মধ্যে শক্তি। গ্র্যাভিটির মধ্যে শক্তি। শক্তি নাই কোথায়? শুধু দরকার এই শক্তিগুলাকে ক্যাপচার করার নতুন নতুন তরিকা।

দশ কিস্তি এক

১৭৫০ সালেও ইউরোপ আর এশিয়া একই কাতারে ছিল। ১৭৫০-১৮৫০, এই একশো বছরে পাওয়ারটা পুরোপুরি ইউরোপে শিফট করে।

পৃথিবীতে কার রাজ চলছে, তা বোঝার একটা প্যারামিটার হতে পারে মোট উৎপাদন যন্ত্রে কার কন্ট্রিনিউশন কেমন। যার উৎপাদন যতো বেশি, ক্ষমতার ভারকেন্দ্রও তার দিকেই ততো হেলে থাকবে। ১৭৭৫ সালেও পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৮০ ভাগ হত এশিয়ায়। দুই শতাব্দীর মধ্যে পাশার দান ঘুরে যায়। ১৯৫০ সালে এসে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি করছে ইউরোপ আর তাদের কাজিন নব্য আমেরিকানরা মিলে।

যে ইউরোপকে কেউ এককালে পাত্তাই দিত না, তাদের মধ্যে হঠাৎ কী এমন হল যে তারা নতুন নতুন দেশ-মহাদেশ জয় করা শুরু করলো? নিজেদের বিজয় নিশান দিকে দিকে ওড়াতে লাগলো? চাইনিজ বা অটোম্যানরা কেন এই কাজটা করতে পারলো না? ইউরোপীয়দের চেয়ে তাদের ইতিহাস তো বরং সমৃদ্ধ ছিল। ছিল স্ট্রং শাসন ব্যবস্থা।

ইউরোপীয়রা না হয় স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করলো। অটোম্যানরা তো সেটা কিনে নিজেদের দেশে চালু করতে পারতো। কিংবা চাইনিজরা কপি করে নিজেদের ভূখণ্ডে ছাড়তে পারতো। সেকালে তো পেটেন্ট নিয়েও এতো কড়াকড়ি ছিল না। প্রাচ্যের লোকজন এর কোনটাই করলো না।

প্রাচ্যের লোকজনের যে টাকাকড়ির অভাব ছিল---তা না। ছিল মাইন্ডসেটের অভাব। উদারতার অভাব। ফলে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার লোকটা যা আবিষ্কার করসে, ফ্রান্সের লোকজন, জার্মানির লোকজন সেটা খুব দ্রুতই আপন করে নিতে পারসে। কিন্তু ইস্তানবুল বা সাংহাইর লোকজন পারে নাই।

পশ্চিমকে আমরা রাজত্ব করতে দেখসি ১৭৫০ থেকে। আমরা আসলে দেখসি ফলাফলটা। 'কারণ'-টা কিন্তু আরো আগে থেকেই শুরু হইসে। এই সময়কালটা হল ১৫০০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত। ১৭৫০ এর যে আপাত সাম্য আমরা দেখছি এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে, সেটা আসলে একটা ধোঁকা। ধোঁকাটা কীরকম বলি।

ধরা যাক, দুইজন ইঞ্জিনিয়ার। প্রত্যেকেই উঁচু লম্বা একটা বিল্ডিং বানাবে। একজন ইট ব্যবহার করতেসে। আরেকজন স্টীল আর কংক্রীট। শুরু কয়েক তলা দুজন ঠিকঠাকই বানাবে। এ্যাপারেন্ট কোন পার্থক্য চোখে পড়বে না। একটা থ্রেশোল্ড ক্রস করে ফেললে (ধরা যাক আট তলা), ইটের বাড়িটা আর লোড নিতে পারবে না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। স্টীলের দালানটা ওদিকে আকাশ ছুঁচ্ছে।

ইউরোপের দালানটা হচ্ছে স্টীলের দালান। আর প্রাচ্যের বাড়িঘর ছিল ইট-কাঠ-সুড়কির। নতুন যুগের লোড সে নিতে পারে নাই। ইউরোপ কীভাবে এই ভারটা নিতে পারলো? কারণ তার ভিত্তিটা সে মজবুত করে নিসে আগের আড়াইশো বছরে। বিজ্ঞান আর পুঁজিবাদ হলো ইউরোপের সেই স্টীল আর কংক্রীট।

ইউরোপীয়রাই সবার আগে সায়েন্টিফিক ওয়েতে চিন্তাভাবনা শুরু করে। সায়েন্টিফিক আর পুঁজিবাদী ধারায়। পুঁজির মালিকেরা এখন আর তাদের রবরবা ধরে রাখার জন্য খালি আর্মি পালতে শুরু করলো না, সেই সাথে বিজ্ঞানীদের খোরাকিও দিতে লাগলো। বিজ্ঞানীরাও আগের মত আর বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান করতে লাগলেন না। তারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, পুঁজিবাদীদের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিলেন।

বিজ্ঞান আর সাম্রাজ্যবাদের এই যে মিলন---এটাই ইউরোপীয়দের অন্যদের চেয়ে দুশো বছর এগিয়ে দিল।

আমাদের অনেকেরই বিজ্ঞান পছন্দ, বিজ্ঞানের ফল পছন্দ, কিন্তু পুঁজিবাদ পছন্দ না। অথচ পুঁজিবাদের সাথে বিজ্ঞানের এই বোঝাপড়া না হলে কিন্তু বিজ্ঞান এতো দ্রুত আর এতোদূর আগাতো না। গানপাউডারের যুগেই বসে থাকতে হত আমাদের।

ইউরোপীয়দের জিনে এমন কিছু আছে, যা তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই এই রেসে এগিয়ে দিয়েছে---এমন ধারণা তাই আর হালে পানি পায় না। ইউরোপীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উসাইন বোল্ট না। চায়না বা ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলেও নিউটনের মত স্কলার পাওয়া যাবে। নিউটনের মত প্রলিফিক হয়তো না, কিন্তু তার সমান মেধাসম্পন্ন লোক ঠিকই পাওয়া যাবে। নিউটন তবে নিউটন হলেন কেন? নিউটনের জন্ম ইংল্যান্ডে না হয়ে কায়রো বা বেইজিং এ হল না কেন?

কারণ, নিউটন হবার জন্য যে এনভাইরনমেন্ট দরকার, নিউটন সেটা পুরোপুরিই পেয়েছিলেন। ক্যামব্রিজ তাকে সেভাবে কিছু না শেখালেও পরিবেশটা ঠিকই দিয়েছে। একটা বাচ্চা যতো মেধা নিয়েই জন্মাক না কেনো, উগান্ডা বা উজবেকিস্তানে কোন নিউটনের জন্ম হবে না। রূঢ় হলেও এটাই সত্য। বিজ্ঞান তো কতগুলো ভাবনার সমষ্টি না। ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আপনার যে ইকুইপমেন্ট লাগবে,

ফান্ডিং লাগবে--ওটা দিবে কে? আফ্রিকা থেকে সাহিত্যে নোবেল আসে, বিজ্ঞানে আসে না কেন?

আর এটাই ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্য সাম্রাজ্যগুলোর একটা বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আগেকার সাম্রাজ্যগুলো কেবল মাটির দখল নিত। মানচিত্রে নিজেদের কলার উঁচিয়ে হাজির করতো। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য, যে মাটির দখলের সাথে সাথে ঐ এলাকার জ্ঞানরাজ্যের দখলও বুঝে নেয়।

যে কোন ইউরোপীয় অভিযানে তাই আর্মির সাথে সাথে একদল ডাক্তার থাকতো। থাকতো বোটানিস্ট, জুওলজিস্ট, এ্যাস্ট্রোনোমার, জিওলজিস্ট। এদের কাজ ছিল আধিকৃত অঞ্চলের সব কিছু, লিটার‍্যালী সব কিছু নিয়ে গবেষণা করা। জ্ঞানরাজ্যে নিজেদের হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করা। ইউরোপীয়রা এটা বুঝেছিল, মাটির রাজ্য আসলে রাজ্য না; জাস্ট দিখাওয়া। আসল রাজ্য হচ্ছে জ্ঞানরাজ্য, এইখানে একবার নিজেদের হেজিমি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে মাটির রাজ্য এমনিই তাদের হাতে থাকবে।

ক্যাপ্টেন কুক যেটা করেছিলেন। সে সময় জাহাজ যাত্রায় স্কার্ভির খুব প্রাদুর্ভাব দেখা দিত। প্রতি যাত্রাতেই অর্ধেকের বেশি লোক এই রোগে ভুগে মারা পড়তো। এক ডাক্তার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলেন, যেসব লোককে সাইট্রাস ফল খেতে দেয়া হচ্ছে, তারা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ঠছে। আজ আমরা জানি, সাইট্রাস ফলে ভিটামিন সি আছে যা স্কার্ভি প্রতিরোধ করে। সেসময় তো মানুষ এতো কিছু জানতো না। তারা মেইনলি শুকনা খাবার দাবার, বিস্কিট-টিস্কিট---এসব নিয়েই সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়তো।

ডাক্তারের এই এক্সপেরিমেন্টকে তেমন একটা কেউ পাত্তা দিল না। একজন মাত্র দিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন জেমস কুক। তিনি বুঝলেন, নাবিকেরা ঠিকমত পুষ্টি উপাদান পাচ্ছে না। তাই তাদের এই দুর্দশা। তিনি জাহাজ বোঝাই ফলমূল আর সবজি নিয়ে

রওনা দিলেন এইবার। ফলাফল হাতেনাতে পেলেন। একটা লোকও স্কার্ভিতে মারা পড়লো না এবার।

বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদে অতি দ্রুত ইংরেজরা গোটা সমুদ্রপথে রাজত্ব কায়েম করলো। অর্ধেক পৃথিবীর রাজা হবার জন্য যতোটুকু ধন্যবাদ ইংরেজ আর্মি আর তার টেকনোলজি পাবে, ঠিক ততোটুকু ধন্যবাদই প্রাপ্য সেই অখ্যাত ডাক্তার আর ক্যাপ্টেন কুকের।

এখানেই শেষ নয়। নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেন, তখন উনি সাথে করে ১৬৫ জন স্কলার নিয়ে যান। এদের কাজ ছিল মিশরের ইতিহাস, ধর্ম, কালচার---সব কিছু নিয়ে গবেষণা করা। এদের হাত ধরেই জ্ঞানের একটা নতুন শাখার জন্ম হয়। যার নাম Egyptology.

১৮৩১ সালে ব্রিটিশ নেভী গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করে। দ্বীপগুলো ছিল যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য স্ট্রাটেজিক্যালী ইম্পর্ট্যান্ট। জাহাজের ক্যাপটেন নিজেও ছিলেন একজন শখের বিজ্ঞানি। উনি দলে একজন ভূতাত্ত্বিককে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। জিওলজির প্রফেসররা একের পর এক তাকে 'টাইম নাই' জানিয়ে দেন। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে তিনি সদ্য ক্যামব্রিজ পাশ করা এক ছাত্রকে এই জবের অফার দেন। ছাত্রটিও খুশিমনে এই অফার লুফেও নেয়। ক্যাপ্টেন ওখানে গিয়ে মিলিটারী ম্যাপ তৈরি করেন, আর ক্যাম্ব্রিজের স্টুডেন্টটি নিয়ে আসে রাশি রাশি ডাটা। যা কিনা একদিন আমাদের মনোজগতে বিরাট আঘাত হানবে।

তরুণ সেই গ্র্যাজুয়েটের নাম চার্লস ডারউইন। আর তার পৃথিবী কাঁপানো তত্ত্বের নাম 'থিওরি অফ ইভোল্যুশন'।

দশ কিস্তি দুই

মানচিত্র আঁকার অভ্যাস আমাদের অনেক আগে থেকেই ছিল। সমস্যা হল, ঐ মানচিত্রগুলো ছিল অসম্পূর্ণ। আমরা, আফ্রো-এশিয়ার লোকজন তখন আমেরিকা সম্পর্কে জানতাম না। আমেরিকার আদি অধিবাসীরাও আমাদের সম্পর্কে জানতো না। কাজেই, আফ্রো-এশিয়ার মানচিত্র এঁকেই আমরা একে গোটা পৃথিবীর মানচিত্র বলে চালিয়ে দিতাম।
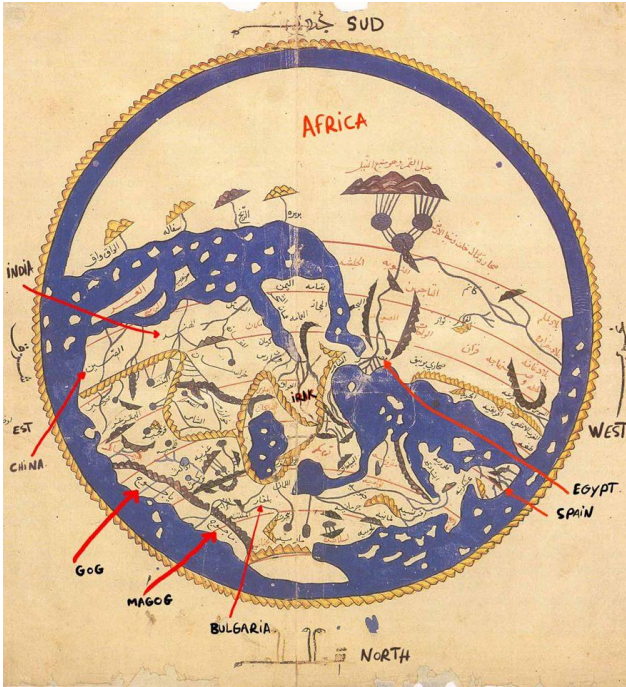
আমাদের এই আইডিলোজিতে প্রথম আঘাতটা হানে ইউরোপীয়রা। তারা মানচিত্রের স্থানে স্থানে ফাঁকা রেখে একে আঁকতে শুরু করে। ইউরোপীয়ানদের চিন্তাধারায় যে বড়সড় পরিবর্তন আসছে, এটা তার প্রথম লক্ষণ। এশিয়ানরা যেখানে 'সব জেনে বসে আছি ভাব' নিয়ে লিটার‍্যালী বসে ছিল, সেখানে নিজেদের অজ্ঞানতাকে ওরা খোলা বাজারে স্বীকার করা শুরু করে। আর সেই অজানা ভূমির খোঁজে পাল তুলে বেরিয়ে পড়ে।

কলম্বাস নিজেও অবশ্য পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রে ঈমানধারীদের একজন ছিলেন। উনি হিসেব কষে দেখেছিলেন, স্পেন থেকে সোজা পশ্চিমে যাত্রা করলে ৭ হাজার কিলোমিটার পর তিনি জাপান পৌঁছে যাবেন। তার এই হিসাব ঠিক মিললো না। ৭ হাজার নয়, ২০ হাজার কিলোমিটার যাত্রার পর তার জাহাজের এক নাবিক অদূরে স্থলভাগের চিহ্ন দেখে "মাটি, মাটি" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। এই স্থলভাগকেই আজ আমরা বাহামা বলে জানি।

স্পেন আর জাপানের মাঝখানে আর কিছু যে থাকতে পারে---কলম্বাস এতে বিশ্বাস করতেন না। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, তিনি এশিয়ার পূর্ব প্রান্তের কোন দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন। তিনি এই নতুন মানুষদের নাম দিলেন ইন্ডিয়ান। তিনি যে একটা সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছেন---এই ব্যাপারটা তিনি নিতেই পারলেন না। কাজেকর্মে আধুনিক আর সাহসী হলেও মনে আর মননে কলম্বাস ছিলে পুরোপুরি মধ্যযুগের মানুষ। বাইবেলের উপর তার ছিল গভীর আস্থা। একটা বিরাট মহাদেশ থাকবে আর তার কথা বাইবেলে থাকবে না---এমনটা হতে পারে না। এই বিরাট ভুল নিয়েই তিনি সারা জীবন কাটিয়ে দেন।

এদিক থেকে প্রথম আধুনিক মানুষ ছিলেন আমেরিগো ভেসপুচি। কলম্বাসের কয়েক বছর পর ইতালির এই ভদ্রলোক আমেরিকায় সমুদ্রযাত্রা করেন। সময়টা ছিল ১৪৯৯-১৫০৪। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুটো বইও লিখে ফেলেন। এখানেই তিনি প্রথম

দাবি করেন, কলম্বাস যেখানে আসছিলেন, ওটা আসলে এশিয়ার পূর্ব উপকূলের কোন দ্বীপ না। ওটা নতুন একটা মহাদেশের অংশ। যে মহাদেশ সম্পর্কে আমরা এখনো জানি না।
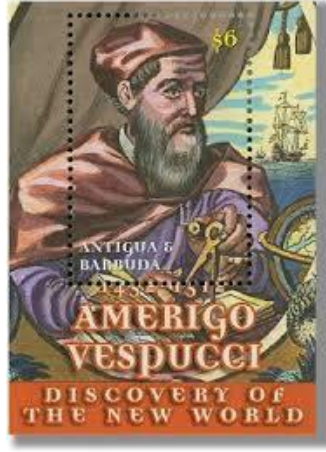
তার কথাবার্তায় কনভিন্সড হয়ে মার্টিন ওয়ালসেমুলার নামে সেকালের এক বিখ্যাত মানচিত্র নির্মাতা এই নতুন মহাদেশকে মানচিত্রে ঢুকিয়ে দেন। এখন এই নতুন মহাদেশের তো একটা নাম দিতে হবে। ওয়ালসেমুলারের ধারণা ছিল, আমেরিগো-ই এই নয়া মহাদেশের আবিষ্কারক। আমেরিগোর নাম অনুসারে তিনি এর নাম দেন আমেরিকা। তার এই ম্যাপখানা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আর পৃথিবীর বুকে আমেরিকা নামখানি-ই খোদাই হয়ে যায়।

কলম্বাসের নামে আমেরিকায় বেশ কিছু শহরের নাম আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় একটা দেশের নামও আছে। কিন্তু ঐ গোঁয়ার্তুমিটা না করলে হয়তো আজ পৃথিবীর দু দুটো মহাদেশের নাম আমেরিকা না হয় কলম্বিয়া হত। ইতিহাসের অল্প কয়টা 'পোয়েটিক জাস্টিস' এর মধ্যে এটা একটা। কলম্বাস তার অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে চাননি। আর আমেরিগো ভেসপুচির এই স্বীকারটুকু করার সাহস ছিল বলে নতুন পৃথিবীর নাম তার নামেই হল।

সায়েন্টিফিক রেভোল্যুশন এগজ্যাক্টলি কবে শুরু হয়, তার যদি কোন ল্যান্ডমার্ক চিহ্নিত করতে হয়, তবে ইউরোপীয়ানদের এই আমেরিকা আবিষ্কার-ই সেই ল্যান্ডমার্ক। এর মধ্য দিয়ে মানচিত্র নির্মাতারাই কেবল মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করা শুরু করলেন না, তাদের সাথে এগিয়ে এলেন জ্ঞানের সব শাখার লোকেরা। উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ, পদার্থ ও রসায়নবিদ, তাত্ত্বিক ও ধার্মিক---সবাই। সবাই পাগলের মত যার যার ফিল্ডের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করা শুরু করলেন।

ইউরোপীয় ছাড়া আর এক দলের সামান্য সম্ভাবনা ছিল নতুন পৃথিবীর মালিক হবার। তারা হল চাইনিজ। কলম্বাসের যাত্রার বেশ আগে ১৪৩৩ সালে মিং রাজারা এক বিরাট লটবহর পাঠান ভারত মহাদেশ এক্সপ্লোর করতে। ৩০০ জাহাজ ওয়ালা সেই বহর শ্রীলংকা, ভারত, পারস্য উপসাগর ঘুরে আফ্রিকার পূর্বভাগে ছুঁয়ে যায়।

কলম্বাসের সাথে এই অভিযানের পার্থক্য ছিল---এরা একদম নতুন, অপরিচিত কোন ভূমির সন্ধান পায়নি। যে দেশগুলো ছুঁয়ে গেছে, তাদেরকেও কলোনাইজ করার চেষ্টা করেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই দুঃসাহসী অভিযান ব্যাপারগুলো কেন যেন চাইনিজ কালচারের সাথে খুব যায় না। তাদের ট্রাডিশনাল কালচারে গতির চেয়ে স্থিতিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ্যাডভেঞ্চার নয়, স্ট্যাবিলিটি তাদের মূল মোক্ষ। বেইজিং এ তাই ক্ষমতার পালাবদলের পর এইসব অভিযানে ফান্ডিং-ও গুটিয়ে আনা হয়। চাইনিজদের নতুন পৃথিবী জয়ের স্বপ্নও সেইখানেই থমকে যায়।

ইউরোপীয়ানদের এই পাগলামির আমরা অনেক সময় ক্রেডিট দিতে চাই না। ইউরোপীয় কলোনিয়ালিজমের আমরা সমালোচনা করতেই পারি, সেই সাথে ওদের সাহসের প্রশংসাও করতে হবে। সেকালের পারস্পেক্টিভে এটা কিন্তু ছিল চূড়ান্ত মাত্রার দুঃসাহসিক যাত্রা। আজ আমাদের জন্য অন্য কোন গ্রহে বসতি স্থাপন করা যতোটা কঠিন, ইউরোপীয়দের অভিযানগুলোও ঠিক ততোটাই কঠিন আর অনিশ্চিত ছিল।

সেসময় যে মানুষ অন্য দেশ দখল করতে যাত্রা করতো না, তা না। কিন্তু সেটা ছিল নিজেদের আশেপাশের চল্লিশ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খুব দূরে কোথাও যাত্রা করে সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা এট লিস্ট কেউ ভাবতো না। তাও অজানা আর দীর্ঘ সমুদ্রপথে। আলেকজান্ডার বহুদূর থেকে এসে ভারবর্ষে আক্রমণ করসেন। কিন্তু এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি, বা থেকে যাননি। থেকে গেছে মোগলরা; যারা এক অর্থে আমাদের প্রতিবেশীই ছিল।

আর একটা উদাহরণ দিই। রোমানরা এত্রুরিয়া জয় করসে ৩০০-৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এত্রুরিয়া রক্ষা করার জন্য তারা জয় করসে পো ভ্যালী (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)। পো ভ্যালী সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য জয় করসে জয় করসে প্রোভেন্স (১২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে), প্রোভেন্সকে রক্ষা করার জন্য গল (আজকের ফ্রান্স, ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) আর গলকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটেনের দখল বুজে নিসে ৫০ খ্রিস্টাব্দে। লন্ডন থেকে রোমে যাইতে তাদের ৪০০ বছর লেগে গেছে। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা ভুলেও লন্ডন জয়ের স্বপ্ন দেখতো না। ইউরোপীয়রা সেটাই দেখসে। আগের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভেঙে সম্পূর্ণ অজানার ইদ্দেশ্যে যাত্রা করসে। আর সফলও হইসে।

আজ যে আমরা সবাই এক পৃথিবীর বাসিন্দা, এক ধরণী মাতার সন্তান---এই বোধটা কিন্তু ইউরোপীয়দের এই অভিযানগুলোই আমাদের মধ্যে তৈরি করসে। এর মাশুলও আমাদের দিতে হয়েছে। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে মহাদেশ ইউরোপীয়দের নামে লিখে দিয়ে।

দশ কিস্তি শেষ

শেষটা করি মন্টেজুমার গল্প দিয়ে।

মন্টেজুমা ছিলেন আজটেকদের সম্রাট। আজটেকদের শেষ সম্রাট।

শেষ সম্রাট বলেই এই গল্পে আরো একটা চরিত্র চলে আসবে। ইনি গল্পের ভিলেন। শক্তিশালী এই ভিলেনের নাম কর্টেজ।

গল্পের পটভূমি ১৫০০ সাল, আজকের আমেরিকা। আজটেকরা তখন এই আমেরিকায় সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যটির মালিক।

১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন তার সোনার তরী নিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে এসে হাজির হন, তখন থেকেই সেখানকার আদি বাসিন্দাদের কলোনাইজ করা শুরু করেন। ঐ কলোনীগুলো ছিল পৃথিবীর বুকে এক টুকরো দোযখ। বাসিন্দাদের সেখানে খনি আর খেতখামারে দাস হিসেবে খাটানো হত। অমানবিক অত্যাচার আর ইউরোপীয়দের

আনা জীবাণুর কবলে পড়ে অতি অল্প সময়েই তারা পটাপট ইহধামের মায়া ত্যাগ করতে লাগলো।

গোটা ক্যারিবীয়ান দ্বীপপুঞ্জ বলতে গেলে জনশূন্য হয়ে গেলো। এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য তখন আফ্রিকা থেকে দাস আমদানির কালচার শুরু হল। আজ আমরা যে ক্যারিবীয়দের দেখি, তার বড় অংশটাই এই আফ্রিকানদের বংশধর। সহী ক্যারিবীয়ানদের দেখা পাওয়া আজ দুষ্কর।

আজটেকদের দরজার ঐপাশেই ঘটনাগুলো ঘটছিল। যদিও আজটেকরা এর কিছুই জানতো না। ১৫১৯ সালে তাই কর্টেজের নেতৃত্বে স্প্যানিশরা যখন আজটেকদের দরজায় কড়া নাড়ে, তখন বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। আজ যদি পৃথিবীর বুকে এলিয়েন নেমে আসে, তখন আমরা যেমন অবাক হব, আজটেকরাও ইউরোপীয়দের দেখে ঠিক ততোটাই অবাক হয়েছিল।
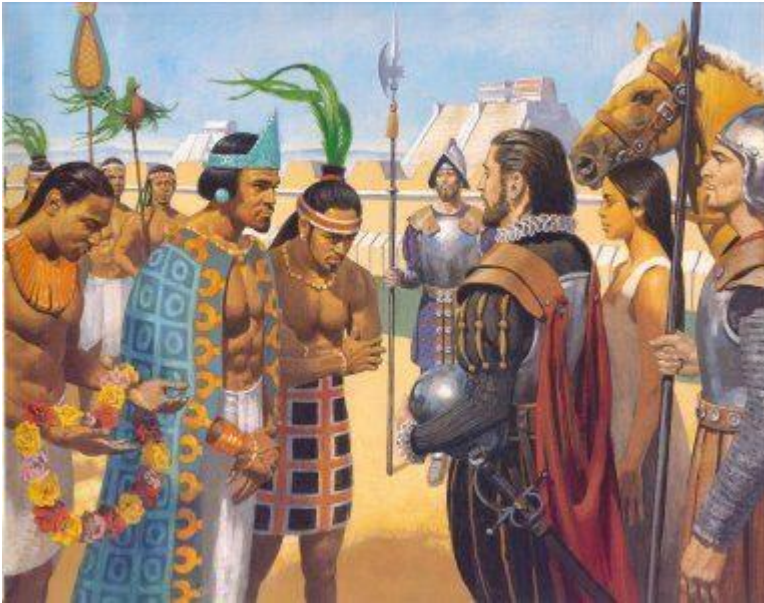
তাদের সাম্রাজ্যের বাইরেও যে আনুষের অস্তিত্ব আছে---এটা ছিল তাদের ধারণার বাইরে। ইউরোপীয়রা কি মানুষ না অন্য কিছু---এটাই তারা ডিসাইড করে উঠতে পারছিল না। মানুষ হলে এরকম ধবল শাদা হবে কেন? গা থেকে এরকম গন্ধই বা বেরোবে কেন? এইখানে বলে রাখি, ইউরোপীয়রা কিন্তু দিনের পর দিন গোসল না করে থাকতে পারতো!

চেহারা সুরত যাই হোক, ইউরোপীয়দের সাথের জিনিসপত্র দেখে তারা মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। এতো বড় বড় জাহাজ তারা বাপের জন্মে দেখেনি। ঘোড়ার মত দ্রুতগামী প্রাণীর সাথেও তাদের পরিচয় সেই প্রথম। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, ইউরোপীয়দের হাতের লাঠি থেকে আগুনের হলকা বেরোয়। কেবল দেবতারাই এরকম লাঠির মালিক হয়ে থাকেন। পাঠকের জন্য ছোট্ট কুইজ। বলতে হবে, এই লাঠিটি আসলে কী?..!

নাহ! এরা দেবতা না হয়ে যায় না। হয় দেবতা নয়তো শয়তান।

এখন এরা মানুষ না দেবতা না শয়তান---এটা নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে করতেই সময় চলে যেতে লাগলো। এরা যে সাম্রাজ্যের পটেনশিয়াল শত্রু, এদের বিরুদ্ধে যে এখনই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার---এটা তাদের মাথায় এলো না। সাড়ে ৫শ' মানুষের একটা দল এই বিশাল সাম্রাজ্যের আর কী-ইবা ক্ষতি করবে---এই ভেবে তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে লাগলো।

কর্টেজ এর সুবিধাটাই নিলেন। জাহাজরূপী স্পেসশিপ থেকে অবতরণ করে তিনি স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে বললেন, স্পেনের রাজা তাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন সম্রাট মন্টেজুমার কাছে। মন্টেজুমার সাথে দেখা করতে চায় সে।

ডাহা মিথ্যা কথা। স্পেনের রাজা কস্মিনকালেও মন্টেজুমার নাম শোনেননি। কর্টেজ নিজেই এসব তথ্য যোগাড় করেছে স্থানীয় আজটেক বিরোধী মহলের কাছ থেকে।

এরা তাকে আজটেকদের রাজধানী পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কর্টেজ বিনা বাধায় রাজধানীতে প্রবেশ করলেন।

মন্টেজুমার সাথে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় কর্টেজ তার সৈন্যদের একটা সিগনাল দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিশরা সম্রাট মন্টেজুমার বডিগার্ডদের কচুকাটা করলো। সম্রাট আর সম্রাট রইলেন না। পরিণত হলেন সম্মানিত বন্দীতে।

সুঁচ হয়ে ঢোকা আর ফাল হয়ে বেরোনো বোধয় একেই বলে। কর্টেজ তবু স্বস্তি পেল না। সম্রাটকে তো বন্দী করলো। কিন্তু তার চারপাশে যে লক্ষ লক্ষ এ্যাজটেক রয়েছে---এদের কী করবে সে? সবাইকে তো আর একবারে ফেলা সম্ভব না এই ৫০০ সৈন্য দিয়ে। কারো কাছে যে সাহায্য চাইবে---সেটাও সম্ভব না। সবচেয়ে কাছের স্প্যানিশ বেসটা রয়েছে এখান থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরে। কিউবায়।

কর্টেজ করলো কি---সে মন্টেজুমাকে প্রাসাদে বন্দী রেখে দিল। কিন্তু এমন একটা ভাব করলো যেন এখনো মন্টেজুমাই দেশ চালাচ্ছেন। সে জাস্ট বিদেশী গেস্ট। আজটেকদের সমস্যা ছিল---তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল অত্যধিক সেন্ট্রালাইজড। সম্রাটের আদেশই ছিল এখানে শেষ কথা। আর এখন সম্রাটের আদেশ মানে তো দস্যু কর্টেজের আদেশ। আজটেক এলিট সেই আদেশই নতমস্তকে পালন করছিল।

কয়েক মাস এইভাবে চললো. এর মধ্যে চতুর কর্টেজ চারদিকে তার দলবল পাঠিয়ে গোটা সাম্রাজ্য সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেলো। স্থানীয় ভাষা, কালচার---সব কিছু সম্পর্কে।

আজটেক এলিটরা যখন শেষমেশ বিদ্রোহ করলো, তখন তারা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে আরলো না। কর্টেজ তখন সাম্রাজ্যের ফাঁকফোকরগুলো খুব ভালোমত ইস্তেমাল করা শিখে গেছে। আজটেক শাসকদের বিরুদ্ধে একদল লোক তো খ্যাপা ছিলই। তাদেরকে সে নিজ হাতের মুঠোয় নিয়ে এল।

এই স্থানীয়রা ভেবেছিল, আজটেকদের উৎখাত করে তারা ক্ষমতায় বসে যাবে। স্প্যানিশদের আসল চরিত্র তাদের জানা ছিল না, জানা ছিল না অতি সম্প্রতি

ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে তাদের কীর্তিকলাপের কথা। এই অল্প ক'টা স্প্যানিশ যে এক সময় তাদের জন্য বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিবে---এ ছিল তাদের দুঃস্বপ্নের বাইরে।

এর মধ্যে কর্টেজ কিন্তু ইয়াহিয়া খান স্টাইলে আশপাশ থেকে যথেষ্ট সৈন্য এনে মজুদ করে রেখেছে। স্থানীয়রা যখন বুঝলো, কী হচ্ছে---ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মন্টেজুমার গল্প এখানেই শেষ। পরিশিষ্ট হল, ১০০ বছরের মধ্যেই স্থানীয় জনসংখ্যার ৯০ ভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ক্যারিবীয়রা যে কারণে মরেছিল, এরাও ঠিক সেই কারণেই মরলো। এক অত্যাচারে। আর বেশিরভাগ মারা পড়লো ইউরোপীয় জীবাণুর বিরুদ্ধে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায়। আজ যে জীবাণু অস্ত্র কনশাসলি তৈরি হচ্ছে, সেকালে সেই জীবাণু অস্ত্রই আনকনশাসলি একটা জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়েছিল।

হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। দশ বছর পর একই ঘটনা ঘটেলো ইনকাদের সাথে।
জ্ঞান বা জ্ঞানের আগ্রহকে যে গ্লোরিফাই করা হয়---তা তো আর এমনি এমনি না। ইউরোপীয়দের যে জ্ঞান তৃষ্ণাটা ছিল, অজানাকে জানার যে আগ্রহ ছিল, তার ভগ্নাংশও যদি আজটেক বা ইনকাদের থাকতো, তবে আজ হয়তো তারা ইতিহাসের পাতায় না থেকে মর্ত্যের পৃথিবীতেই থাকতো। ক্যারিবীয়দের দুর্দশার কথা জানলে হয়তো আজটেকরা আরো প্রিপেয়ার্ড থাকতো। কিংবা আজটেকদের কথা জানলে ইনকারা। কিন্তু ঐ যে, নিজেদের সীমানাকেই পৃথিবীর সীমানা ভাবা---এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের সর্বনাশ করলো।

'নলেজ ইজ পাওয়ার', বা আজকের ভাষায় 'ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার'---তাই কোন তত্ত্বকথা নয়; ইতিহাস নিজেই এর বড় প্রমাণ।

অধ্যায় এগারো কিস্তি শূন্য

দুনিয়ায় সব কিছু একসাথে হয় না।

ফরাসীরা আমাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা শিখাইসে। অথচ ফরাসী দেশেই সাম্য বা স্বাধীনতা---কোনটাই পুরাপুরি নাই।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমাদের সাম্যের বাণী শোনান। কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে। স্বাধীনতার লোভে তার দেশের মানুষ তাই নব্বই মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তার দেশের মানুষ যেই ড্রীমল্যান্ডে আসে, এইখানে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেটা সাম্যের বিনিময়ে। এখানকার বড় শহরগুলোতে তাই হোমলেস মানুষের সংখ্যা চোখে পড়ার মত। এখানকার কোম্পানির সিইও আর সাধারণ এমপ্লয়ীর বেতনের পার্থক্য অশ্লীল রকমের বেশি। বাস্তু পিরামিডের সবচেয়ে উপরের মানুষ আর সবচেয়ে নিচের মানুষটার দূরত্ব এখানে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

ঠিক একই না হলেও কাছাকাছি ব্যাপারটা ঘটে চলেছে আমাদের পারিবারিক জীবনে। ক্যারিয়ার ঠিক রাখতে গেলে আমরা ফ্যামিলির সদস্যদের সময় দিতে পারি না। আবার পরিবারের সাথে নিয়মিত কোয়ালিটি টাইম কাটাতে গেলে ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যায়।

যে লোকটাকে তাই ছুটির দিনেও বাইরে বেরোতে হয় বিদেশী ক্লায়েন্ট এ্যাটেন্ড করার জন্য, সেই এই যন্ত্রণাটা বোঝে। তার বাচ্চা মেয়েটা তাকে সারা সপ্তাহে কাছে পায় না। ছুটির দিনে মেয়ের সাথে খেলবার কথা দিয়ে যখন সে বেরোতে নেয় আর

মেয়েটা তার শার্টের কোঁচা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমরা বুঝি---আধুনিক সময় আমাদের কী দিচ্ছে আর কী কেড়ে নিচ্ছে।

সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা বাজার---যেটাই বলেন, তার সাথে পরিবারের এই দ্বন্দ্বটা আধুনিক সময়ের সবচেয়ে বড় উপাখ্যান।

আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব পার হয়ে আসছি, কৃষি বিপ্লব পার হয়ে আসছি---সব সময়ই পরিবার আমাদের সাথে ছিল। সুতাটা একটুকুও ছিঁড়ে নাই। পরিবার থেকেই গোত্র হইসে, সম্প্রদায় হইসে, সাম্রাজ্য পর্যন্ত হইসে---কিন্তু পরিবারের কলকব্জায় সে আঘাত করতে পারে নাই।

আমরা অসুস্থ হইসি। পরিবারের সদস্যরা আমাদের সেবাযত্ন করসে। বুড়া হইসি। বাড়ি বানাবো। হাত লাগবে। পরিবার প্রতিবেশীরাই এগিয়ে আসছে। ব্যবসা করবো। লোন লাগবে। ঐ পরিবার প্রতিবেশীরাই ছিল শেষ আশ্রয়স্থল। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি---সব কিছুর আঁতুরঘর ছিল এই পরিবার।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও সামলাইসে এই পরিবার। মিং আমলে চায়নায় একটা সিস্টেম ছিল। এই সিটেমকে বলা হত Baojia সিস্টেম। দশটা পরিবার মিলে হইতো একটা Bao। আর দশটা Bao মিলে তৈরি হত একটা Jia। Bao এর এক সদস্য কোন অন্যায় করলে অন্যদেরও তার শাস্তি পেতে হত। স্পেশালী Bao এর মুরুব্বিদের। ট্যাক্সও ঐ

মুরুব্বীরাই কালেক্ট করতো। বুড়োরা তো জানতো, কোন পরিবারের আয় কেমন। ঐ অনুযায়ী ট্যাক্সের রেট ঠিক করে দিত। এতে একটা বিশাল সুবিধা হইসিলো মিং রাজাদের। বেতন দিয়ে হাজার হাজার ট্যাক্স কালেক্টর পোষা লাগে নাই তাদের। পরিবারগুলোই প্রশাসন সামলাইসে।

তার মানে এই না যে---পরিবার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা মাত্রই সুখস্বর্গ। ১৭৫০ সালের এক মানুষের কথা চিন্তা করেন। তার বাপ-মা দুইজনই মারা গেলে তাকে রীতিমত পথে বসতে হতো। অনেক সময় গোত্রও তার দায়িত্ব নিত না। সেক্ষেত্রে সে হয় সৈন্যদলে নাম লেখাতো নয়তো বেশ্যালয়ে।

গত দুই শতাব্দীতে এই চিত্রে একটা বড়সড় পরিবর্তন আসছে। সমাজের নিউক্লিয়াস থেকে পরিবার আস্তে আস্তে সরে আসছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই রাষ্ট্র আর বাজার ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতেসে। আর বাজার যতো স্ট্রং হচ্ছে, পরিবার, পারিবারিক মূল্যবোধ---এরা ততো দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বাজার আমাদের 'ইনডিভিজুয়াল' হতে বলতেসে। বলতেসে, বাপ-মা'র কথা শোনার দরকার নাই। যেমনে খুশি জীবন কাটাও। যার সাথে খুশি জীবন কাটাও। তোমার জীবন তোমার!

মামা'জ বয়দের এখানে খুব করুণার চোখে দেখা হয়। বাজার আমাদের কানে প্রতিনিয়ত এই মন্ত্র বাজিয়ে যায়, বাপ-মা'র পায়ের নিচে পড়ে থাকার কোন মানে নাই। দরকার হইলে আমরা তোমার টেক কেয়ার করবো। আমার জন্য কাজ করো। আমি তোমার অসুখ হইলে তোমারে সারায়ে তুলবো। বাড়ি বানানোর লোন দিব। আর বুড়া হইলে পেনশন।

এই লোভে পড়ে মানুষ বাজারকে সময় দিতেসে। কিন্তু বাজারকে সময় দিতে গিয়ে দেখে, সে নিজে একা হয়ে পড়তেসে। তার কথা শোনার কেউ নাই। সুখ-দুঃখের আলাপ করার কেউ নাই। মার্কেট ইকোনমির সাথে পারিবারিক জীবনের এই দ্বন্দ্ব আমাদের রীতিমত ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। বায়োলজিক্যাল বাপ-মা'র ভূমিকা আজ এখানে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ রাষ্ট্র আমাদের মা। বাজার আমাদের বাপ।

এক সময় যেমন ম্যাচমেকারের মূল দায়িত্বটা পালন করতো আমাদের বাবা-মা। আর্থিক লেনদেন যতোটুকুই হতো, সেটা বৈঠক ঘরে। পিতায় পিতায়। এই লেনদেনটাই এখন বৈঠকঘর ছাড়িয়ে চলে এসেছে রেস্তোঁরা আর কফিশপে। টাকাটা এখন বাবাদের পকেটে না গিয়ে যায় সুন্দরী ওয়েট্রেসের পকেটে। রেস্তোঁরায় এলেই তো আর প্রেম করা যায় না। প্রেম করার জন্য যে মিনিমাম যোগ্যতা, সেটা অর্জন করার জন্য আমাদের যেতে হয় জিমে। ফ্যাশন ডিজাইনার আর ডায়েটিশিয়ানদের কাছে।

জিম ইনস্ট্রাক্টর কিংবা ডায়েটিশিয়ানও আমাদের বিনা পয়সায় সার্ভিসটা দেয় না। এই পয়সাটা আসে আমাদের করা ওভারটাইম থেকে। কিংবা ছুটির দিনের এক্সট্রা খাটুনি থেকে। যে সময়টুকু আমাদের পরিবারকে দেয়ার কথা ছিল, সেই সময়টুকু খোলা বাজারে সওদা করে।

বাজার অর্থনীতি এইভাবে তার দেয়া স্বাধীনতার মূল্য পুরোপুরি উশুল করে নেয় আমাদের জীবন থেকে।

এগারো কিস্তি এক

একদল ইঁদুরের উপর একবার একটা পরীক্ষা করা হল। ইঁদুরগুলোকে দুটো দলে ভাগ করে বড় করা হল। একদলকে বাবা ইঁদুরের সাথে একই খাঁচায় বড় করা হল। আরেক দলকে বাবা ইঁদুর ছাড়াই বড় করা হল।

দেখা গেলো, যেসব ইঁদুর বাবা ইঁদুর ছাড়াই বড় হচ্ছে, তারা বেশি হিংস্র আর এ্যাগ্রেসিভ হয়ে ইঠছে। মানুষের মত পশুপাখিদেরও যে স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসার দরকার আছে, এটাই তার একমাত্র প্রমাণ না।

১৯৫০ এর দিকে মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ হ্যারি হার্লো বানরদের নিয়া একটা পরীক্ষা করেন। জন্মের পরপরই হ্যারি মা বানর থেকে শিশু বানরকে আলাদা করে ফেলেন। সেই শিশু বানরকে লালন পালনের ভার দেয়া হয় নকল মা বানরের উপর।

প্রতিটা খাঁচায় দুটো করে নকল মা ছিল। এক মা'র শরীর ধাতব তার দিয়ে তৈরি। তার গায়ে আবার দুধের বোতল ফিট করে রাখা হইসে যেন শিশু বানরটা তার তৃষ্ণা মেটাতে পারে। আরেকটা মা'র শরীর কাঠের। তার উপর কাপড়-চোপড় জড়ানো। এই মা দেখতে অনেকটা আসল মা বানরের মতন।

শুধু দেখতেই। এই মা'র শরীরে খানা-খাদ্য কিছু ফিট করা ছিল না। হার্লো ভাবসিলেন, দুধ যেহেতু ধাতব মা'র কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, বানর শিশু সারাদিন তার গায়েই পেল্টে থাকবে।

হার্লোকে অবাক করে দিয়ে বানর শিশুরা দিনের বেশিরভাগটা সময় কাপড় পরা মায়ের সাথেই কাটায়। এমনকি তারা যখন ধাতব মায়ের বুকের দুধ খায়, তখনও দুই পা দিয়ে কাপড় পরা মা-কে আঁকড়ে রাখে।

হার্লো ভাবলেন, বানরগুলার কি ঠান্ডা লাগতেসে? ওমের জন্য কি কাপড় পরা মাকে আঁকরায়ে ধরতেসে? উনি ধাতব মা'র শরীরের ভেতর একটা ইলেকট্রিক বাল্ব পুরে দিলেন যেন সেটা থেকে তারা তাপ পায়। দেখা গেল, এতো সুযোগ সুবিধার পরও কাপড় মা-কে তারা ছাড়ছে না।

ম্যাটারিয়েলিস্টিক চাহিদার চেয়ে সাইকোলজিক্যাল চাহিদাটাই যে বড়, এই বানর শিশুগুলো তা আবারও প্রমাণ করে ছাড়লো।

হ্যাঁ, মানুষ গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, সবই চায়। এর পাশাপাশি সে আরেকটা জিনিস চায়। সে আরেক মানুষের সাথে বন্ধনে জড়াতে চায়। সে চায়, তাকে নিয়ে আরেকটা মানুষ ভাবুক। তার দুঃখে কাঁধে হাত রাখুক। তার মৃত্যুর পর দু ফোঁটা চোখের জল ফেলুক। পশুপাখি হয়তো এতোটা চায় না। কিন্তু তারাও বন্ধনে জড়াতে চায়। মা-বাপ, ভাই-বোনকে নিয়ে একটা সুস্থ সোশ্যাল জীবন চায়।

আমরা ক্ষমতার জোরে তাদেরকে এই জীবন থেকে তো বঞ্চিত করছিই, সেই সাথে প্রতি বছর ৫০ বিলিয়ন প্রাণী হত্যা করে নিজেদের পেটের চাহিদা মেটাচ্ছি। অবশ্য পৃথিবীটাই এমন; একজনের সর্বনাশ করে আরেকজন তার পেটের ক্ষুধা মেটায়।

এর ফলে আমাদের একটা লাভ হইসে---যেটা খুব স্পষ্ট। আমাদের খাদ্যের পরিমাণ অনেক অনেক বাড়সে। সবাইকে এখন আর লাঙল নিয়ে মাঠে দৌড়াতে হয় না। আমেরিকাতেই তো মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এখন কৃষিকাজ করে। ঐ ২ শতাংশই গোটা মহাদেশের খাদ্য চাহিদা মেটাচ্ছে।

বাকি ৯৮ পার্সেন্ট লোক তাহলে কী করছে? এরাই মোবাইল বানাচ্ছে, কম্পিউটার বানাচ্ছে, ক্যামেরা আর ওয়াশিং মেশিন বানাচ্ছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমাদের চাহিদার চেয়ে বেশি জিনিস উৎপাদিত হতে লাগলো। এর ফলে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল।

এতো জিনিস কিনবে কে?
আর কে কিনবে? আমার আপনার মত সাধারণ মানুষ কিনবে। আমরা না কিনলে পুঁজিবাদের চাকাটাই যে বন্ধ হয়ে যাবে। নিজ অস্তিত্বের স্বার্থেই পুঁজিবাদ আমাদের মধ্যে কেনার একটা অভ্যাস বুনে দিয়েছে। এর একটা বলিহারি নামও দিয়েছি আমরা। যাকে বলি কনজ্যুমারিজম।

ইতিহাসে বেশিরভাগটা সময় জুড়েই ছিল---Necessity is the mother of invention. এখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে---Invention is the mother of necessity. কাল বাজারে আইফোনের একটা নতুন মডেল আসুক। আমরা অনেকেই চোখ বন্ধ করে সেটা কিনতে লাইন দেব। নতুন কী ফিচার যোগ হল---সেটা না জেনেই।

আমরা দরকারি জিনিস কিনছি। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে কিনছি এমন জিনিস যা আমাদের না হলেও চলতো। কেন? স্রোতের সাথে থাকার জন্য। পাঁচজন মিলে যখন আড্ডা মারছি, তখন দেখা যায় বাকি চারজন আইফোনের নতুন ফিচার নিয়ে আলাপ করছে। পঞ্চম ব্যক্তিটিকে তখন জোয়ির মত মুখ হাঁ করে বসে থাকতে হয়। না বুঝেই মাথা নাড়তে হয়।

আমরা কেউই এই আনইজি অবস্থায় পড়তে চাই না। আমরা চাই কমফোর্ট জোনে থাকতে। স্রোতের সাথে থাকতে। ম্যানুফ্যাকচাররা আমাদের এই ইনসিকিউরিটির খোঁজ রাখেন। বাজারে হয়তো অলরেডি প্রায় পারফেক্ট একটা মডেল আছে, তারপরও এরা বছর বছর একটা দুটো হালকা ফিচার যোগ করে নতুন মডেল ছাড়বে বাজারে। আর পাবলিকও সেটা খাবে।

Shopaholic শব্দটা তাই এমনি এমনি আসে নি। আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক---সমস্ত উৎসবের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে এই কনজ্যুমারিজম। ক্রিসমাসকে বলা হয় পৃথিবীর

বৃহত্তম শপিং ফেস্টিভ্যাল। Memorial Day নামে একটা দিবস আছে আমেরিকায়। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের স্মরণে। আমেরিকানরা এটাকেও শপিং উৎসব বানিয়ে ফেলেছে। খুব কম আমেরিকানই আজ এই দিনের ইতিহাস তাৎপর্য জানে। তাদের কাছে এটা আর দশটা উৎসবের মতই একটা উৎসব যেদিন কেনাকাটায় অনেক ছাড় পাওয়া যায়। মানুষ কার্ট ভরে শপিং করবে---যীশু বা ঐ সৈন্যরা নিশ্চয়ই এই আশায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেনি!

কনজ্যুমারিজমের থাবা আমাদের সংস্কৃতিতেও কি পড়ছে না? পড়ছে। এবং খুব ভালোভাবেই পড়ছে। আপনি হয়তো নতুন প্রজন্মকে নিয়ে হতাশ হতে পারেন---এরা স্বাধীনতা দিবস আর বিজয় দিবস গুলিয়ে ফেলে। কোনটা শহীদ দিবস আর কোনটা ভালবাসা দিবস---তার পার্থক্য করতে পারে না।

সত্যিটা হচ্ছে---ভোগবাদ যখন একটা সমাজে আস্তে আস্তে শেকড় গাড়া শুরু করে, তখন তার কাছে আলাদা কোন উৎসবের তাৎপর্য থাকে না। সবকিছুই তখন তার কাছে কেনাকাটার, মৌজ করার একটা উপলক্ষ মাত্র। যে বাচ্চাটা তার বড় ভাই/বোনকে দেখছে, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২১শে ফেব্রুয়ারী কিংবা ২৬শে মার্চ---তারিখ যাই হোক না কেন, তারা শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে হাসিমুখে বেরোচ্ছে, খাচ্ছে, ছবি তুলছে---তখন তার কাছে আপনি ইতিহাসের পাঠ কীভাবে পৌঁছাবেন? মানুষ তো বই পড়ে ইতিহাস জানে না। জানে বর্তমান থেকে। প্র্যাক্টিক্যালী দেখে।

ভোগবাদ যতো বাড়বে, নতুন প্রজন্মও পাল্লা দিয়ে ইতিহাস থেকে, তার শেকড় থেকে ততো দূরে সরে যাবে---খুব তিতা হলেও এটাই সত্য। এটাই নিয়তি।

কনজ্যুমারিজমের আর মাত্র দুটো উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো।

পশ্চিমে মদ্যপান হালাল। এতে তাদের দুটো লাভ হচ্ছে। মদের বিক্রি হচ্ছে। এদিকে হার্টের ডাক্তারের চেম্বারে লাইনও বাড়ছে। এক ঢিলে দুই ইন্ডাস্ট্রির লাভ।

আরেকটা লাভ হচ্ছে পিজা, বার্গার---এইসব বেঁচে। লোকে পিজা খেতে খেতে ফুলছে। স্থূলত্ব নামের এক মহামারী দেখা দিচ্ছে গোটা মহাদেশে। আবার সেই স্থূলত্ব নিরাময়ের জন্য লোকে ডায়েটিশয়ানের কাছে যাচ্ছে। ডায়েট চার্ট নিচ্ছে। আবারও দুটো ইন্ডাস্ট্রির লাভ।

এই ক্যাপিটালিস্ট-কনজ্যুমারিস্ট কমপ্লেক্সের সবচেয়ে বড় বিজয়টা অবশ্য অন্যখানে। ইতিহাস জুড়েই মানুষ এমন সব জীবনধারার অনুসারী হয়ে এসেছে, যা সে কখনোই ঠিকমত ফলো করতে পারে নি। খ্রিস্টানরা যীশুর দেখানো পথে চলেনি। মুস্লিমরাও নবীর দেখানো পথ থেকে সরে এসেছে।

কনজ্যুমারিজমই সম্ভবত প্রথম ধর্ম, যে ধর্মের নবীরা আমাদের যা করতে বলেন, আমরা ঠিক তাই করি। এতো চমৎকার অনুসারির দল আর কোন নবী পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। মুসা আর ঈসা যদি স্টিভ জবসকে খানিক ঈর্ষা করেও থাকেন---এতে অবাক হবার কিছু নেই।

এগারো কিস্তি দুই

ন্যাচারাল সাইকেল বলে একটা ব্যাপার ছিল কৃষিযুগে। এখনকার মত সেকেন্ড ধরে সময় গণনার কোন উপায় ছিল না তখন। মানুষজনের তেমন কোন আগ্রহও ছিল না এই ব্যাপারে। জানেই তো কোন সময় বীজ বুনবে আর কোন সময় সেটা ফসল হয়ে ঘরে উঠবে।

তাই বলে যে দিন, মাস, সপ্তাহের কোন আইডিয়া ছিল না---তা না। ব্যাবিলনীয়রা যেমন চান্দ্রমাসের হিসাব রাখতো। এই চক্রের প্রথম দিনে চাঁদের সামান্য আভাস দেখা যায়। সাত দিন পর দেখা যায়, চাঁদটা একটা অর্ধগোলাকৃতি রূপ নিয়েছে। আরও সাত দিন পর আমরা পূর্ণ চন্দ্রের দেখা পাই। এইভাবে প্রায় আরো সাত দিন পর চাঁদটা আবার ছোট হয়ে অর্ধগোলকের রূপ নেয়। প্রায় আটাশ দিনের দিন বেচারী সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়।

'প্রায়' বলছি এই কারণে যে চাঁদ বেচারী মানুষের পাতানো এই হিসাব পুরোপুরি ফলো করতো না। যে কারণে ঠিক চার সপ্তাহে কখনো এক মাস হয় না। ব্যাবিলনীয়রা এজন্য করতো কি---মাসের তিন সপ্তাহ হত ওদের সাত দিনে। লাস্ট সপ্তাহটা আট কি নয় দিনে হত। সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য। যেন পরের মাসের প্রথম দিনটা আবার নতুন চাঁদ দিয়ে শুরু হয়।

সাত দিনে কেন সপ্তাহ, দশ দিনে বা বার দিনে কেন নয়---তার একটা মোটামুটি আইডিয়া পাওয়া গেলো। সাত নম্বর দিনটাকে ব্যাবিলনীয়রা পবিত্র দিন হিসেবে গণ্য করতো। এই দিন অন্য সব কাজকর্ম নিষেধ ছিল। এই দিন তুমি রেস্ট নিবা আর দেবতার এবাদত করবা।

সপ্তম দিনের এই ব্যাপারটাকে ইহুদীরা বলে Sabbath. Black Sabbath নামে একটা রক ব্যান্ডও আছে। এই Sabbath শব্দের আক্ষরিক অর্থই Day of rest. বিশ্রামের দিন। ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী বানিয়ে সাত দিনের দিন রেস্ট নিসিলেন। কাজেই, আমাদেরও সাত দিনের দিন রেস্ট নেয়াটা আসে আর কি!

Our Week Days are Ruled by the Seven Sumerian Gods.

UTU, the Sun God, rules on Sunday.

The Sumerians had seven gods as rulers of the planets. They are ***Utu, Nanna, Gugalanna, Enki, Enlil, Inanna*** and ***Ninurta***. These Sumerian gods are the origin of the seven day week in all world cultures. The exceptions are Egyptian, Chinese and American indigenous calendars, which once had a 10-day week.

Enki, God of water, wisdom, semen and the planet Mercury, rules on Wednesday.
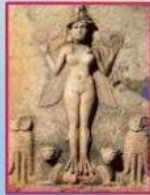
Inanna, goddess of beauty, fertility and Venus, rules on Friday.

Planets	Weekdays	Sumerian Gods	Roman Gods
Sun	Sunday	Utu	Sôl
Moon	Monday	Nanna	Luna
Mars	Tuesday	Gugalanna	Mars
Mercury	Wednesday	Enki	Mercurius
Jupiter	Thursday	Enlil	Iuppiter
Venus	Friday	Inanna	Venus
Saturn	Saturday	Ninurta	Saturnus

The planets, the weekdays, the seven Sumerian gods and their Roman names.

Page 23

তারপরও কথা থেকে যায়। সাত দিনের সপ্তা তো ইহুদীদের চর্চা। ক্ষমতা তো ইহুদীদের হাতে ছিল না। ক্ষমতা ছিল প্যাগান রোমানদের হাতে। রোমানদের সপ্তাহ সাত দিনে ছিল না। তাদের সপ্তাহ ছিল আট দিনে। দিনগুলোর নাম অক্ষর দিয়ে রাখা হত। সপ্তাহ শুরু হত A দিয়ে। আর শেষ হত H দিয়ে। Holiday শব্দটার জন্ম কি এই H থেকেই?

অষ্টম দিনের দিন রোমের বাজার গরম হয়ে উঠতো। সবাই কেনাবেচা করতে বাজারে ছুট দিত। দীর্ঘদিন এই নিয়মই চালু ছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার ইতিহাসে অনেকগুলো স্থায়ী পরিবর্তন আনসেন। তার মধ্যে একটা হল আট দিনের জায়গায় সপ্তাহকে অফিশিয়ালী সাত দিনের করা। আমরা কনস্টানটাইনের ধারাবাহিকতারই অনুসারী মাত্র।

সে যাই হোক। দিন, সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরের ধারণা সে সময়েও ছিল। এ সময়েও আছে। পরিবর্তনটা ঘটসে কোয়ান্টিফিকেশনে। ঘড়ি ধরে সময় বলা বা সংখ্যা ধরে বছর গণনার ধারণা তখন ছিল না। আপনি যদি টাইম ট্রাভেল করে মধ্যযুগে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করেন, ভাউ, এটা কোন সাল---সে আপনার কব্জির ঘড়ি কিংবা হাতের মোবাইল দেখে যতোটা বিস্মিত হবে, এই প্রশ্ন শুনেও ঠিক ততোটাই ভড়কে যাবে।

ঘড়ি ধরে সময় গণনার জন্ম হইসে শিল্প বিপ্লবের পর পর। আধুনিক ঘড়ি শিল্প বিপ্লবের সন্তান। মধ্যযুগের একজন জুতো নির্মাতার কথা ধরেন। সে তার জুতার সোল থেকে শুরু করে বাকল পর্যন্ত সবই নিজে বানাতো। সে যদি কোন একটা ধাপে একটূ বেশি সময় নেয়ও, তাতে অন্যদের কোন লাভক্ষতি হত না।

বিপ্লবের পর এই চেহারাটা বদলে যায়। অনেকগুলো মেশিনে করে হাজার হাজার জুতার পার্টস পার্টস করে বানানো হচ্ছে। এখন কোন একটা মেশিনের শ্রমিকের চোখে যদি সামান্য ঝিমুনি আসে কিংবা দেরি করে তার ওয়ার্ক স্টেশনে আসে, তার পরের স্টেশন, তার পরের স্টেশন এবং তার পরের স্টেশন---সবারই কাজে লেট হবে।

এই সমস্যার সমাধান কী?

সবাইকে ঘড়ি ধরে একই সময়ে আসতে বলা। খিদে পাক বা না পাক, সবাইকে একই সময়ে খেতে বাধ্য করা। চার্লি চ্যাপলিনকে যেমন করা হইসিলো Modern Times ছবিতে। আর কারো যদি কাজ ভালো লেগেও যায়, সে যদি আরো কাজ করতেও চায়-- তবুও তাকে এবং তার সাথের সবাইকে একই টাইমে বিদেয় করে দেয়া।

কারখানাগুলো তাদের এরকম টাইমেটেবিল চালুর পর থেকেই আস্তে আস্তে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও একে ফলো করা শুরু করে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল---সব খানে মানুষ নয়, সময় আর ঘড়ি রাজত্ব করা শুরু করে। এমনকি যেখানে এ্যাসেম্বলি লাইনের কিছু নাই, সেখানেও এই ঘড়িই রাজা হয়ে বসে। কারখানা যদি বন্ধ হয় পাঁচটায়, শুঁড়িখানা চালু হয় ৫টা ২ এ!

ও। আরেকটা সেক্টর তো বাদই পড়ে গেছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। কারখানার শিফট শুরু আটটায়। তার মানে ৭টা ৫৫তে সব শ্রমিককে ফ্যাকটরি গেটে নামিয়ে দিতে হবে। তা না হলে একে তো প্রডাকশনের ক্ষতি হবে, ওদিকে শ্রমিকদের বেতন কাটা যাবে।

১৭৮৪ সালে ব্রিটেনে প্রথমবারের মত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চালু হয়। ঘোড়ার গাড়িতে করে মানুষ আনা নেয়া। তখন খালি গাড়ি কখন ছাড়বে, সেটা শুধু বলা থাকতো। কখন পৌঁছাবে---তা কেউ জানে না। এর কারণও ছিল। একে তো ঘোড়ার গাড়ি মাশাল্লা স্লো। একবার রওনা দিয়ে কখন পৌঁছাবে---তা ঘোড়ার মর্জির উপর নির্ভর করে। এদিকে প্রতিটা শহরের তখন নিজস্ব লোকাল টাইমটেবিল ছিল। লন্ডনে যখন দুপুর ১২টা, লিভারপুলে তখন ১২টা ২০। ক্যান্টাবেরিতে ১১টা ৫০।

লিভারপুল আর ম্যানচেস্টারের মধ্যে প্রথম কমার্শিয়াল ট্রেন সার্ভিস চালু হয় ১৮৩০ সালে। দশ বছর পর প্রথম ট্রেন টাইম স্কেজিউল ইস্যু করা হয়। তখন আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়। এই ট্রেনগুলো ছিল ঘোড়ার গাড়ির চেয়ে অনেক ফাস্ট। কাজেই, এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে সময়ের হিসাব উলটা পালটা হয়ে যাচ্ছিল। লিভারপুল থেকে ১২টা ২০ এ রওনা দিয়ে আপনি লন্ডনে এসেও যদি দেখেন ১২টা ২০ ই বাজে তাইলে ক্যাম্নে কী?

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ট্রেন কোম্পানির মাথারা সব একসাথে বসলেন। তারা গ্রীনিচ মানমন্দিরের সময়ের সাথে সকল ট্রেনের স্কেজিউল সিনক্রোনাইজ করে নিলেন। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও আস্তে আস্তে এই টাইমটেবিলই জীবন যাপন করা শুরু করলো। পঞ্চাশ বছর পর ব্রিটিশ সরকার আইন পাশ করে যে, সকল প্রতিষ্ঠানকে গ্রীনিচ টাইম অনুসরণ করে চলতে হবে।

সেই থেকে আমরা সুর্যোদয়-সূর্যাস্তের ন্যাচারাল সময় নয়, সরকারের বেঁধে দেয়া সময় নিজেদের অভ্যস্ত করে নিতে শুরু করেছি।

ঘড়ি নিয়ে একটা মজার ঘটনা দিয়ে লেখাটা শেষ করি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন তো স্বাধীন ছিল। তো বিবিসি নিউজ নাৎসী আক্রান্ত ইউরোপেও প্রচারিত হত। প্রতিটা নিউজ প্রোগ্রাম শুরু হত বিগ বেনের আওয়াজ দিয়ে। (বিগ বেন লন্ডনের বিখ্যাত ঘড়ি)। এই আওয়াজ আবার ছিল লাইভ। মানে সত্যি সত্য ঘন্টি বাজিয়ে টেলিকাস্ট শুরু হত।

এখন জার্মান বিজ্ঞানীরা তো বস। এরা এক আওয়াজ থেকে আরেক আওয়াজকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারলো। তা দিয়ে লন্ডনের আবহাওয়া কেমন, আজকে রাতে এ্যাটাক করার জন্য উপযুক্ত কিনা---এইসব তথ্য বের করে ফেলতো। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস যখন এটা জানতে পারে, তখন তারা লাইভ ডিং ডং বাদ দিয়ে আগে থেকে রেকর্ড করা আওয়াজ বাজিয়ে নিউজ টেলিকাস্ট শুরু করলো।

কিন্তু এই আওয়াজটা তারা বাদ দিল না। কেননা, এই আওয়াজ ছিল স্বাধীনতার প্রতীক। মুক্তির প্রতীক।

এগারো কিস্তি শেষ

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় সুখে আছি বলেই আমরা ব্যাপারটাকে এ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারি না।

কথাটা আসলে সুখ হবে না, হবে শান্তি। স্মরণকালের ইতিহাসে আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে শান্তিতে আছি---এমনটা দাবি করলে আপনি হয়তো হৈ হৈ করে তেড়ে আসবেন। বলবেন, ইরাকের মানুষকে আপনি দেখেন না? কিংবা ফিলিস্তিনে আপনার চোখ যায় না?

মনে রাখতে হপবে, এগুলো কিন্তু এক্সেপশন। এক্সেপশনগুলোই পত্রিকার পাতার লীড নিউজ হয়। ভারত বা চায়নায় যে শ শ কোটি মানুষ যুদ্ধ ছাড়াই দিব্যি শান্তিতে ঘুমাতে যাচ্ছে-সেটা কখনো পত্রিকার নিউজ হবে না।

আজ মানুষ যুদ্ধে যতোটা না মারা যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে অন্য কারণে। ২০০০ সালের একটা পরিসংখ্যান দিই। এই বছর প্রায় ৩ লাখ মানুষ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে মারা যায়। সন্ত্রাসীদের হাতে মারা পড়ে আরো ৫ লাখের মত।

প্রতিটা মৃত্যুই দুঃখজনক। আমি জাস্ট একটা সংখ্যার মত করে মৃত্যুগুলো লিখে যাচ্ছি। যার হারায়, সে বোঝে। একটা মৃত্যু মানে একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাওয়া। একসাথে অনেকগুলো স্বপ্নের মৃত্যু ঘটা।

আবেগটুকু বাদ দিয়ে আমরা যদি ঈশ্বরের মত উদাসী চোখে এই মৃত্যুগুলো দেখি, তবে দেখবো, সে বছর গোটা দুনিয়ায় যতো মানুষ মারা গেছে তার মাত্র দেড় পার্সেন্ট মারা গেছে এই যুদ্ধ আর সন্ত্রাসী হামলায়। ঢের বেশি মানুষ মারা গেছে অন্য কারণে। ১২ লাখ মৃত্যু ঘটেছে গাড়ি দুর্ঘটনায়। আত্মহত্যা করেছে প্রায় ৮ লাখ।

এতো গেলো ৯/১১'র আগের কথা। ৯/১১'র পর তো অবস্থা আরো খারাপ হবার কথা। এট লিস্ট, যুদ্ধে মৃত মানুষের সংখ্যা হু হু করে বাড়ার কথা। মজার ব্যাপার হল, ২০০২ সালের পরিসংখ্যান বলে উলটো কথা। যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা এ বছর কমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজারে। এদিকে, আত্মহত্যা করে ওপারে গেছে ৮লাখ ৭৩ হাজার লোক।

আমেরিকা আমাদের যতোই সন্ত্রাসী হামলায় মরার ভয় দেখাক না কেন, সত্যিটা হচ্ছে---আইসিস বা কোন সন্ত্রাসির হাত নয়, আপনার নিজের হাতে নিজে মরার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি।

মধ্যযুগ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল না। রাতে ঘুমাতে গেলেন। পাশের গোত্রের লোক এসে আপনাদের আক্রমন করে গোটা গ্রাম কচুকাটা করে ফেললো। ঘুমের মধ্যেই আপনি পটল তুললেন। মরার আগে আজরাইলের সাথে ঠিকমত দেখা সাক্ষাতেরও সুযোগ পেলেন না!

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রতি ১ লাখ লোকে ২০ থেকে ৪০ জন মারা যেত সহিংসতার শিকার হয়ে। আজকে গোটা পৃথিবীতেই এই এভারেজ কমে এসেছে। ১ লাখ লোকে আজ ৯ জনের মত মারা যায় সহিংসতায়। তাও সোমালিয়া আর কলম্বিয়ার মত দেশিগুলোর জন্য এই এভারেজ এতো বেশি।। তা না হলে আরো কম হত। ইউরোপের দেশগুলোতে আজ ১ লাখ লোকে মাত্র ১ জন মারা যায় সহিংসতায়।

আমাদের এই অধঃপতনের কারণ কী? আমরা এখন আর কথায় কথায় যুদ্ধ করতে চাই না কেনো? আমাদের পূর্বপুরুষদের গায়ে যে জোশ ছিল, আমাদের গায়ে সেই জোশ নাই কেন?

একটা বড় কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্ম। রাষ্ট্রকে আমি সবসময়ই সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী বলি। তবে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছোট ছোট অনেক সন্ত্রাসী থাকার চেয়ে একটা বড় সন্ত্রাসী থাকা ভালো। চাঁদা বা ট্যাক্স---যাই দিই না কেন, ঐ এক সন্ত্রাসীকেই দিলাম। এই বড় সন্ত্রাসীর ভয়ে বিচ্ছিন্ন ভায়োলেন্সগুলো আগের চেয়ে অনেক কম হয়। বিশ্বাস না হলে আমাজনের জঙ্গলের আদিবাসীদের দেখে আসতে পারেন। ওদের পুরুষদের অর্ধেকের মত মারা যায় নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি করে। কী নিয়ে মারামারি? সেই তো টিপিক্যাল নারী আর জমিজমা নিয়ে।

আরেকটা কারণ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার যদি একজনকে দিতে হয়, তবে সেইটা রবার্ট ওপেনহেইমার আর তার দলকে দেয়া উচিত। ইনারা পারমাণবিক বোমা বানায়ে এক অর্থে লার্জ স্কেলে যুদ্ধ বন্ধ করে রাখসেন। পরাশক্তিগুলা ভালো করেই জানে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধে যাওয়া মানে দল বাইঁধা আত্মহত্যা করা। কী দরকার?

যুদ্ধের খরচাপাতিও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগেকার দিনে রাজারা যুদ্ধ করে নিজেদের আয়-ইনকাম বাড়াতো। আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে সুলতান মাহমুদ, চেঙ্গিস খান---সবাই এক ফর্মুলাতেই নিজেদের সম্পদ বাড়াইসে। লুটের মাল দিয়ে। অধিকৃত এলাকার সোনা-দানা, গরু-ছাগল, শস্য---এইসব লুট করে।

আজকের দিনে এমনটা করে কোন লাভ নাই। আজকের দিনের সম্পদ সিন্দুকে সোনা-দানার আকারে লুকায়ে রাখা নাই। আজকার সম্পদ আছে মানুষের মগজে, কম্পিউটারের চিপে। ধরেন, চায়নার হঠাৎ মতি হইলো ক্যালিফোর্নিয়া দখল করবে। ক্যালিফোর্নিয়ার আয়ের উৎস কী? সিলিকন আর সেলুলয়েড। যার পেছনের কারিগর গুগলের প্রোগ্রামাররা। হলিউডের শব্দশিল্পীরা। চায়না ক্যালিফোর্নিয়া দখল করে কী লুট করবে? হাজার হাজার স্ক্রিপ্ট আর লাখ লাখ হার্ডডিস্ক? তার আগেই দেখা যাবে

এই প্রোগ্রামার আর শব্দশিল্পীরা মুম্বাই বা দুবাইর প্লেনে চড়ে সেইখানে গড়ে তুলেছে নতুন হলিউড, নতুন সিলিকন ভ্যালী।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা ঘটসে অবশ্য আমাদের মানসিকতায়। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললে, আমাদের শাসকদের মানসিকতায়। হুন রাজাই হোক আর আজটেক ইমামই হোক, যুদ্ধকে সবাই সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে দেখতো। কেউ ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে, কেউ ক্ষমতা সংহত করার উপায় হিসেবে। যারা এটাকে ভালো চোখে দেখতো না, তারাও মেনে নিত যে জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহের মতই যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই, যুদ্ধ থেকে আমরা যা শিখতে পারি, সেটাই লাভ।

আজকাল অস্ত্রের ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ যুদ্ধকে এভাবে দেখে না। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পী-বুদ্ধিজীবী---সবাই আজ শান্তি চায়। সবচেয়ে বেশি করে চায় ব্যবসায়ীরা। আর পুঁজি যেহেতু এই নিওলিবারেল পৃথিবীর ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থা করতেসে, প্রায় সব দেশেই এখন রাজাদের ব্যবসায়ী মহলের কথায় চলতে হয়। এতে আর কিছু না হোক, যুদ্ধের ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কমে এসেছে।

তাই বলে আমাদের রিল্যাক্স হবার কোন সুযোগ নেই। ১৮৭১-১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইউরোপ অনেক ঠান্ডা ছিল। অনেকেই ভেবেছিল, যুদ্ধবিগ্রহের যুগ বুঝি শেষ হয়ে আসছে। কিসের কী? এর পরপরই ইউরোপ আর ইউরোপের মারফত গোটা বিশ্বকে দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ঘা সইতে হল।

এখন তো তবু সেই ইতিহাস লেখার কেউ আছে। আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হলে সেই ইতিহাস লেখার জন্য কেউ থাকবে কিনা সন্দেহ।

শেষ অধ্যায় কিস্তি শূন্য

সুখ কী?

কোথায় পাইবো তারে? কেমনে পাইবো তারে?

কবি, সাহিত্যিক, ফিলোসফার আর ধর্মগুরুরা যুগে যুগে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এখনো করে যাচ্ছেন।

ইতিহাসবিদরা কখনো এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান নাই। ব্যাবিলনের মানুষ বেশি সুখী ছিল না বাংলাদেশের মানুষ বেশি সুখী---এ নিয়ে তাদের খুব একটা কখনো কনসার্ন ছিল না।

কিন্তু এই প্রশ্নটা না করলেও সমস্যা। আমাদের সব কিছুই তখন একটা বিরাট প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায়। এই যে আমরা দিনরাত খেটে মরছি, কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগে যাচ্ছি, পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে যাচ্ছি---এই এফোর্টের মানেটা কী? নীল আর্মস্ট্রং

চাঁদের বুকে পা রাখার পর থেকে কি আমরা বেশি সুখে আছি? যদি না-ই থাকি, তাহলে বিলিয়ন ডলার খরচ করে এই রিস্ক নেবার কী অর্থ দাঁড়ালো?

বিভিন্ন আইডিওলজির মানুষ বিভিন্নভাবে সুখের সন্ধান দেন। ইসলামিস্টরা বলে, আল্লাহর পথে আসলেই সবাই সুখী হবে। ইহকালে আর পরকালে। পুঁজিবাদীরা বলে, পরকালে সুখের আশায় বসে থেকে লাভ নাই। যা সুখ, এই জনমেই নিয়ে নাও। জাতীয়তাবাদীরা বলবে, অন্যের অধীনে কোন সুখ নাই। স্বাধীনতা পেলে তবেই সুখের শুরু।

সমস্যা হল, এই হাইপোথেসিসগুলো কখনো ওভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। মিশরের মানুষ কি ফেরাউনের সময় বেশি সুখে ছিল না ইসলাম আসার পর বেশি সুখে আছে? আলজেরিয়ার মানুষ কি ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর বেশি সুখী? এমনটা কি হতে পারে না, আলজেরীয় স্বাধীনতার চেয়ে তারা ফরাসী উপনিবেশেই বেশি সুখে ছিল? সেক্ষেত্রে তাদের এতো ঘাম ঝরানো স্বাধীনতাই তো মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীরা তাই আজকাল সুখকে আর সব কিছুর মত মাপা শুরু করেছেন। সুখের সাথে তারা কতগুলো ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন। ভ্যারিয়েবল হিসেবে প্রথমেই আসে টাকা-পয়সার কথা। টাকা-পয়সা কী আমাদের সুখী করে? উত্তরটা হচ্ছে হ্যাঁ এবং না।

ধরা যাক, একটা জরিপ চালানো হল। জরিপের অংশ হিসেবে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হল। সেই উত্তরগুলোর রেস্পেক্টে স্কোর এসাইন করা হল। দশের মধ্যে যার যতো স্কোর, সে ততো সুখী।

এই মেজারমেন্টে একটা সমস্যা আছে। কারণ, টাকা পয়সা আমাদের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট পর্যন্ত সুখ এনে দিতে পারে; এর বেশি না। যে লোকের মাসিক আয় ২৫

হাজার টাকা, সে যদি হঠাৎ একটা ৫ লাখ টাকার লটারী পেয়ে যাবে---সে আশেপাশের সবাইকে এটা বলে বেড়াবে। তার যতো ধারকর্জ সব শোধ করবে। বাচ্চাদের জন্য নতুন নতুন জামা কাপড় কিনবে। আর বউয়ের জন্য গয়না। একটা লটারী তাকে পৃথিবীর এক নম্বর সুখী মানুষে পরিণত করবে।

কিন্তু যে লোকের মাসিক আয় ১ লাখ টাকা, সে এই ৫ লাখ টাকার লটারী পেয়ে এমন কিছু আনন্দে আত্মহারা হবে না। হলেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে স্বাস্থ্য। আপনার যদি কঠিন কোন রোগ ধরা পড়ে, আপনি স্বভাবতই মন খারাপ হবে। সেই রোগের মাত্রা যদি দিনকে দিন বাড়তে থাকে, আপনার সুখ-শান্তিও সব পালাবে। কিন্তু এমনটা যদি না হয়? আপনার ডায়বেটিস ধরা পড়লো। কয়দিন আপনার খুব মন মেজাজ খারাপ থাকলো। আস্তে আস্তে একে আপনি মেনে নিতে শিখবেন। আপনার জীবনযাত্রার অংশ হয়ে দাঁড়াবে এই ডায়বেটিক। ডায়বেটিক হবার বছরখানেক পরের আপনি হয়তো ডায়বেটিক পূর্ব আপনির চেয়ে খুব বেশি অসুখী হবেন না।

এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় আরেকটা জিনিস। সেটা হল আপনার পারিবারিক সামাজিক জীবন। যে কারণে দেখা যায়, ভাঙা পরিবারের সন্তানদের চেয়ে স্ট্রং বন্ধনওয়ালা পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সুখী হয়।।

বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটিকে তাই এখনো গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। সঙ্গীর সাথে ভালো রিলেশনকে x অক্ষে রেখে y অক্ষে সুখকে প্লট করলে আপনি প্রায় সব সময়ই পজিটিভ ঢালওয়ালা একটা সরলরেখা পাবেন। এজন্যই একজন গরিব রিকশাওয়ালা, যার বউ তাকে ভালোবাসে, সে একজন সন্দেহবাতিক বিলিওনিয়ারের চেয়ে হ্যাপিনেস ইনডেক্সে অনেক বেশি এগিয়ে থাকে।

তার মানে এই না যে---অর্থ, স্বাস্থ্য আর ভালোবাসা---এই তিনটা ভ্যারিয়েবল দিয়েই আমরা এ্যাকিউরেটলি সুখ মেজার করে ফেলবো।

দিনশেষে সুখ আপেক্ষিক। পুরোটাই নির্ভর করে আপনি কী চাচ্ছেন আর কী পাচ্ছেন---তার উপর। যে ছেলেটা কোন সাবজেক্টে ল্যাগ না খেলেই খুশি, 3 এর পরে দশমিকের ঘরে কী আছে---আর খুলেও দেখে না। আর যে 4 পাবার স্বপ্ন দেখে, তার জন্য 3.98-ও অনেক মন খারাপ করা একটা রেজাল্ট। যার সারা জীবনের স্বপ্ন একটা বাইক কেনা, সে বাইক কিনেই বিরাট খুশি। সাঁ সাঁ চালিয়ে পুরো রাস্তা

মাতাবে। আর যার সারা জীবনের স্বপ্ন ব্র্যান্ড নিউ ফেরারী, সে হয়তো টয়োটা কিনে প্রচন্ড মন খারাপ নিয়ে বাসায় এসে ঘুমাবে। ভাববে, কী করলাম জীবনে?

আবার শুরুতে ফিরে আসি। সুখ যে আপেক্ষিক---এটা তো কবি, সাহিত্যিক আর ফিলোসফাররা আমাদের অনেক আগেই বলে গেছেন। বিজ্ঞানীদের তাহলে কী দরকার মিলিয়ন ডলার খরচ করে গবেষণা করে একই জিনিস বের করার?

দরকার আছে। আমাদের গন্তব্য এক। গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ অনেক। বিজ্ঞানীরা সেই অনেকগুলো পথের একটা পথের যাত্রী মাত্র।

শেষ কিস্তি এক

কেমিক্যাল হ্যাপিনেস এর আইডিয়াটা একদম নতুন কিছু না।

১৯৩২ সালে Brave New World নামের একটি উপন্যাসে এই আইডিয়াটা একটা কংক্রীট ফর্মে প্রথমবারের মত হাজির হয়। লেখক এইখানে দেখান, জাগতিক সাফল্য, প্রতিষ্ঠান---এগুলো আমাদের সুখ এনে দিতে পারে না। সুখ আসতে হবে ভেতর থেকে। আর তার মাধ্যম হচ্ছে সাইকায়াট্রিক ড্রাগ।

লেখক এমন একটা ড্রাগের কথা এইখানে কল্পনা করেন, যা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজে নিলে মানুষ 'সুখী' হবে। বাজারে চলতি ড্রাগগুলোর মত এটা মানুষের কর্মক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

এইভাবে মানুষকে সুখের সন্ধান দিতে পারলে মানুষ কোন রকম কোন অপরাধ করবে না। ফলে, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা---এইসবের আর কোন দরকার হবে না আমাদের। আমরা আরো প্রোডাক্টিভ ক্ষেত্রে আমাদের ফোর্সগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো।

এখানে দুটো সমস্যা। এক, এরকম কোন ড্রাগ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি যা আপনাকে সুখ দিবে, কিন্তু বিনিময়ে আপনার শরীর বা মন থেকে কিছু শুষে নিবে না।

আর দুই, সুখ আর সুখানুভূতি এক জিনিস না। লেখক এখানে যে জিনিসটার কথা বলসেন---সেটা হল সুখানুভূতি। ইংরেজিতে যাকে বলে Pleasure. ডোপামিন,

সেরোটোনিনের নিঃসরণ। আর এই নিঃসরণ পার্মানেন্ট কিছু নয়। খুবই ক্ষণস্থায়ী। মানুষের ইতিহাস যতো পুরানো, নেশার ইতিহাসও ততো পুরানো। নেশাদ্রব্য যুগ যুগ ধরেই আমাদের সুখানুভূতি দিয়ে আসছে। কিন্তু সুখ দিতে পারে নাই।

বিবর্তনও আমাদের ঐভাবেই তৈয়ার করসে যেন আমরা বেশিক্ষণ সুখী হতে না পারি। বেশি সুখী হলেও সমস্যা আছে। সেক্স করে আমরা যেমন সুখ পাই। ঐ সুখটুকু না পেলে কেউ হয়তো সেক্স করতোই না। ফলে বাচ্চা হত না, বাচ্চা হত না, বাচ্চা হত না। প্রজাতি হিসেবেও আমরা টিকে থাকতে পারতাম না।

কিন্তু সেক্স করে আমরা যদি কন্টিনিউয়াসলি সুখ পেতেই থাকতাম, তাহলে মানুষ দিনরাত সেটাই করতো। খাদ্যের সন্ধানে আর বাইরে বেরোতো না। সুখের ফাঁদে পড়ে না খেয়ে মারা পড়তো গোটা প্রজাতি।

আর মানুষের মস্তিষ্কও এমন সে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি ডোপামিন, সেরোটোনিন নিঃসরণ করতে পারে না। কাজেই, যতো সুখের ঘটনাই হোক, আমরা একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি সুখী হতে পারি না।

ধরেন, একদিন সকালে আপনি লাখ টাকা স্যালারির চাকরি পেলেন। দুপুরে আপনার বোন মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার ফল হল। সে চান্স পেয়েছে। বিকালে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে ওয়ানডেতে নির্মমভাবে হারালো। আর রাতের বেলা আপনার পুরানো গার্লফ্রেন্ড আপনার কাছে ফিরে এল।

চার চারটা দারুণ ঘটনা ঘটলো একই দিনে। এতোগুলো না ঘটে যদি একটা ঘটতো---তাহলে আপনি যতোটুকু সুখী হতেন, চারটা ঘটায় কি আপনি চারগুণ সুখী হবেন? মস্তিষ্ক থেকে চারগুন ডোপামিন, সেরোটোনিনের ক্ষরণ হবে? উত্তর হচ্ছে, না। আমাদের মস্তিষ্ক তো আর পারপেচুয়াল মেশিন না রে ভাই। এটা একটা লিমিটেড কোম্পানি যন্ত্র।

ড্রাগগুলো এক সময় আর কাজ করে না কেন? আপনাকে কেন আগের চেয়ে বেশি ড্রাগ নিতে হয় ঠিক আগের সেই অনুভুতিটা পাওয়ার জন্য? কারণ, শুরুতে ঐ ড্রাগ যে পরিমাণ ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটিয়েছিল, অধিক ব্যবহারে তার কর্মদক্ষতা কমে যায়; সেইম নিঃসরণ ঘটাতে আগের চেয়ে বেশি ডোজ লাগে।

এইখানে আবার আমরা সেই কানাগলিতে চলে আসি। সুখ আসলে কী? সুখ কি আমরা যে মুহূর্তগুলোতে সুখী ছিলাম, সেই মুহূর্তগুলোর যোগফল? নাকি অন্য কিছু?

নোবেল বিজয়ী অর্থনিতিবিদ ড্যানিয়েল কানম্যান বলেন, অন্য কিছু। তিনি হিসেব কষে দেখান, যে বিষয়গুলা মানুষকে সবচেয়ে বেশি পেইন দেয়, সেগুলাই বিগ পিকচারে মানুষকে সুখী করে তোলে।

বাচ্চা মানুষ করা যেমন; খুবই পেইনফুল একটা কাজ। কিছুক্ষণ পর পর ন্যাপি বদলাও। বাচ্চার জন্য আলাদা খাবার বানাও। রাতে ঘুম ভেঙে কান্নাকাটি করলে তাকে কোলে নিয়ে হাঁটো। সোজা কথা, আপনার সুখ-শান্তি সব হারাম করে নিবে সে। তারপরও মানুষ বাচ্চা নেয়। আর জিজ্ঞেস করলে দাঁত বের করে হেসে বলে, এই বাচ্চাই তার জীবনের একমাত্র সুখ। অথচ পাটিগণিতের হিসাবে এই বাচ্চার হাসিমুখ তার জীবনে যতোটা না সুখময় মুহূর্ত এনেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছে প্যারাময় মুহূর্ত।

প্যারাডক্সটা এইখানেই। মানুষের জীবন যোগ বিয়োগের ফর্মুলায় চলে না। মানুষ তার জীবনের কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য তৈরি করে নেয়। ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সে যে কোন কষ্ট মেনে নিতে রাজি। নীৎসেও ঠিক এই কথাটাই বলসেন। মানুষের জীবনে একটা মিনিং থাকা দরকার। মিনিং থাকলে কোন কষ্টই কষ্ট না। আর মিনিং না থাকলে সমস্ত রকম ম্যাটেরিয়াল সুযোগ সুবিধাও আপনাকে ভয়াবহ রকম অসুখী করে তুলবে।

মিনিং এর কথা যখন উঠলো... বিজ্ঞান কিন্তু বলে, আমাদের মানব জীবনের কোন মিনিং নাই। আমরা অন্ধ বিবর্তনের একটা ফলাফল মাত্র। আমি আপনি মারা গেলে এই মহাবিশ্বের কিছুই আসবে যাবে না। সে তার মত করে চলতেই থাকবে। প্রকৃতির কাছে আমার যা দাম, একটা গরু, গাধা বা উটপাখিরও তাই দাম।

আমরা কিন্তু তারপরও আমাদের জীবনকে একটা মিনিং দেয়ার চেষ্টা করি। বিজ্ঞানী তার জীবনকে এই বলে মিনিং দেন যে, তার গবেষণা মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে একটু হলেও সমৃদ্ধ করছে। দেশপ্রেমিক সৈন্য ভাবে যে, তার আত্মত্যাগকে দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। একজন উদ্যোক্তা আরো দশটা মানুষকে চাকরি দিয়ে, তাদের পরিবারের চলার ব্যবস্থা করে নিজের জীবনকে মিনিং দেন।

এই যে নিজের জীবনকে তাৎপর্য দেবার একটা প্রবণতা---এর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি আছে। এগুলো আর কিছুই না। নিজেকে বুঝ দেয়া। যে লোকটা দেশের জন্য জান দেয়, সেই দেশটাই তো পৃথিবীর মানচিত্র থেকে এক সময় হারিয়ে যেতে পারে। তখন কে তাকে স্মরণ করবে? যে মানুষই কষ্ট করে সন্তান মানুষ করে, সেই সন্তান যে তাকে ছেড়ে চলে যাবে না---তার গ্যারান্টি কী?

এরপরও মানুষ তার জীবনের একটা অর্থ খুঁজে বেড়ায়। যতক্ষণ একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে জীবনে, সুখের আয়ুও ঠিক ততোক্ষণই।

শেষ কিস্তি দুই

বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর শুরু বিশ বা একুশ শতকে না।

১০ হাজার বছর আগে মানুষ যেদিন ষাঁড়কে খোঁজা করে বলদ বানিয়েছিল, সেদিন থেকেই বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর শুরু। বলদ নামটার মধ্যেই এর সাবমিসিভ আচরণ নিহিত, এরে পোষ মানানো সোজা; এরে দিয়ে লাঙল টানানোও সোজা।

গবাদি পশু খোঁজা করেই মানুষ ক্ষান্ত দেয় নাই। নিজের ছেলেরেও সে খোঁজা করে দিসে। সেই ছেলেকে নাচেগানে পারদর্শী করে তুলসে। সুলতানের হারেমে বেগম সাহেবাদের সেবাযত্নে কাজে লাগাইসে।

সেকালের বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে আজকের বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্থক্যটা তাইলে কই? পার্থক্যটা লেভেলে। সেকালের ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল খুবই স্থূল লেভেলের।

চোখে দেখা যেত। আজকের ইঞ্জিনিয়ারিং সেলুলার লেভেলে, জিন লেভেলে। চোখে দেখা যায় না এমন। আজকে তাই লিঙ্গ বদলানোর জন্য কাউকে খোঁজা করা লাগে না। কিছু হরমোন চেঞ্জ করে দিলেই হল!

এক ব্রাজিলিয়ান ভদ্রলোকের একবার এক শখ হল। উনি এমন একটা খরগোশ পুষবেন যার গা থেকে সবুজ আলোকছটা বেরোবে। উনি এক ফ্রেঞ্চ ল্যাবরেটরীতে খোঁজখবর করলেন। এর জন্য মালকড়ি ছাড়তেও উনার সমস্যা নাই।
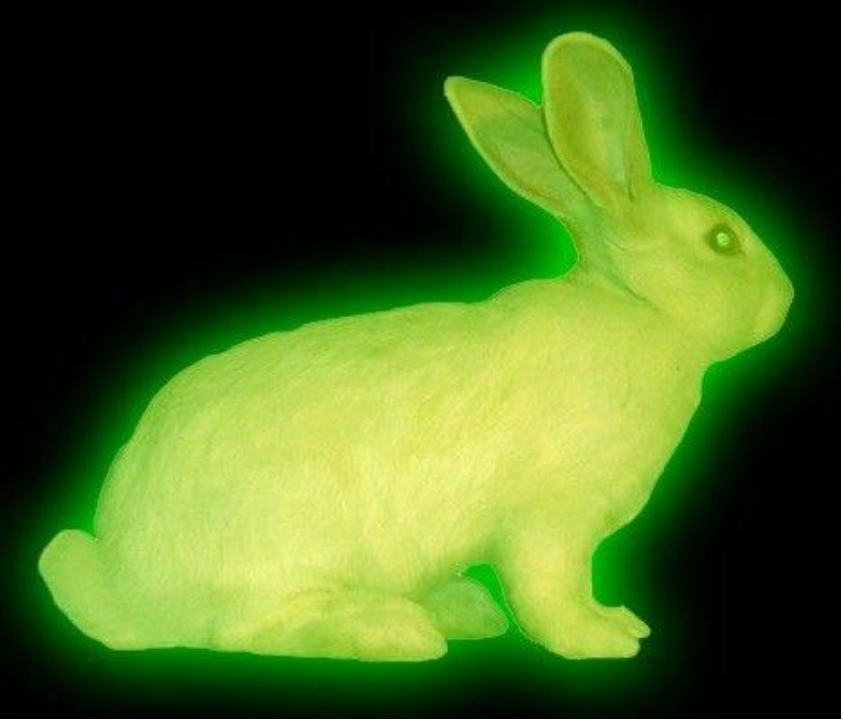
ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীরা একটা খরোগোশের ভ্রূণ নিল। সেই ভ্রূণের ডিএনএ-তে জেলীফিস থেকে পাওয়া সবুজ ফ্লুরোসেন্ট আলোর জিন ঢুকিয়ে দিল। ইয়ো। সেই কাংক্ষিত

খরগোশের জন্ম হল যার গা থেকে কিনা সবুজ আভা বেরোয়। ভদ্রলোক এই খরগোশ বাবুর নাম দিলেন Alba.

Alba কোন বিবর্তনের ফসল নয়। নিখাদ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ফসল। এখন পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি, সমস্ত প্রাণীসত্তাই লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই পর্যায়ে এসেছে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা যে বাম হাত ঢুকাই নি---তা নয়!

আমরা যখন দুবলা পাতলা ভেড়াগুলোকে মেরে মোটা, নাদুশ নুদুশ ভেড়াগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছি---তখনই আমরা এদের ন্যাচারাল বিবর্তনে এক দফা ইন্টারফিয়ার করে ফেলেছি। কবি বলেছেন, ভেড়াকে ভেড়ার মত থাকতে দাও। আমরা তা দিই নি, আমরা ওদের নিজেদের প্রয়োজনমত গুছিয়ে নিয়েছি!

তবু সেটা ছিল বিবর্তনে হস্তক্ষেপ। যাতে কিনা বছরের পর বছর লেগে যেত। আজ আমরা ন্যাচারাল বিবর্তনকে অস্বীকার করে নিজেদের খেয়াল খুশিমত প্রাণীদের ডিজাইন করে চলেছি। এই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ব্যাপারটা আমরা কেউ কেউ ঈশ্বরের এখতিয়ারে ছেড়ে চেয়ে বসে ছিলাম। সমস্যা হল, এই সেক্টরে ঈশ্বরের মনোপলি আর নাই। মানুষও এই বিজনেসে নামসে।

এখনো পর্যন্ত আমরা ছোট ছোট সেক্টরে আমাদের কেরদানি দেখাচ্ছি। E Coli'র মত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আমরা ইনসুলিন তৈরি করছি। তাতে মেলা খরচ বেঁচে যাচ্ছে। উত্তর মেরুর বাসিন্দা মাছের জিন আলুর ভেতর ঢুকিয়ে আলুকে আরো ঠাণ্ডা প্রতিরোধী করে তুলেছি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা ঘটেছে ল্যাব র‍্যাটদের সাথে। জেনেটিক প্রকৌশলীরা আজকাল এমন সব ইঁদুরের জন্ম দিচ্ছেন যাদের র‍্যাম আর হার্ডডিস্ক, বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি---দুটোই তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

Vole এর কথা বলি। এরা অনেকটা ইঁদুর টাইপের প্রাণী। অধিকাংশ প্রজাতিই বেশ চরিত্রহীন। মানে আজ একে ধরে তো কাল ওকে ধরে। বিজ্ঞানীরা তো এইসব নষ্টামি পছন্দ করেন না। তারা এমন এক প্রজাতি ডেভেলপ করলেন, যেখানে ছেলে vole আর মেয়ে vole---দুজনেই দীর্ঘস্থায়ী মনোগ্যামাস রিলেশনে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা মনোগ্যামীর জিন বের করে ফেলেছেন।

Vole এর ক্ষেত্রে যদি এটা করা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে নয় কেন? এরশাদ কাকুর শরীরে আপনি মনোগ্যামীর জিন ঢুকিয়ে দিলেন। কাকু আরো দশজনের মত স্ত্রীভক্ত, বিশ্বস্ত, অনুগত স্বামী হয়ে গেলেন। খুব কি খারাপ হয় ব্যাপারটা?

ঘটনা এখানেই শেষ না। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, বাঁচা মানুষ নিয়ে কাজ তো অনেক হল। এবার মরা মানুষ নিয়ে কিছু করা যাক। হার্ভার্ডের এক প্রফেসর প্রস্তাব দিলেন, নিয়েন্ডারথালের জিন মানুষের ভ্রূণে ঢুকায়ে দেখলে কেমন হয়? বেশ ক'জন মহিলা সেই নিয়েন্ডারথাল বাচ্চা পেটে ধরার জন্য কিনা রাজিও হয়ে গেল!

কথা হল, নিয়েন্ডারথালদের দিয়ে আমরা কী করবো? এরা ধ্বংস হইসে তো হইসে, এদের আবার বাঁচায়ে তোলার কী দরকার?

দরকার আছে। নিয়েন্ডারথাল মস্তিষ্কের সাথে আমরা যখন আমাদের স্যাপিয়েন্স মস্তিষ্কের তুলনা করবো, তখনই আমরা বুঝতে পারবো---দুই ভাইর মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কী। ঠিক কী কারণে আমরা যাকে Consciousness বলি, বাংলায় চেতনা বলি---এই চেতনা আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করসে। লোকে হয়তো টাকা দিয়ে নিয়েন্ডারথাল কিনেও নিবে। দু'জন কাজের মানুষ যে খাটনিটা খাটতে পারতো, একা একটা নিয়েন্ডারথাল সেটা খেটে দিবে।

আচ্ছা, আমরা যদি নিয়েন্ডারথাল ডিজাইন করতে পারি, স্যাপিয়েন্স-ই বা কেন ডিজাইন করতে পারবো না? আর স্যাপিয়েন্স ডিজাইন তো খুব কঠিন কিছু না। যেখানে আমরা ইঁদুর ডিজাইন করে তার বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়িয়ে দিচ্ছি, সেখানে মানুষ কেন পারবো না? ইঁদুরের শরীরে DNA বেস আছে প্রায় আড়াই বিলিয়নের মত। মানুষের শরীরে সেটা ২.৯ বিলিয়ন। মাত্র ১৪% বেশি। ইঁদুরে যদি হয়, মানুষে কেন নয়? জিনিয়াস ইঁদুর যদি হয়, জিনিয়াস মানুষ কেন নয়? চরিত্রবান ইঁদুর যদি হয়, চরিত্রবান মানুষ কেন নয়?

সত্যিটা হচ্ছে এই যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের শরীরে একটা বড় ধাক্কা দিতে যাচ্ছে। হয়তো আর কয়েক দশকের মধ্যেই। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, গড় আয়ু বাড়বে, হয়তো অমরত্বও পেয়ে যেতে পারি আমরা। শরীরের ধাক্কা তো আমরা নিতে পারবো। কিন্তু আমাদের মনের ভেতর এটা যে ধাক্কা দিবে, আমাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারে যে ধাক্কা দিবে---সেই ধাক্কা আমরা নিতে পারবো তো?

তার চেয়েও বড় প্রশ্ন---আমরা Homo sapiens ই থাকবো তো? নাকি বাপ-দাদাদের মুখে চুনকালি মেখে আমরা এমন কিছুতে পরিণত হবো যাকে কোনভাবেই আর Sapiens বলা যাবে না?

শেষ কিস্তি শেষ
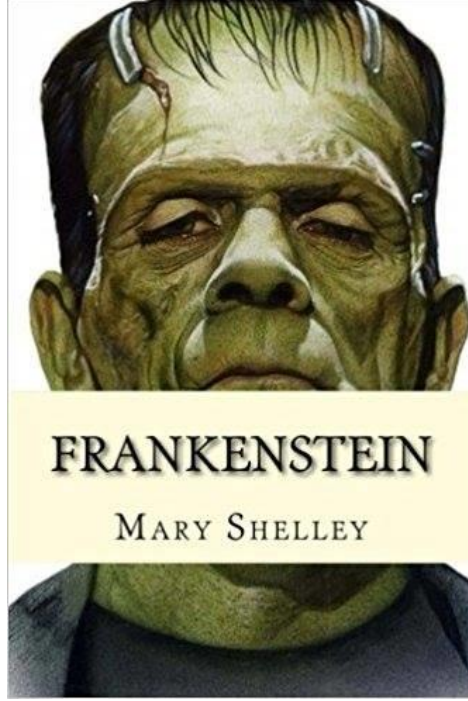
খালি চোখে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে খুব শাদামাটা একটা গল্প মনে হয়। এক বিজ্ঞানী যিনি কিনা একটা আর্টিফিশিয়াল সত্তা তৈরি করেন, যেটা পরে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। বাজারে এরকম ভুরি ভুরি সায়েন্স ফিকশন আছে। এইসব গল্পের মূল বক্তব্যই হচ্ছে---আমরা যদি বেশি তেড়িবেড়ি করি, নিজেদের ঈশ্বরের সমকক্ষ ভাবা শুরু করি---তাইলে আমাদের খবরই আছে।

এর বাইরেও কিন্তু এই গল্পের একটা গভীর তাৎপর্য আছে।

ফ্রাংকেনস্টাইন আমাদের এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, মানবজাতির শেষ ঘনায়া আসতেসে। এই শেষ পারমাণবিক বোমা বা উল্কাপাতের কারণে হবে না। মানুষ নিজেই তার কেয়ামত ডেকে আনতেসে। এই কেয়ামত মানে পৃথিবীর শেষ হয়ে যাওয়া না। এই কেয়ামত মানে প্রজাতি হিসেবে হোমো স্যাপিয়েন্স এর শেষ হয়ে যাওয়া। আমাদের জায়গায় তখন এমন এক প্রজাতির আবির্ভাব হবে, যাদের শরীর তো আমাদের থেকে আলাদা হবেই, এদের আবেগ-অনুভূতিও আমাদের স্কেলে মাপা যাবে না।

এই ভাবনাটাকে আমরা ঠিক নিতে পারি না। আমরা চিরকালই নিজেদের 'বেস্ট' জেনে আসছি। আমরা বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপার বানাবো, মহাকাশ যাবো, মঙ্গলে প্লট বুকিং দিব। সব আমরাই করবো। আমাদের চেয়েও বেটার কেউ থাকতে পারে, এটা আমরা নিতেই পারি না।

কিন্তু সময় তো আর বসে থাকে না। সময় তার নিজের গতিতে এগোয়। যে জন্যে আজ আমরা যে প্রেডিক্ট করি, দেখা যায় ভবিষ্যতে তার কিছুই মেলে না। এ্যাপোলো ১১ যখন চাঁদে গেলো, আমরা স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলাম। যে ২০০০ সালের মধ্যে আমরা মঙ্গলে থাকা শুরু করবো। সেটা কি হইসে? থাকা তো দূরের কথা, যাইতেই পারলাম না এখন পর্যন্ত। উলটা কী হইলো? আমরা ইন্টারনেট পাইলাম। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাটে নিজেদের প্রাইভেসি নিলামে তুললাম।

কাজেই, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আশংকাকে আমরা চাইলেও হেসে উড়ায়ে দিতে পারি না। এ্যাডভান্সড মানুষের কিছু কিছু লক্ষণও তো ইদানীং দেখা দিচ্ছে। আর এই লক্ষণগুলো দেখা দিচ্ছে আমাদের ল্যাবগুলোতে।

ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারফেস যেমন আজকাল বেশ জনপ্রিয় রিসার্চ টপিক। এখানে করা হয় কি, আমাদের মাথার খুলিতে কতগুলো ইলেক্ট্রোড বসানো হয়। ফলে,

মস্তিষ্কের ভেতরে যে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালগুলো তৈরি হচ্ছে, কম্পিউটারে সেগুলা দেখা যায়। এইটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে। এই সিগনাল এ্যানালিসিস করে আপনি রোগ নির্ণয় করবেন। মস্তিষ্কের কোন অংশ কী কাজ করে---এগুলো করবেন। সবই বুঝলাম।

কিন্তু এই সিগনাল্গুলো যদি ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেয়া হয়? কিংবা কতগুলা মানুষের এইভাবে পাওয়া সিগনালগুলো যদি একসাথে প্যাকেজ আকারে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন কী হবে? কিংবা একজনের সিগনাল যদি আরেকজনের মস্তিষ্কে ইনপুট হিসেবে দেয়া হয়? একজন মানুষ কি তখন আরেকজনের মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে যাবে? তার ছোটবেলার স্মৃতি, প্রথম প্রেমিকার স্মৃতি, প্রথম পরাজয়---সব জেনে যাবে? মানুষের যে প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস আছে---সেই প্রাইভেসির তখন কী হবে? ইনডিভিজুয়ালিজম বলে কি কিছু থাকবে তখন?

এইরকম একটা কালেক্টিভ সত্তাকে কি আমরা আর 'মানুষ' বলতে পারি? না, পারি না। এটা হবে সম্পূর্ন নতুন কিছু। এদেরও আবেগ-অনুভূতি, সাইকোলজি সবই থাকবে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে যাকে হয়তো আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না।
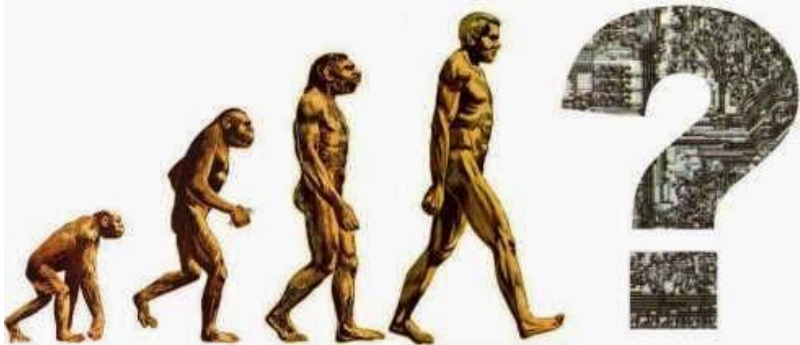
আরেকটা সম্ভাবনা এরকম। ধরেন, আপনি আপনার ব্রেইনের একটা ব্যাক আপ পোর্টেবল হার্ডডিস্কে রেখে দিলেন। তারপর ল্যাপটপে সেটা চালাইলেন। এখন

ল্যাপটপ কি আপনার মতই চিন্তা করা শুরু করবে? নাকি বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী, সেও আগের কিছু ইনপুট আর নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শুরু করবে? যদি সেটাই হয়, তাইলে সেই ল্যাপটপকে আমরা কী বলবো? ল্যাপটপ না মানুষ?

২০05 সালে হিউম্যান ব্রেইন প্রজেক্ট নামে এরকমই একটা বিলিয়ন ডোলারের প্রজেক্ট চালু হইসে। এর আল্টিমেট উদ্দেশ্য---কম্পিউটারের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক পুরাপুরি রিক্রিয়েট করা। এটা যদি হয়, তাহলে ৪ বিলিয়ন বছরের কারাবাসের পর মস্তিষ্ক জৈব যৌগের জাল থেকে মুক্ত হবে। অজৈব যৌগের যে একটা বিশাল জগৎ আছে, ঐখানে তার প্রথম পদচারণা ঘটবে। এর এচূড়ান্ত পরিণতি কী---আমরা জানি না। আদৌ কম্পিউটার আমাদের মস্তিষ্কের জালকে ভেদ করতে পারবে কিনা---তাও আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নাই।

চেষ্টায় যে কিছু কিছু ফল হচ্ছে না---তাও তো না। প্রথম মানব ডিএনএ ম্যাপ করতে আমাদের লাগসিলো ১৫ বছর। খরচ হইসিলো ৩ বিলিয়ন ডলার। এখন সেই ডিএনএ ম্যাপ করতে কয়েক সপ্তার বেশি লাগে না। পকেট থেকে যায় মাত্র কয়েকশো ডলার।

পারসোনালাইজড চিকিৎসার যুগ তাই শুরু হল বলে। একদিন আসবে, যখন পাড়ার ডাক্তার আপনার ডিএনএ দেখে বলে দিবে, যে বয়সকালে আপনার লিভারে সমস্যা হতে পারে। হার্টের দিক থেকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। ৯০ পার্সেন্ট লোক যে ওষুধ খেয়ে ভালো হয়, সেটা আপনার জন্য কাজ নাও করতে পারে। আপনার প্রেসক্রিপশনে হয়তো এমন বড়ির কথা লেখা থাকবে, যা সেই ৯০ পার্সেন্ট খেয়ে উলটা অসুস্থ হয়ে পড়বে।

খোলাবাজারে এইভাবে DNA সিকোয়েন্স পাওয়া গেলে ডাক্তারদের না হয় সুবিধা হবে। সমস্যাটা হবে পলিসি মেকারদের। এইভাবে DNA ওপেন করে দেয়া ঠিক হবে কিনা---এইটা আরেকটা ফিলোসফিক্যাল সমস্যা। ব্যাঙ্কের লোকজন আপনার DNA দেখে যদি বুঝে ফেলে, আপনি খুবই উড়নচন্ডী প্রকৃতির মানুষ, তাইলে তো আপনাকে আর ধার দিবে না। চাকরির ইন্টারভিউয়ে আমরা তখন সিভি না নিয়ে ডিএনএ রেজাল্ট নিয়ে হাজির হব। ডিএনএ ভালো দেখালে আপনি চাকরি পাবেন, আর না হলে নাই। ব্যাপারটা এক রকম বৈষম্য হয়ে গেলো না?

সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা ভবিষ্যতের পৃথিবীর স্পেসশিপ নিয়ে লেখেন, টাইম ট্রাভেল নিয়ে লেখেন। কিন্তু এর ফলে আমরা যে মরাল, ফিলোসফিক্যাল দ্বন্দ্বগুলার সম্মুখীন হব---সেগুলা নিয়ে খুব একটা কেউ লেখেন না। কেননা, সেই সময়কে বোঝা, সেই সময়ের সমস্যাগুলোকে ধারণ করা, আমাদের মরাল স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এমনে একটা সত্তার কথা ভাবুন তো যার কোন সেক্সুয়ালিটি নাই, যার মনোসংযোগের ক্ষমতা আমার আপনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি। রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, হিংসা বলে কোন বস্তু যার মধ্যে নাই---তার আবেগ, তার চাহিদা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো?

বলা হয়, বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরুর। এর আগে সময়, সভ্যতা, প্রাণ---কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা সম্ভবত সেরকমই একটা নতুন বিস্ফোরণের দিকে এগোচ্ছি।

এই বিস্ফোরণের আগের পৃথিবী আর পরের পৃথিবীর মধ্যে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের কাছে যা মূল্যবান---পরিবার, প্রিয়জন, ভালবাসা, ঘৃণা---সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়বে সেই নতুন পৃথিবীর মানুষদের কাছে। এই নতুন মানুষদের আমরা নাম দিয়েছি Homo Deus. ঈশ্বরের সমান মানুষ।

এই নতুন মানুষদের নিয়েও হয়তো গল্প লেখা হবে। অন্য কোন দিন। অন্য কোন সময়।
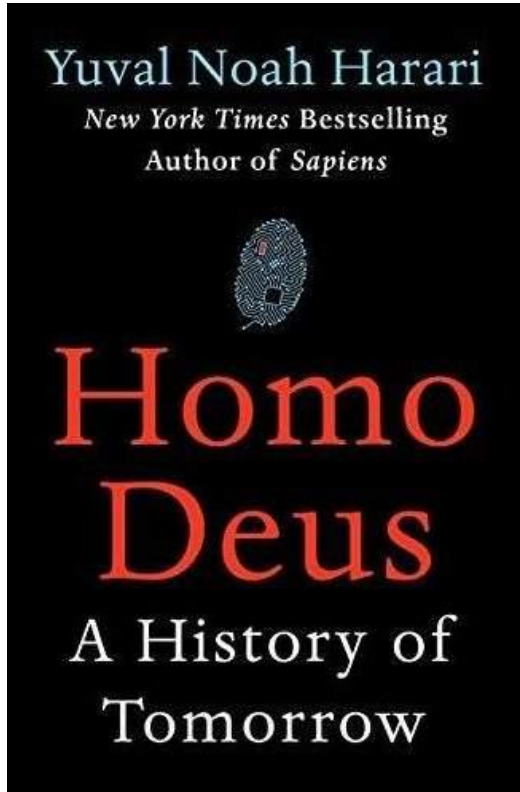
সমাপ্ত

খুব কম মানুষ গল্প বলতে জানেন! মজাদার গল্পের বুনটে তেতো সত্যকে সন্দেশ বানিয়ে খাওয়াতে পারেন আরও কম কিছু মানুষ! আমরা যারা দেশ-বিদেশের গল্প নির্ভর বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্রের খোঁজ রাখি, তাদের কাছে **ইউভাল নোয়া হারারি** এখন বহুল পরিচিত বিজ্ঞান গল্পকার! ২০১৪ সালে তার লেখা **স্যাপিয়েন্স: আ ব্রিফ হিস্টোরী অফ হিউম্যানকাইন্ড** পুরো পৃথিবী মাতিয়ে ফেলেছে মৌলিক গল্প বলার যাদুতে!

আমরা বাংলাভাষীরা যারা সে গল্পের স্বাদ নিতে পারছিলাম না, তাদের জন্য **আশফাক আহমেদ** দেশজ ঢঙে রূপান্তর করেছেন সেই গল্পের! আর মজার কথা হচ্ছে, এই আমি ব্যক্তিগতভাবে এত চমৎকার রূপান্তর এর আগে কখনও দেখিনি! **আশফাক আহমেদ** অবশ্যই বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন বিজ্ঞান গল্পকার হিসাবে নন্দিত হয়ে উঠবেন!

মানুষের গল্প তার প্রথম প্রকাশিত ইবুক।

নরসুন্দর মানুষ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com